জীবন প্রবাহ

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতা

প্রকাশক—
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী
৯০ বিবেকানন্দ রোড,
কলিকাতা

মূল্য তিন টাকা।

প্রিণ্টার—শ্রীপ্রমথনাথ মান্না
শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২৫৯, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা



শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবন-প্রবাহ

প্রথম অধ্যায়

জন্মস্থান

ফরিদপুর জিলার নড়িয়া গ্রামে ৩রা অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময় আমার জন্ম। সন ঠিক মনে নাই—তবে ১২৯৩ কি ৯৪ হইবে। নড়িয়া গ্রাম বর্ত্তমানে মাদারীপুর মহকুমার অন্তর্গত। কিন্তু আগে মহকুমা-কেন্দ্র ছিল পদ্মা-নদীর উত্তর পারে ঢাকা জিলার বহর গ্রামে। তখন সারা বিক্রমপুর একই মহকুমা-হাকিমের শাসনাধীন ছিল। বিক্রমপুর পরগণা এখন বিশাল পদ্মানদীর দ্বারা উত্তর ও দক্ষিণ পারে বিভক্ত। কিন্তু আগে বিক্রমপুর এভাবে বিভক্ত ছিল না। এখন যেখানে পদ্মানদী প্রবাহিত, সেখানে পূর্ব্বে কালীগঙ্গা নামে একটি সঙ্কীর্ণ নদী প্রবহিত ছিল। পদ্মা বর্ত্তমানে বহরের নীচেই ব্রহ্মপুত্রের সাথে মিশিয়া মেঘনা হইয়াছে। কিন্তু আগে পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্রের মিলনস্থল ছিল আরো দক্ষিণে। মহকুমা-কেন্দ্র পরে বহর হইতে উঠিয়া যায়, মুন্সীগঞ্জ এবং দক্ষিণ বিক্রমপুর ফরিদপুর জিলার সামিল হইয়া মাদারীপুরের অধীনে আসে।

নড়িয়া গ্রাম আগে খুবই বড় ছিল। কিন্তু কীর্ত্তিনাশার প্রসিদ্ধ ভাঙ্গনের ফলেই এর পশ্চিমার্দ্ধ চলিয়া যায় পদ্মার গর্ভে। কীর্ত্তিনাশা

নামে আগে কোন নদী ছিল না। এই ভাঙ্গনের ফলে কালীগঙ্গাই এই খ্যাতি লাভ করে। কীর্ত্তিনাশার আগেকার ভয়াবহরূপ এখন আর নাই। ইহা এখন একটি ছোট নদীতে পরিণত হইয়াছে। এই নদীটি নড়িয়া গ্রামের পশ্চিম পাশ দিয়া আঁকা বাঁকা চলিয়া গিয়া দক্ষিণে মিশিয়াছে পালংএর খালে। নদীতে বেশীর ভাগ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় এই প্রাচীন গ্রামের আগেকার সৌন্দর্য্য আর নাই। কিন্তু নদীর পশ্চিম পারে নয়া-ভাসিয়া-ওঠা চরের মুসলমান পল্লী সমূহের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য বড়ই মনোরম। এই সব চরের বাড়ী ঘর, গাছ-পালা, ক্ষেত-পাথর সবই নবীনের সৌন্দর্য্যে ভরা। নড়িয়া গ্রামের পুরাতন বন-জঙ্গলের ছায়া-সমাচ্ছন্ন মলিন সৌন্দর্য্যের তুলনায় এই চরটি মনে হয় যেন রজনীর অন্ধকার ভেদ করিয়া আসা উষার উজ্জ্বল আলো রেখার মতো। সন্ধ্যার সময় গ্রামের ছেলেরা নদীর পারে চরের উপর নূতন-পড়া পথে চলিতে চলিতে পড়ন্ত সূর্য্যের লাল আলোয় রঙ্গীন এই চরের বাড়ীঘর গরু-বাছুরের পানে অবাক নয়নে চাহিয়া থাকে—আর কখন যে এক অজানা আকর্ষণের প্রবল টানে অজ্ঞাতে তাহারা আরো এক অজানা রাজ্যের গহন দেশে চলিয়া যায় টেরও পায় না।

নড়িয়ার বর্ত্তমান আকার আগের চেয়ে অনেক ছোট হইলেও লম্বায় প্রায় দেড় মাইল ও পাশে এক মাইল। নড়িয়ার পূবে মোলফৎগঞ্জের প্রসিদ্ধ বন্দর। এই বন্দর ও নড়িয়ার পূব সীমানার মধ্যে একটি চিকণ খাল আছে। এই খালটি দক্ষিণে চাকদহ ও লোনসিংহ অবধি বিস্তৃত—পূবে ইহা চণ্ডীপুর হইয়া শ্রীপুরের ট্যাকের কাছে পদ্মায় পড়িয়াছে। শ্রীপুরের ট্যাক হইতে কিছু দূরে

বর্ত্তমান নদীর মাঝে শ্রীপুরগ্রামে চাঁদরায় ও কেদার রায়ের বাড়ী ছিল। মেঘনার পথে উজাইয়া আসা আরাকান ও পর্ত্তুগীজ দস্যু কর্ত্তৃক এবং ব্রহ্মপুত্রের পথে নামিয়া আসা আসামীদের দ্বারা শ্রীপুর সর্ব্বদাই আক্রান্ত হইতো। নিজের বসত বাটী আরো একটু নিরাপদ স্থানে নেওয়ার উদ্দেশ্যে মোলফৎগঞ্জ বন্দরের এক মাইল পূবে কেদার-বাড়ী নামক স্থানে কেদার রায় নূতন বাড়ী তৈরী করার মনস্থ করেন। পরীখা কাটা এবং ইঁট পোড়ানোও শেষ হইয়াছিল কিন্তু মানসিংহের সাথে যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে কেদার রায়ের এই ইচ্ছা অপূর্ণ-ই রহিয়া যায়। এই অঞ্চলের প্রাচীন গৌরব বুকে বহন করিয়া এই পরীখা ও বহু পোড়ানো ইঁটের পাঁজা আজও ম্লান অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। এই সব বিবরণের উদ্দেশ্য শুধু ইহা দেখানো যে এই অঞ্চলের লোকদের সাবেক কালে সর্ব্বদাই বাহিরের শত্রুর সাথে সংগ্রাম লিপ্ত থাকিতে হইতো। উত্তরে বিশাল পদ্মা নদীর বক্ষে মোগল বাহিনীর সাথে কেদার রায়ের অনেক নৌ যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। পর্ত্তুগীজ ও আরাকান দস্যুদের সাথে তাহাদের লড়াইতো লাগিয়াই ছিল। কেদার রায়ের প্রধান দুর্গ ছিল চণ্ডীপুর গ্রামে। এই দুর্গের বর্ত্তমান চিহ্ন কিছুই নাই—সবই গিয়াছে পদ্মার বিশাল গর্ভে। শ্রীপুর হইতে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণে হাটুরিয়া এবং উত্তরে বোধ হয়' ধলেশ্বরী পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটি চওড়া রাস্তা ছিল। এই রাস্তার নাম কাচকী-দরজা। ইহার নাম করণ সম্বন্ধে অনেক জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। তবে রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত দ্রুত সৈন্য চালনাই ছিল বোধ হয় এই রাস্তার উদ্দেশ্য। এ-রাস্তা নড়িয়া ও মোলফৎগঞ্জের মধ্যবর্ত্তী খালের ঠিক পূব পার দিয়া বরাবর দক্ষিণে

চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু এর আগেকার বিস্তৃত বক্ষ আর নাই। রাস্তার উভয় পাশ ক্ষেত কিংবা বাড়ী ঘরের সামিল হইয়াছে। ইহা এখন অনেক জায়গায়ই তিন চার হাত মাত্র পাশ।

নড়িয়া গ্রামের ভূঞারা আগে খুবই প্রতাপশালী জমিদার ছিল। এক সময় ইহারা স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া ঢাকার নবাবের বিরুদ্ধে চৌদ্দ দিন লড়াই পর্য্যন্ত করিয়াছিল। তাহাদের সেই পুরাতন বাড়ীর অতি ম্লানরূপ এখনও নড়িয়ার বুকের উপর অতীত গৌরবের স্মৃতি-স্বরূপ বিদ্যমান। এতো লড়াই হইয়া গিয়াছে নড়িয়া গ্রামে ও ইহার আশেপাশে চারদিকে—এই স[...] লড়াইয়ে এ-অঞ্চলের পূর্ব্বপুরুষদের অনেককে প্রাণও দিতে হইয়া[...] কিন্তু আশ্চর্য্য ও দুঃখের বিষয় এই যে এই সব লড়াইয়ের ক[...] এই অঞ্চলের লোকেরা জানে খুব কমই। চণ্ডীপুরের অনেক ভদ্র সন্তানও জানে না যে তাহাদের গ্রামের মাঝখানে এক সময় মাথা উঁচু করিয়া খাড়া ছিল স্বাধীনতার জলন্ত প্রতীক একটি দুর্গ। কেদার রায়ের মতো একজন বড় বীর যে চার শ বছর পূর্ব্বে তাহাদেরই গাঁয়ের অতি কাছে বাস করিত একথা শ্রীপুরের একটী কৃষকও জানে কি[না] সন্দেহ। "তোমরা কেদার রায়ের নাম শুনেছ"—আমার মুখে এ-প্রশ্নের উত্তরে সে-অঞ্চলের বহু কৃষককে অতি বিস্ময়ে বলিতে [শু]নিয়াছি—সে আবার কার বেটা। ইহাদের হাঁ-করা মুখ দেখিয়া দুঃখে আমার প্রাণ ফাটিয়া গিয়াছে! পুনঃ পুনঃ মনে হইয়াছে —[এ] সবই পরাধীনতার ফল। এ-অঞ্চলে স্কুলের অভাব নাই। কিন্তু বিদেশী প্রবর্ত্তিত শিক্ষার গতি জন-সাধারণের মনে জাতীয় ভাবের বিকাশের দিকে নয়—বরং উল্টা পথে। তাই এ-অঞ্চলের লোকেরা শেখে নাই তাহাদের

নিজেদের বাপ দাদাদের কথা—যাহা শিখিলে তাহাদের সংকীর্ণ বুক ফুলিয়া দ্বিগুণ হইত—যাহা জানিলে তাহাদের প্রাণ পাগল হইত তাহাদের হারানো বহু সাধের স্বাধীনতা লাভের জন্য—যাহা শুনিলে তাহারা আর বসিয়া থাকিতে পারিত না স্ত্রীর আঁচলের আড়ালে নির্জ্জন গৃহের নিভৃত কোণে—ছুটিয়া বাহির হইত দলে দলে প্রাণের মায়া ছাড়িয়া মুক্তি সংগ্রামে যোগ দেওয়ার জন্য তাহাদের বাপ-দাদাদের পথে।

পুরাণ বাড়ী

আমাদের সাবেক বাড়ীর বেশীরভাগই ভাঙ্গিয়া যায় কীর্ত্তিনাশার বড় ভাঙ্গনের সময়। আমাদের ইহারও আগের বাড়ী কোথায় ছিল আমার জানা নাই। তবে আমার জনৈক পূর্ব্বপুরুষ ভূঞাবাড়ীর এক মেয়ে বিবাহ করিয়া ভঙ্গ হন। বিয়ের পর তিনি নড়িয়া গ্রামেই বাস করিতে থাকেন। এই বিয়ের উপলক্ষে তিনি অনেক জমিও পান। কীর্ত্তিনাশার ভাঙ্গনের পূর্ব্বে আমাদের অনেক প্রজা ছিল। তাদের মধ্যে গুরুদাস সাহা ও দীনবন্ধু কুণ্ডুর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই ব্যবসায়ী ধনীদ্বয়ের ব্রাহ্মণ-মনিবের উপর বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা থাকায় ঠাকুরদাদা মদনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে আমাদের অবস্থা মোটের উপর ভালই ছিল। তা-ছাড়া ঠাকুরদাদা ভূঞাদের জমিদারীতে কাজ করিতেন। ভূঞাদের তখনকার জমিদারীর অবস্থাও মন্দ ছিল না। ঠাকুরদাদার মৃত্যু হয় অল্প বয়সে। ঠাকুরমা বিধবা হন পঁচিশ বৎসর বয়সে কোলে একটি ছেলে ও দুটি মেয়েসহ। আমার ঠাকুরদাদার বিয়ে ছিল তিনটি। আমার

বাবা ছাড়া তাঁহার আরো চারটি ছেলে ছিল। ভাইদের মধ্যে বাবাই ছিলেন বয়সে বড়। আমার বাবার নাম ছিল রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। কাকাদের নাম—বরদাকান্ত, সারদাচরণ, উমাচরণ ও নিশিকান্ত।

আমার জন্মের পূর্ব্বেই ঠাকুরদাদার মৃত্যু হয়। আমার ঠাকুরমা উমাতারা দেবীর ছিল ফিট গৌরবর্ণ, একহারা চেহারা। তাঁহার প্রতি কাজকর্ম্ম কথাবার্ত্তার মাঝে এমন একটা স্বাধীনতার সুমধুর তেজ ফুটিয়া বাহির হইতো যাহা আজকালকার মেয়েদের মধ্যে খুব দুর্লভ। তিনি লেখা-পড়া জানিতেন না বটে কিন্তু আর্য্যনারী বলিতে যা বুঝায় তার সবলক্ষণই তাঁহার ছিল।

পিতার বিবাহ

পিতার বিবাহ হয় তের বৎসর বয়সে নড়িয়া হইতে ছয় মাইল দূরে কাঁঠালবাড়ী গ্রামের এগার বৎসর বয়সের কন্যা ব্রহ্মময়ী দেবীর সাথে। কাঁঠালবাড়ী পালং-এর লাগাও উত্তর গ্রাম। আমার মামাবাড়ী আগে ছিল রাজা রাজবল্লভের রাজধানী রাজনগরে। রাজনগর ভাঙ্গা সময় মামাবাড়ী উঠিয়া যায় কাঁঠালবাড়ীতে। রাজনগরের রাজ[illegible] সেনেরা নূতন বাড়ী করে পালং-এ। আমি রাজনগর দেখি নাই। আমার জন্মের পূর্ব্বেই ইহা ভাঙ্গিয়া যায়। ঠাকুরদাদাকে দেখার সুযোগও আমার ঘটে নাই। তাঁরও মৃত্যু হয় আমার জন্মের কিছু আগে। তবে শুনিয়াছি তিনি খুব তেজস্বী পণ্ডিত ছিলেন। ঘটকালী ছিল তাঁর জাত ব্যবসা। আমার মার একটি মাত্র ভাই আর একটি মাত্র বোন ছিল। মামা শ্রীনাথঘটককে আমি বহুবার দেখিয়াছি। তিনি

ছিলেন ছোটখাট, নাদুসনুদুস, তালুতে প্রকাণ্ড টাক, কালো রংএর মানুষ। তিনি বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন না। ঘটকালীই ছিল তাঁর একমাত্র ব্যবসা। এবং ইহা দ্বারাই তাঁহার সংসার কোন মতে চলিত। মাও ছিলেন প্রায় শ্যামবর্ণ, ছোটখাটো। তাঁহার শরীর কোনো দিনই খুব বেশী ভাল ছিল না বটে কিন্তু তাঁহার শ্রমশক্তি ছিল অসীম। আর এতো বেশী না খাটিলে তখন চলিতও না। আমাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা তখন ছিল অতি শোচনীয়। তখনকার মেয়েদের মধ্যে লেখা পড়ার প্রথা প্রায় ছিল না বলিলেই চলে। কিন্তু মা ঠাকুরদাদার কাছে সামান্য কিছু লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন। লেখা পড়া খুব না জানিলেও তখনকার দিনে অভাবের সংসারে দরকারী অনেক গুণের কাজ তাঁহার ভাল জানা ছিল। এখনকার মেয়েরা পল্লী-চিত্র-শিল্প প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু বরণ-ডালা আঁকার জন্য, বিবাহ ও পূজার পীড়ি চিত্রিত করার জন্য মার আমাদের গ্রামে খুবই খ্যাতি ছিল। গ্রামের বিভিন্ন বাড়ীর বিবাহ ও পূজার কুলা ও পীড়ি আঁকিতে তাঁর যৌবন ও প্রৌঢ় বয়সের অনেক সময় কাটিতো। বিভিন্ন রকমের ডালা ও ঝুড়ি তৈরী করিতে তাঁহার মতো ওস্তাদ আমাদের গ্রামে আর কাউকে দেখি নাই। বাড়ীর আনাচে-কানাচে হইতে কাটিয়া আনা মোতরার শুক্‌নো বাকল হইতে তাঁহাকে অতি চিকণ পাটি বুনিতে দেখিয়া গ্রামের অনেকে একেবারে অবাক্ হইতো।

বাবার চেহারা ছিল আর্য্য ধাঁচের—খুব লম্বা চওড়া, গৌরবর্ণ, উঁচু নাক, মোটা মোটা হাড়, দু-হাত প্রায় হাঁটু অবধি লম্বা। মার এ-সব ছিল প্রায় উল্টা। ফলে আমাদের বংশের লোকদের

চেহারায় বহুদিন হইতে চলিয়া-আসা আর্য্য ধাঁচ অনেক খানি লোপ পায়। আমাদের তিন ভাই ও চার বোনের মধ্যে কেউ হইল ফর্সা, কেউ কালো, কেউ লম্বা, কেউ বেঁটে, কেউ বাবার মতো সুস্থ সবল—সংস্কৃতে যাকে বলে 'শালপ্রাংশু মহাভুজঃ' —আর কেউ হইল মার মতো কোমল শরীর, দুর্ব্বল। পরিবারের লোকদের আয়ুও কমিল। ঠাকুরমা বাঁচিয়াছিলেন প্রায় নব্বই বছর। বাবা প্রায় আশি। বড় বোন ও বড় দাদার মৃত্যু হয় বাহান্ন বছরের মধ্যে।

আমার ঠাকুরদাদার ছিল তিন বিয়ে। বাবা যে হঠাৎ কেন কেবল মাত্র একটি বিবাহ করিলেন তাহার কারণ আমি আজও ভালরূপে বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। আধুনিক শিক্ষা যাকে বলে বাবার তা ছিল না মোটেই। মার সাথে বাবার বনিবনাও ছিল অতি অল্প। আর আমাদের বংশে তখনকার অনেকেরই বহু বিবাহ করার রেওয়াজ ছিল। আমার ঠাকুরদাদার সহোদর না হইলেও খুব নিকট সম্পর্কের এক ভাই ছিল। তাকে আমরা সোনাদাদা বলিতাম। তাহার বাড়ী ছিল নড়িয়া গ্রামেই আমাদের সাবেক বাড়ী হইতে অল্প একটু দক্ষিণে। তাহাকে আমি আমাদের নূতন বাড়ীতে অনেকবার দেখিয়াছি। তাহার আগে ছিল নয়টি বিয়ে। একটি লইয়াই ঘর সংসার করিতেন—আর আটটি বোধ হয় থাকিত বাপের বাড়ী। তাহার এই আদরের স্ত্রীকে আমরা সোনাদিদি বলিতাম। এই সোনাদিদির মৃত্যুর পর বিরহে মনের জলন্ত দুঃখের নিবৃত্তির জন্য আরো ছয়টি বিবাহ করিয়া একটিকে লইয়া ইনি হঠাৎ একদিন বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হন। এরূপ দৃষ্টান্ত আরো দেওয়া যাইতো।

কিন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের এবিষয়ে মনোভাব বুঝানোর জন্য একটিই বোধ হয় যথেষ্ট।

পিসীমা

আমার দুই পিসীমার মধ্যে বড়জনের নাম ধনেশ্বরী দেবী। ছোটজনকে দেখি নাই—তার নামও জানি না। বড় পিসীমার বিয়ে হয় বিক্রমপুর উত্তরপাড়ের রাসমোহন মুখুজ্যের সাথে। পিসেমশায়ের আগেও এক বিয়ে ছিল। তা সত্বেও বড় পিসীমার সাথে বিয়ের সম্বন্ধ স্থির করিয়া বিয়ের জন্য তাহাকে আনা হয় আমাদের সাবেক বাড়ীতে। বিয়ের আসরে পীড়ির উপরে বসা পিসেমশায়ের পাশে বিয়ের জন্য আনিয়া বসানো হয় চেলী কাপড় পরা আমার দুই পিসীকেই। পিসেমশায় তো একেবারে অবাক। রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন—একি কথা—একটির কথা ব'লে এনে দুটি মেয়ের বিয়ে দেওয়া হচ্ছে কেন? উপস্থিত সকলে ব্যস্তভাবে বলিল—চুপ, চুপ—একথা কি এখন মুখে আনতে আছে? ভদ্রলোকের জাত যায় যে! পিসেমশায় বেঁকে বলিলেন,—তা হ'তে পারে না, আমার আরো একটি বিয়ে আছে, এতো বিয়ে আমি ক'রতে পারবো না।

নড়িয়ার ঘটক চৌধুরী সমাজ বিক্রমপুরে অতি প্রসিদ্ধ। অনেক দিনের পুরাতন জমিদার বলিয়া তখন তাঁহাদের প্রতিপত্তি ছিল খুব বেশী। তাঁহাদের অনেকেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের বিশেষ অনুরোধ ও পীড়াপীড়িতে পিসেমশায়কে উপরোধে ঢেঁকি গেলার মতো সেই দুটি বিবাহ করিয়াই সেখান হইতে বিদায় লইতে হয়।

ছোট পিসীমা হঠাৎ একদিন দিনে দুপুরে গলায় দড়ি দিয়া মারা যান। মনের কি প্রচণ্ড দুঃখে যৌবনের প্রথম প্রভাতে এই সুন্দর ভুবন ছাড়িয়া অজানা দেশের অনিশ্চিত পথ স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইলেন তার কারণ আন্দাজে কতকটা বোঝা গেলেও পুরাপুরি কখনো জানা যায় নাই। তাহার এই নির্মম আত্ম বলিদানে আমাদের তখনকার পরিবারের শুভ্র ললাটে চির কলঙ্কের কালো লেপ পড়িল—পরিবারের আশা-আনন্দ-উজ্জ্বল-বুকের মাঝে দুঃখের একটি বিষাক্ত কাঁটা ফুটিয়া রহিল। দুঃখে বুক ফাটিলেও ঠাকুরমা কোনদিন মুখ ফুটিয়া একথা আমাদের বলেন নাই। পঁচিশ বৎসরের সময় তিনি বিধবা হন। অকালে তাঁর একটি আদরের মেয়ে এভাবে মারা যায়। তবুও তাঁহার শুভ্র মুখ চিরদিন ছিল আনন্দময়ী ভগবতীর মতো হাসি-উজ্জ্বল। কতো দুঃখের বোঝা তাঁহার বুকের উপর দিয়া মর্মস্থল পিষিয়া চলিয়া গিয়াছে—কতো কঠোর পরীক্ষায় তাঁহাকে উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছে কিন্তু তিনি কখনো দমেন নাই। চিরদিন তিনি সব সহিয়াছেন বীর-হৃদয়া দ্রৌপদীর মতো। তিনি ছিলেন দারিদ্র্য ঘেরা আমাদের ক্ষুদ্র পরিবারে আশার উজ্জ্বল প্রদীপ।

বড় পিসীমার ছিল মানুষের মন ভোলানোর অদ্ভুত ক্ষমতা। পিসেমশায় কাজ করিতেন কুচবিহার সহরে এক জমিদারের কাছারীতে। বিয়ের অল্প পরেই পিসী-মা সেখানে গিয়া তাঁর সাথে বাস করিতে লাগিলেন। ফলে আগের স্ত্রীর কথা পিশেমশায়ের মনেও রহিল না।

আগেই বলা হইয়াছে আমার ঠাকুরদাদা মারা যান খুব কম বয়সে। অল্প বয়সেই সমস্ত পরিবারের ভার পড়ে পিতার স্কন্ধে। তাই

বাবার লেখাপড়ার সুযোগ খুব বেশী ঘটে নাই। আর সেদিনে আমাদের মতো সাধারণ পরিবারের ছেলের পক্ষে ইংরাজী শেখা ছিল খুবই কঠিন। ইংরাজী বিদ্যালয় আমাদের অঞ্চলে ছিল না একটিও। বাবাকে অল্প বয়সেই চাকুরী করিতে যাইতে হয় দক্ষিণ সাহবাজপুরের কোনো জমিদারের কাছারীতে। ১৮৭০ সালে সাহবাজপুরের বড় তুফান ও বন্যার সময় তিনি সেখানেই ছিলেন। সে-সময়ে ঘরের চালে ঝুলিয়া থাকিয়া তিনি কোনোরূপে বাঁচিয়াছিলেন একথা বহুবার তাঁহার নিজ মুখেই শুনিয়াছি। তারপর সাহবাজপুরের চাকরী ছাড়িয়া তিনি যান কুচবিহারে—পিসেমহাশয়ের ওখানে—নূতন চাকরীর খোঁজে।

বোন-দিদির বিবাহ

কীর্তিনাশার ভাঙনের পূর্ব্বে সাবেক বাড়ীতে যে-ঘটনাটি আমাদের পরিবার ও আমার ভাবী জীবন-ধারার উপর বিশেষ আধিপত্য বিস্তার করে তাহা আমার বড় দিদির বিবাহ। বড় দিদিকে আমরা বোন-দিদি বলিতাম। বোন-দির বিয়ে হয় আমার জন্মের দু'তিন বৎসর আগে তার বারো তেরো বৎসর বয়সের সময়। পূর্ব্ব নড়িয়ায়, আমাদের বর্ত্তমান নূতন বাড়ীর অল্প একটু দক্ষিণে, অভয় মুখুজ্যের বাড়ী। তারই তৃতীয় ছেলে নবীন মুখুজ্যের সাথে তার বিয়ে হয়। অভয় মুখুজ্যে ছিলেন লোনসিংহের জমিদার দাসবাবুদের দেওয়ান। তাকে আমি কখনো দেখি নাই। তবে যতোটা শুনিয়াছি তিনি রসিক অথচ রাশভারী লোক ছিলেন। তার সংসারের বন্দোবস্ত ছিল অতি পরিপাটি। সেই সুবন্দোবস্তের

ফলেই নড়িয়ার মুখুজ্যে বাড়ী আজ আমাদের অঞ্চলে এতো মাথা উঁচাইয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছে।

নবীন মুখুজ্যে তখন চাঁদপুরে মোক্তারি করিতেন। তার আগের স্ত্রীর হেম নামে একটি ছেলে ছিল। সেই স্ত্রীর মৃত্যুর এক বছর পরেই আমার বোন-দিদির সাথে তার বিয়ের সম্বন্ধ উপস্থিত হয়। আবার বিয়ের কথা শুনিয়াই নবীন মুখুজ্যে তেলে-বেগুণে জলিয়া উঠিলেন, বলিলেন—একটি ছেলে আছে, আবার বিয়ে করলে তাকে যে পায়ে ঠেলে পর ক'রে দিতে হবে, তা আমার দ্বারা হবে না। নবীন মুখুজ্যের কর্ত্তব্যের মাপ-কাঠি ছিল চিরদিনই একটু বড়। কিন্তু তার পিতার ও গ্রামের আর দশজনের বিশেষ পীড়াপীড়িতে শেষে তাকে এই বিয়েতে মত দিতে হয়। বর তো ঠিক হইল কিন্তু বিপদ বাধিল কন্যা পক্ষের আত্মীয়দের লইয়া। রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর সন্তান আমরা কৃষ্ণঠাকুরের সন্তান মুখুজোদের চেয়ে কুলে একটু বড় হওয়ায় কাকারা ঘোর আপত্তি তুলিলেন, বলিলেন—কুল খুইয়ে বিয়ে দেওয়া চ'লবে না কিছুতেই—বর্ত্তমানে একটু সুবিধা হ'লেও শেষে অন্য মেয়েদের নিয়ে অনেক অসুবিধায় পড়তে হবে। বাবা ছিলেন চিরকালই একগুঁয়ে, বলিলেন—ছেলেটি যখন ভাল তখন এখানেই বিয়ে দেওয়া উচিত, কুল ধুয়ে জল খাবো নাকি? দু পক্ষে বেশ রেষারেষি চলিল। মতান্তর ঠেকিলো গিয়া মনান্তরের কোঠায়। বাবাও ছাড়বার পাত্র নন। তিনি কাকাদের বলিলেন—বিয়ে এখানে হবেই, তোমাদের যা ইচ্ছা কর গিয়ে। তারাও রাগিয়া বলিলেন—আমরা শরতীর হাতের জলতো খাবোই না, ছোঁব না পর্য্যন্ত। আমার বড়দি শরৎ কামিনীর সকলের আদরের ডাকনাম

ছিল শরতী। বিয়ের পর চাঁদপুরের বাসায় মাসের পর মাস বিনা দ্বিধায় দু'বেলা খাইতে কিন্তু আমি কোনো কোনো কাকাকে নিজের চোখে বহুবার দেখিয়াছি।

কীর্তিনাশার ভাঙ্গন

বোন-দির বিয়ের পরের বড় ঘটনাই রাজবল্লভের রাজধানী রাজনগরের ভাঙ্গন। রাজনগর ছিল আমাদের গ্রাম হইতে সাত আট মাইল পশ্চিমে। শ্রীপুরের টঁ্যাক হইতে আরম্ভ করিয়া চণ্ডীপুর মোলফৎগঞ্জ হইয়া নড়িয়ার উত্তরপ্রান্ত ঘেসিয়া খানিক আগাইয়া এই ভাঙ্গন হঠাৎ পশ্চিম নড়িয়ার মাঝ দিয়া মোড় ঘোরায় দক্ষিণ দিকে। এই আকস্মিক মোড় ঘোরার কারণ বুঝা কঠিন। এর পর এ বরাবর দক্ষিণ দিকে ভোজেশ্বর কোটাপাড়া হইয়া ডোমেশ্বর অবধি যায়। এর পর কিছুদূর অবধি পশ্চিম দিকে গিয়া বেঁক দেয় উত্তর দিকে। এই ভাঙ্গনের ফলেই রাজনগর ও তার আশপাশের অনেক পল্লী চিরতরে লোপ পায় নদীগর্ভে। রাজবল্লভের কীর্ত্তি রাজনগরের এই শোচনীয় পরিণামে বহু কবি ও সাহিত্যিক অনেক চোখের জল ফেলিয়াছেন। রাজবল্লভ সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও কর্ম্মকুশলতার দ্বারা আপন জীবনে অনেক উন্নতি করিয়াছিলেন একথা স্বীকার করিতে হইবে সকলকেই। সমাজ সংস্কারের দিকেও তাঁর বিশেষ মনোযোগ ছিল। তিনি নিজের তরুণী বিধবা কন্যার বিষাদ-মলিন মুখ দেখিয়া সমাজে বিধবা বিবাহ প্রবর্ত্তনের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন এবং তখনকার হিন্দু সমাজের নেতা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বিরোধিতা বশতঃই তাঁহার প্রাণের এই ইচ্ছা কাজে

অসফল রহিয়া যায়—ইহাও খুব সত্য। কিন্তু তিনি যে দেশদ্রোহী ছিলেন তা অস্বীকার করার বো নাই। অত্যাচারী সিরাজের অনেক হিন্দুললনার উপর কু-নজর পড়িয়াছিল বলিয়াই বিদেশীর সাহায্যে তাহাকে তাড়ানোর চেষ্টা চিরকালই ঘৃণিত দেশদ্রোহীতা বলিয়া বিবেচিত হইবে। বহুগুণে গুণী বিভীষণের মতো এই দলের সকলেই চিরদিন ভারতবাসীর চোখে ঘৃণার পাত্র হইয়া থাকিবে। তাই রাজা রাজবল্লভের সেই কীর্ত্তি চিরতরে বিলীন হইয়া যাওয়ায় এক ফোঁটা জলও কোনো দিন আমার চোখের কোণে বাহির হয় নাই। বরং অন্তরের তলদেশ মথিত করিয়া প্রকৃতিরাণীর চরণতলে এই স্তুতি মাল্যই লুটাইয়া পড়িয়াছে—হে রাণি, এ ভালই হইল যে অকৃতীর এই ধ্বজা আমার জন্মভূমির এতো কাছ হইতে চিরতরে লোপ পাইল।

ভাঙ্গনের পর

এই ভাঙ্গনে আমাদের সাবেক বাড়ীর প্রায় সবটাই নদীগর্ভে গেল, শুধু বাকী রইল পূবপ্রান্তের সামান্য একটু। পুরাণ বাড়ী বোধহয় আমাদের ছাড়িতে হয় ভরা বর্ষার মাঝে। পুরাণ বাড়ী ছাড়িয়া নূতন বাড়ী আসার চিত্রখানি এখনো আমার হৃদয়পটে অতি উজ্জ্বল রঙে আঁকা আছে। বয়স তখন আমার চার কি পাঁচ, বেলা প্রায় দুপুর—চারদিক রোদে খাঁ খাঁ করিতেছে। এমনি সময় আমি আসিতে ছিলাম আমাদের গ্রামের বুক বিদীর্ণ করিয়া চলা ভাদরের বর্ষায় ভরা ছোট একটি খাল বাহিয়া একখানা এক-বৈঠে ডিঙ্গীর পাটাতনের উপর বসিয়া। পিছনের গলুইয়ে বসিয়া বৈঠা বাহিতেছিল আমাদের বড় আদরের পুরাতন ভৃত্য ভগবান কাকা। তার সাথে

আমাদের এ-মধুর সম্পর্ক পাকিয়া ওঠার গোড়ার ইতিহাসের খোঁজ নেওয়ার প্রয়োজন এর আগে কোনো দিন অনুভব করি নাই। এই সব পুরাণ মধুর স্মৃতি নিত্য নূতন রূপ ও রঙে হৃদয় মাঝে যতোই ভাসিয়া উঠিতেছে প্রাণভরা বেদনার সাথে ততোই শুধু মনে হইতেছে কেন তখন ভাল করিয়া তলাইয়া জিজ্ঞাসা করি নাই এসব কথা ঠাকুরমাকে। তাঁর তো এসবই জানা ছিল, শুনিয়া রাখিলে আজ কাল কতোই না আনন্দ পাইতাম সেই সব পুরাণো কথা উলটে পালটে বার বার ভাবিয়া। ভগবান কাকা সম্বন্ধে শুধু এই টুকুই জানি—সে ছিল আমাদের অতি আপন লোক। সে নিঃশেষে উজাড় করিয়া দিয়াছিল আমাদের উপর তার হৃদয়ের যতো [illegible], স্নেহ ও ভালবাসা। শুনিয়াছি ছোটকালে আমাকে দুধ খাওয়ানো ছিল মুস্কিলে ব্যাপার। মুখের গোড়ায় দুধের ঝিনুক ধরিলেই আমি মাথা নাড়িয়া গোঁ গোঁ করিতে করিতে হাত-পা ছুড়িতাম কখনো মার পিঠে—কখনো বুকে। দুধ খাওয়ানোর ব্যাপারে আমাকে প্রায়ই মার খাইতে হইতো মার কাছে। আমার চীৎকার শোনামাত্র ভগবান কাকা ছুটিয়া আসিয়া কাঁধে তুলিয়া আমায় লইয়া যাইত উত্তাল-তরঙ্গ গ্রাসোন্মুখী কীর্ত্তিনাশার তীরে, কখনো বা বড় বড় আমগাছের স্নিগ্ধ ছায়া তলে। উন্মত্ত নদীরও শ্যামল তরুর এই বিপরীত শোভা দর্শনে আমার সেই শিশু প্রাণ না জানি তখন কতো বিচিত্র ভাবে ভরিয়া যাইতো।

নয়াবাড়ী

পূব-নড়িয়ায় কৈলাস বাড়ুয্যের বাড়ীর পুকুরের দক্ষিণ পারে এক পোড়ো বোরো-খোলার একটা উঁচু ভিটায় আমরা পাতনা পাতিলাম সেই দারুণ বর্ষাকালের জন্য। বাবার ইচ্ছা ছিল বর্ষাশেষে ভাল একটা জায়গা দেখিয়া সেখানে বাড়ী করার। কিন্তু থাকিতে থাকিতে শেষ অবধি সে বাড়ীতেই থাকা হইল। নূতন বাড়ীর আর কোনো চেষ্টা করা হইয়াছিল বলিয়া আমার মনে হয় না। আর আমাদের তখনকার আর্থিক অবস্থায় সেরূপ চেষ্টা সম্ভবও ছিল না। আমরা কাকাদের ডাকিতাম পুতি বলিয়া, যেমন ঠাকুর-পুতি, সোনাপুতি, দুধুপুতি। কিন্তু ছোটকাকাকে ছোটকাকাই বলিতাম। বাড়ী ভাঙ্গার পর ঠাকুর-পুতি অর্থাৎ বড়-কাকা নূতন বাড়ী করিলেন কার্তিকপুরের কাছে কোনো গ্রামে। সোনা-পুতি অর্থাৎ মেজ কাকা সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় নূতন বাড়ী করিলেন লোনসিংএ। আমাদের পরিবারে এই সময়ে আর্থিক অবস্থা সোনা-পুতিরই ছিল সবচেয়ে ভাল। তিনি কলিকাতার মেডিক্যাল স্কুল হইতে পাস করিয়া সরকারী চাকুরী লইয়া রঙপুর যান। সেখানে যাওয়ার কিছুদিন পরে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়। মনের দুঃখে সেই চাকুরী ছাড়িয়া তিনি লোনসিংএর বাবুদের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ডিস্‌পেনসারীর ডাক্তার হন। এই ডাক্তারখানা বাবুদের বাড়ীর কাছেই ছিল এবং লোনসিংহএ নূতন বাড়ী করায় সোনাপুতির সকল দিক দিয়েই সুবিধা হইল। ডাক্তারী ব্যবসায়ে হাত-যশ থাকায় তাঁর অর্থাগমও ছিল যথেষ্ট, কিন্তু স্ত্রীর পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর পর

বার বার বিয়ে করায় শেষ-জীবনে তাঁকে অশেষ রকমের কষ্টভোগ করিতে হয়। বহু বিয়ে-পাগল লোকদের এই একটি কথা বিশেষ ভাবে মনে রাখা উচিত—ভোগের জন্য সংসারে সকলের প্রাণই পাগল কিন্তু প্রকৃত ভোগ সম্ভব ভোগের পিছনে পাগলের মতো অসংযত ভাবে ছুটাছুটী করিয়া নহে, ভোগ প্রবৃত্তির উন্মাদ গতির যথাসম্ভব সংযম দ্বারা।

তুধুপুতি অর্থাৎ সেজ কাকা নূতন বাড়ী করিলেন নড়িয়া গ্রামেই পূর্ব্ব বর্ণিত সোণাদাদা নবীন বাড়ুয্যের বাড়ীর এক কোণে। তুধু-পুতির একমাত্র ছেলে নকড়ি এখন কাজ করে গয়ায় কোনো পাণ্ডার অধীনে। সাথে সাথে গয়া মন্দিরের চিত্র বিক্রী করিয়াও সে বেশ দু-পয়সা আয় করে। সে এখন পর্য্যন্ত বিবাহ করে নাই, আর কখনো করিবে বলিয়াও মনে হয় না। বহু কষ্টে উপার্জ্জনের সব টাকা সে খরচ করিয়াছে গয়ায় বাঙ্গালীদের জন্য একটি ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠায়। এ পাগলা হাওয়ার ছোঁয়াচ লাগিল তার প্রাণে কোন দিক হইতে অবাক মনে অনেক সময় তাহাই ভাবি। সে বছর গয়া কংগ্রেসের সময় তার সাথে দেখা হইয়াছিল। দেখিলাম সে এখনো আছে আগের মতো লিকলিকে হাসিমুখ নকড়ি। দেখা হওয়া মাত্র কতো প্রেমের সাথে সে আমায় জড়াইয়া ধরিল—কতো আবেগ ভরা অন্তরে দেখাইল তার প্রাণের সমস্ত দরদ দিয়ে তৈরী সাধের সেই ধর্ম্মশালাটি।

ছোটকাকা তারাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় কাজ করিতেন বরিশালে পুলিস বিভাগে। তিনি কোন নূতন বাড়ী করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। সারাজীবনই তাঁহার কাটিয়াছে চাকুরী স্থলে, ছেলে পিলে বিহীন অবস্থায়।

বড় কাকার বড় ছেলে চিন্তাহরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা বলি বড়দাদা। তিনি এখন জলপাইগুড়ি ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডে কাজ করেন। সেখানকার প্রসিদ্ধ আর্য্য নাট্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা এবং বর্ত্তমান প্রাণও তিনি। তিনি ছোটকাল হইতে মেয়ে-চরিত্র অভিনয়ে সুপটু। এখনও বুড়া বয়সে তিনি মেয়ে-রূপে পাদপ্রদীপের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সেখানকার দর্শকদের মুগ্ধ করেন। এই অভিনয় করার ক্ষমতা আমাদের বংশের বর্ত্তমান পুরুষদের অনেকেরই আছে। আমার দাদা নলিনীনাথ বন্দ্যোপা[illegible] চাঁদপুরে বড় বড় পুরুষ চরিত্র অভিনয় করিয়া খুবই খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। দাদার চেহারা খুবই সুন্দর ছিল এবং বড় বড় পার্টে তাহাকে মানাইতো-ও ভাল। আমার মেজদা গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়েরই এ-বিষয়ে ক্ষমতা ছিল আমাদের সকলের মধ্যে সব চেয়ে বেশী। তিনি অনেক জায়গায় বড় বড় চরিত্রের অভিনয় করিয়া সুনামও লাভ করিয়াছেন। আমার বিশ্বাস অভিনয় করাই তাঁহার জীবনের ব্যবসায় হইলে তিনি এ-পথে স্থায়ী খ্যাতি রাখিতে পারিতেন। তাঁহার চেহারাও ছিল এই কলার সম্পূর্ণ উপযোগী। এরূপ সুগঠিত সুন্দর দেহ বাঙ্গালীর মধ্যে খুব কমই দেখা যায়। অভিনয় ক[illegible] যা কিছু সামান্য ক্ষমতা আমার জন্মিয়াছিল তার মূলেও [illegible] মেজদার প্রেরণা। আমার শৈশবে কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত অনেক নাটকই তিনি আমায় পড়াইয়া শুনাইতেন। তাঁহার আবৃত্তির সুন্দর ঢং সব নাটককেই প্রাণময় করিয়া তুলিতো আর আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুগ্ধচিত্তে তাহা শুনিতাম। বারো তেরো বৎসর বয়সে শোনা নাটক আজো যেন হৃদয়ে উজ্জ্বল ভাবে আঁকা রহিয়াছে। কলিকাতার

ষ্টেজে অনেক নাটকের অভিনয় দেখিয়াছি কিন্তু দু-একজন ছাড়া কোন অভিনেতাকেই মেজদার সমান মনে হয় না।

মেজদার প্রভাবে আমাকে কলেজ জীবন হইতে আজ পর্য্যন্ত মফঃস্বলের অনেক নাট্য সম্প্রদায়ের সম্পর্কে আসিতে হইয়াছে। ১৯০৭ সালে কুচবিহার কলেজে ছেলেদের সরস্বতীপূজা উপলক্ষে রঘুবীর নাটক অভিনয়ের যাবতীয় বন্দোবস্ত সম্পাদকরূপে আমাকেই করিতে হইয়াছিল। ফরিদপুরে ডাক্তারি করার সময় সেখানকার ড্রামাটিক এসোসিয়েশনের একজন সম্পাদক ছিলাম আমি। বর্ত্তমানে কুমিল্লা আশ্রমের বাৎসরিক উৎসবের সময় অভিনয়ের বড় চরিত্রের অংশ আমাকেই লইতে হয়। নাটকের বাতিক আমার মাথায় থাকার দরুণই শ্রীগৌরাঙ্গ, মুক্তির পথে, মিলন-যজ্ঞ, মুক্তিবীণা প্রভৃতি নাটক লেখা আমার পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল।

পুব-নড়িয়া

কৈলাস বাঁড়ুয্যে মশায়ের পুকুরের দক্ষিণ পারে আমাদের নূতন বাড়ী করার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই বাড়ীর ঠিক দক্ষিণেই অভয় মুখুজ্যেদের প্রজা বারুইদের বাড়ী, বারুইদের ও আমাদের বাড়ীর মাঝে একটি সঙ্কীর্ণ খাল, খালের দক্ষিণ পারে ঘন জঙ্গল— ঠিক উত্তর পারে আমাদের বাড়ী। এই ঘন জঙ্গলের মাঝথেকে মাথা উঁচুকরে ওঠা বাঁশের ঝাড় ও বড় একটা উড়িয়া-আম-গাছের জন্ত আমাদের বাড়ীর আলো বাতাসের পথ প্রায় বন্ধ ছিল। বাড়ীর অতি কাছের বাঁশগুলির ঝড়ে দোলান সরু আগা আমাদের ছনে ছাওয়া ঘরগুলির প্রায় মাথার উপর আসিয়া লুটাইয়া পড়িত। বাড়ীর

উঠান অনেক সময় ছাইয়া যাইতো বাতাসে উড়িয়া আসা শুক্‌নো বাঁশ পাতায়। উড়িয়া আম গাছটিকে সন্ধ্যার পর মনে হইতো যেন একটা প্রকাণ্ড দৈত্য হাঁ করে দাঁড়িয়ে আমাদের উদ্দেশ্যে আসা সবটুকু দক্ষিণে বাতাস নিঃশেষে গ্রাস করিতেছ। বাড়ীর পূর্ব্বে ও পশ্চিমে ছিল বারুইদের কাটা নানা রকম জঙ্গল ও আবর্জ্জনায় ভরা বড় বড় খাদ। বর্ষাকালে হাঁটু-জলে-ভাসা উঠানে ছোটখাট নৌকা চলাফেরা করিতো।

বাড়ীতে তখন সব শুদ্ধ ছিল পুরাণ বাড়ী হইতে আনিয়া নূতন করিয়া তোলা দুখানা ছনের ঘর। উত্তরের ভিটির খানা একটু বড়—চৌচালা। পশ্চিমের ভিটির পাকের ঘর খানা ছোট—দো-চালা। ঠাকুরমার পাক হইতো উত্তরের ভিটির পশ্চিমে ঘরের সঙ্গে লাগানো একখানা এক চালায়। ঘরের কাঁচা ভিটি বর্ষার জলে ধ্বসিয়া পড়ায় ভাঙ্গা পিড়া দিয়া সাপ ব্যাঙ বিনা বাধায় ঘরের ভিতর ঢুকিতো। চৌকী না থাকায় মেঝের উপর হোগলা, পাটী ও কাঁথা বিছাইয়া শয্যা তৈরী হইতো। কতো ভয়েই যে সে ভাঙ্গা ঘরে রাত কাটিতো মনে হইলে অন্তের প্রাণ শিউরে উঠিলেও আমার মনে আনন্দ হয়। শুধু ভাবি কোনো কাজের জন্য ভগবান যাকে এই পৃথিবীতে পাঠান তার সেই কাজ শেষ না হওয়া অবধি তিনি তাকে আপন কোলে ফেরার জন্য ডাকেন না। এর পরীক্ষা আশ্রমের প্রথম জীবনেও অনেকবার মিলিয়াছে। তিন শ বছরের পুরাণো পুকুরের সাপের গর্ত্তে ভরা পারে আমাদের কুমিল্লা আশ্রমের প্রথম প্রতিষ্ঠা। এতো জাতি সাপ পায়ের সামনে পড়া সত্ত্বেও যে সাপে কাটায় আশ্রমের কেউ মরে নাই এ কথা মনে হইলে প্রাণ এখনো বিস্ময়ে ভরিয়া উঠে।

ঠানদিদি

আমাদের নূতন বাড়ীতে আসার সময় কৈলাস বাঁড়ুয্যে মশায় জীবিত ছিলেন না। তাঁর অল্প বয়সের ছেলে রাসবিহারী ও বিনোদই ছিল সে-বাড়ীর কর্ত্তা। এদের অবস্থা আগে ভাল থাকিলেও তখন খুবই খারাপ হইয়াছিল। খাওয়া দাওয়া না চলায় তাহাদের বাধ্য হইয়া যাইতে হয় রাহাপাড়া গ্রামে মামার বাড়ীতে। এদের চলিয়া যাওয়ার পর সে-বাড়ীতে থাকে শুধু কালীতারা দেবী নামে তাদের দূর সম্পর্কের এক বুড়া বিধবা। সেই ছিপছিপে ছোট-খাট গাল-ভাঙ্গা শ্যামবর্ণের বুড়ীকে আমরা ডাকিতাম ঠান-দিদি। তার প্রাণে অসীম সাহস ছিল বলিয়াই সেই বন-জঙ্গল-ঘেরা বড় বাড়ীখানা আমাদের মতো দুর্দ্দান্ত ছেলেদের প্রবল আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া প্রায় শেষ জীবন অবধি একলা থাকা তার পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল। আমাদের পুরানো বাড়ীতে আম জাম ও কাঁঠালের অনেক গাছই ছিল কিন্তু এই নূতন বাড়ীর ছাড়া ভিটাতে ছিল না কিছু-ই। অথচ ছেলে বয়সের লোভও ছিল কম নয়। মাঘ মাসে ভোর হইতে না হইতেই টিপি টিপি পায়ে ছুটিয়া যাইতাম ঠানদিদির বাড়ীর উত্তর পশ্চিম কোণের কুল গাছ তলায়। বুড়ীর সজাগ কানকে ফাঁকি দেওয়া ছিল অসম্ভব। তাড়াতাড়ি ঝাপ ঠেলিয়া চিকণ কালো লাঠি হাতে বুড়ী বাহির হইতো মুখে বলা যায় না এমন সব ভাষার বাণ ছুড়িতে ছুড়িতে। কোঁচড়-ভরা কুল লইয়া সেই শেষ রাত্রের আঁধারে জঙ্গলের পথে পালানো এক-এক দিন বড়ই মুস্কিল হইতো। গাছে উঠিয়া লটকা, কাউ, ডেউয়া,

গোলাপজাম পাড়িতে তাহার কোনো আপত্তি ছিল না বটে কিন্তু বৈশাখী ঝড় পড়িতে না পড়িতে ঘোর সন্ধ্যায় আমি যে সিঁদুরে ও বাঁশবনে আম গাছের তলায় লাল টুকটুকে পাকা আম গুলি কুড়াইতে আরম্ভ করিতাম তাহা সেই নির্দয় বুড়ীর সহ্য হইতো না কিছুতেই। আমি যে ছেলে মানুষ, আমার যে তৃষিত নয়নদুটি সর্বক্ষণ পড়িয়া থাকে তার গাছের পাকা আমগুলির দিকে, সারা-দিন আমি যে ঘুরে বেড়াই সেই গাছগুলির আশ পাশে আঙ্গুল দিয়া পাকা আমগুলি গুনিতে গুণিতে, আর দুএকটা কাক ডালে বসামাত্র কেবলি ভাবি তাদের ঠোকরে যদি এক আধটা আম পড়ে —এই বুড়ি যদি প্রাণ দিয়া একবার আমার সেই সব মনের কথা ভাবিতো, তবে বুঝিতো প্রাণের কোন পাগল টানে আমার মতো ছোট ছেলে যাইতে পারে আঁধার-ঘেরা সে সব গাছের তলে এতো ঝড় বৃষ্টির মাঝে। কিন্তু বুড়ী তাড়া করিয়া আসিতো হাতে সেই কালো লাঠিখানা লইয়া এবং মুখে সেই সনাতন গালি বকিতে বকিতে। বুড়ী শুধু তাড়া করিতো আমাকেই নয়। লোনসিংএর বাবুদের পাইকদেরও সে ভয় করিতো থোড়াই। একবার সময় মতো খাজনা দিতে না পারায় পাইকেরা বাড়ীর দক্ষিণ দিকের ঝাড়ের বাঁশ কাটিতে গেলে, যে-তেজের সাথে সে গিয়াছিল কালো লাঠিখানা উঁচাইয়া সেই বাবরীওয়ালা লাল-চোখ মোটা-লাঠি-হাতে পাইকদের পানে— তা আমি জীবনে কখনো ভুলিব না। তখনকার অশিক্ষিত মেয়েদের তুলনায় তথাকথিত শিক্ষিত বর্তমান মেয়েদের অধিকাংশের হৃদয়ের কম সাহসের কথা মনে হইলে শুধু ভাবি কি ছিলাম ও কি হইয়াছি। স্ত্রী স্বাধীনতা তখনকার দিনে না থাকিলেও তিনি স্বাধীন-

ভাবে নানা গাঁয়ের আত্মীয় স্বজনদের বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইতেন। এখনকার মেয়েদের সে বুকের পাটাই যেন নাই। বাড়ী হইতে বাহির হইলেই তাহাদের হাত পা কাঁপে, বুক দুর্ দুর্ করে। পরাধীন জাতির টাকা পয়সার লোকসানই সব চেয়ে বড় লোকসান নয়—প্রাণ উৎসের শুকানোই সব চেয়ে সর্ব্বনেশে।

মহা পুরুত বাড়ী

ঠানদিদির পুকুরের পূব-পারে ছিল মহা পুরুত বাড়ী। সেই বাড়ীর তখনকার কর্ত্তা কালাচাঁদ অগ্রদানী আমাদের ছিলেন পরম হিতৈষী বন্ধু। সেই দোহারা চেহারার কালো ব্রাহ্মণের কথা জীবনে ভোলা অসম্ভব। তিনি বয়সে বাবার চেয়েও বড় ছিলেন বলিয়া আমরা তাঁহাকে ডাকিতাম জেঠা মশায়। মহা পুরুতের কাজ করিতে তাঁহাকে প্রায়ই যাইতে হইতো দূর গ্রামে। অনেক রাতে বাড়ী ফিরিয়াই প্রথম খোঁজ লইতেন আমাদের বাড়ীর সকলে কেমন আছে। আমাদের বাড়ীতে কোনো পুরুষ না থাকার অভাব এই জেঠা মশায়ের জন্য কখনো অনুভব করিতে হয় নাই। বাজার হইতে জিনিষ পত্র কিনিয়া আনার সব ভারই ছিল তাঁহার উপর।

বৈদিক বাড়ী

পুকুরের উত্তর-পারের একটু দূরেই বৈদিক বাড়ী। সংস্কৃত লেখা-পড়ার দিক দিয়ে তখনকার দিনে আমাদের অঞ্চলে এই বৈদিক বাড়ীর বিশেষ খ্যাতি ছিল। এই বাড়ীর দক্ষিণের ঘরের শশী স্মৃতিরত্ন মশায়ের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল দেশ বিদেশে।

তাঁহার টোলের সৌম্যদর্শন পড়ুয়াদের আমাদের বাড়ীর পূবের রাস্তায় যাইতে দেখিয়া অনেক সময় মনে হইতো তাহাদের মতো সংস্কৃত পড়িতে। সেই বাড়ীর পশ্চিমের ঘরের গুরুনাথ পাঠকের নাম শেষ অবধি প্রচারিত হইয়াছিল সুদূর কাশী পর্য্যন্ত। তিনি শেষ জীবনে শুধু কথকতা দ্বারা মাসে হাজার টাকা অবধি উপার্জ্জন করিতেন, এমনি ছিল তার এ-বিষয়ে দক্ষতা। ছোট কালে গ্রামের অনেক বাড়ীতেই তার কথকতা হইতো। সে-সব শুনিতে আমার বড়ই ভাল লাগিতো। প্রতি সন্ধ্যায় দুঘণ্টা ধরিয়া কথকতা হইতো। এই দু-ঘণ্টা অঝোরে চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে মুগ্ধ প্রাণে আমি পূর্ব্ব পুরুষদের গৌরবমাখা পুণ্য কাহিনী সব শুনিতাম। গুরুনাথ পাঠককে আমরা ডাকিতাম গুরুনাথ কাকা। উত্তরের ঘরের মনোমোহন পাঠক কথকতায় গুরুনাথ কাকার মতো অতো বড় না হইলেও মোটের উপরে মন্দ ছিলেন না। গুরুনাথ কাকার শিষ্য তিনি, কাকার অনেক ঢঙ নকল করিতে পারিতেন। গ্রামে তখন কোনো উচ্চ বিদ্যালয় না থাকিলেও গ্রামের লোকদের এই সব কথকতার মারফৎ অনেক ধর্ম্মতত্ত্ব শেখার পথ অতি সহজ সরল ও সুগম ছিল। এখনকার স্কুলে পড়ার সৌভাগ্য কয়জনেরই বা ঘটে কিন্তু তখন বিনা পয়সায় শিখার এরূপ সুযোগ ছিল অনেক। আর এই সব ব্যাপারে সকলে যোগও দিতো প্রাণের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও আনন্দের সাথে। গ্রামে তখন আরো কথক ছিল এবং এদের কথকতা হইতো প্রায়ই। এখন গ্রামে কোনো কথক নাই বলিলেই চলে। যারা আছে তাদের কথকতা গ্রামে কখনো হয় কিনা সন্দেহ। গ্রাম হইতে চিরতরে লোপ পাইয়াছে বহু দিনের এক টি

সহজ সরল শিক্ষা পদ্ধতি, অথচ তার স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই নূতন কিছুই। ধ্বংস-মুখে* চলা একটি জাতির ইতিহাসের ধারাই এরূপ।

হরি কীর্ত্তনীয়া

লোপ পাইয়াছে গ্রাম হইতে শুধু কি কথকতাই? আমাদের গ্রামের হরিকীর্ত্তনীয়ার নাম ছিল পালংএর সুপ্রসিদ্ধ গোবিন্দ কীর্ত্তনীয়ার ঠিক নীচে। ছোটকালে হরিকীর্ত্তনীয়ার গান অনেক শুনিয়াছি। হরি কীর্ত্তনীয়া শুধু ওস্তাদ গায়ক ছিলেন না। তিনি সাধু ও ভক্ত ছিলেন, নির্জ্জনে সাধন ভজন করিতেন, গান রচনার ক্ষমতাও তাহার ছিল। পুরাণ গাহিতে গাহিতে আনন্দরসে মাতোয়ারা তাহার প্রাণ উথলিয়া উঠিতো আর সেই গান শুনিয়া চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে আমি যে কোন অজানা রাজ্যে চলিয়া যাইতাম—সে-সুখ-স্মৃতির আবেশ এখনো আমার প্রাণে জাগে, সেই সুরের ধ্বনি এখনো আমার হৃদয়ে স্পন্দিত হয়। তাহার ছেলে চন্দ্রকান্ত বেহালা বাজাইতে অতি নিপুণ ছিলেন। অনেক মেডেল লাভও এজন্য তাহার হইয়াছিল। চোগা চাপকান পরিয়া যাত্রার জুড়ীর বেশে গলায় মেডেলের মালা দোলাইয়া আসরে দাঁড়াইয়া তিনি বেহালা বাজাইতেন। তাহার বেহালার ঝঙ্কারের মাধুর্য্যে বড় বড় আসরের হাটুরে গোলমালও বন্ধ হইতো এক নিমেষে। আর আমার মতো শিশুর মুগ্ধ প্রাণ নাচিতে থাকিতো সেই সুনিপুণ শিল্পীর অতি কোমল করস্পর্শে জাগাইয়া তোলা সুরের তালে তালে। এই চল্লিশ বৎসর পরও যেন সেই সুর ঝঙ্কৃত হইতেছে আমার হৃদয় বীণার প্রতি তারে।

বারুই পাড়া

আমাদের বাড়ীর পুবে ও দক্ষিণে ছিল বারুই-পাড়া। নড়িয়া অতি প্রাচীন গ্রাম। এর অতি পুরাতন ইতিহাসের সন্ধান না পাওয়া গেলেও এর পাড়া গঠনের পদ্ধতি প্রাচীনত্বের পরিচায়ক। প্রাচীন হিন্দুনগরের মতো এই গ্রামও সাহা, তেলী, কামার, কুমার, গোয়াল, বারুই প্রভৃতি বিভিন্ন পাড়ায় বিভক্ত। আমাদের সাবেক বাড়ী ছিল সাহা পাড়ায়। সাহারা আমাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করিতো আমার মনে পড়ে না। কিন্তু পাড়ার বারুই পুরুষ ও মেয়েদের প্রাণ-মাখানো ব্যবহার যেন এখনো আমার হৃদয়ে সোনার রেখায় আঁকা আছে। পুরাণ বাড়ীতে আমাদের দু'দশ ঘর প্রজা ছিল। পুকুরে মাছ ছিল, বাগানে ফল ফলারি ছিল কিন্তু এ-নূতন ছোট বাড়ীতে ছিল না সে-সবের কিছুই। বাবা করিতেন কুচবিহারে কোন জমিদারের অধীনে অতি সামান্য বেতনের চাকুরী। যতদূর মনে পড়ে তাঁর তখন মাহিনা ছিল মাসে আট টাকা। খাওয়া দাওয়া পিসেমশায়ের বাড়ীতেই চলিতো। এ-আট টাকার সাথে নিজে আরো দুটাকা মিলাইয়া পিসিমা প্রতিমাসে দশ টাকা আমাদের বাড়ীতে পাঠাইতেন। পিসেমশায়ের মাহিনাও খুব বেশী ছিল না। নিঃসন্তান পিসিমা দিন রাত হাড়-ভাঙা খাটুনী খাটিয়া অতি কম খরচে সংসার চালাইতে পারিতেন বলিয়াই তাঁহাদের পক্ষে মাসে এরূপ সাহায্য করা সম্ভব ছিল। আর পিসেমশায়ের ও পিসীমার আমাদের জন্য দরদ চিরকালই ছিল খুব বেশী। এই দরদই তাঁদের সকল রকম দুঃখ বরণের মাঝে দিত অফুরন্ত আনন্দ।

বাড়ীতে তখন আমি ছাড়া ছিলাম ঠাকুরমা, মা, আমার বড় দুবোন হেমলতা ও কুমুদী, আর আমার ছোট বোন প্রফুল্ল। বড়দা ও মেজদা চাঁদপুরে বোনদির বাসায় থাকিয়া সেখানকার উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পড়িতেন। প্রফুল্লর ডাক নাম ছিল ক্ষেন্তি। আর সন্তান হওয়া ক্ষান্ত হোক্ এই ইচ্ছা হইতেই তার এ-নামকরণ। মার সব শুদ্দু নটী ছেলে মেয়ের মধ্যে দাদার আগে-পিছে-হওয়া ছেলে মেয়ে দুটির মৃত্যু ঘটে খুবই ছোটকালে। আমি মার অষ্টম সন্তান। এতোগুলে লোকের মাসে কেবল মাত্র দশ টাকায় কুলানো সে সস্তার দিনেও একেবারে অসম্ভব ছিল। চাঁদপুরের বোনদিও মাঝে মাঝে কিছু পাঠাইতেন বটে কিন্তু তাও আমাদের অভাব পুরণে যথেষ্ট ছিল না। কাজেই সব দিন আমাদের দুবেলা খাওয়া জুটিতো না। মা ও বোনদের অনেক সময় ফ্যান খাইয়াই দিন কাটাইতে হইতো। আমার এখনো বেশ মনে আছে—মা আমাকে থালায় ভাত বাড়িয়া দিতেন আর নিজেরা বাটীভরা ফ্যান লইয়া খাইতে বসিতেন। সে-ভাত সহজে রুচিতে চাইতো না বলিয়া অনেকদিন বলিতাম আসুন না, যা কিছু আছে সকলে মিলিয়াই খাই। কিন্তু মা কিছুতেই তাহা হইতে দিতেন না। বলিতেন—তুই কদিনই বা বাঁচবি, আমাদের তো আর আয়ুর শেষ না। আমরা যে যমের দুয়ারে কাঁটা দিয়ে এসেছি। অষ্টমগর্ভের ছেলে বলিয়া তাঁহাদের মনে আশঙ্কা ছিল আমি বেশী দিন বাঁচিব না। আর যদিই বা বাঁচি—তাহারা ভাবিতেন আমি খুব বড় হইব, কারণ কৃষ্ণ যে অষ্টম গর্ভের। এই আশাভরা বুকে তাঁরা আমার তখনকার সমস্ত দুরন্তপনা 'ষাটষাট' বলিয়া হাসিমুখে সহিতেন।

আমাদের গ্রামে তখন কোনো উচ্চবিদ্যালয় ছিল না। সোনসিং গ্রামের মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে দাদা ও মেজদা মাইনর পরীক্ষা পাশ করেন। মাইনর পরীক্ষায় দাদা চার টাকা বৃত্তিও পাইয়া ছিলেন। নিজে লেখা পড়ার সুযোগ পান নাই—এ-দুঃখ বাবার প্রাণে চিরদিনই শেলের মতো বিঁধিতো। নিজেরও লেখাপড়ার আকাঙ্ক্ষা বড় কম ছিল না। আমাদের কলেজে পড়ার সব বই-ই বাংলা করিয়া তাহাকে শুনাইতে হইতো। আর এসব জ্ঞানের কথা শুনিতে তিনি খুবই পছন্দ করিতেন। মাইনর পাশের পর দাদা চাহিয়াছিলেন চাকরী করিতে। পনেরো টাকা বেতনের একটি চাকরীও জুটিয়াছিল। কাকাদের মত ছিল এই চাকরী নেওয়ার দিকে কিন্তু বাবা সে-কথায় কানও দিলেন না। তিনি দাদাকে বলিলেন—তুমি ছেলেমানুষ, সংসারের ভাবনা ভাববার দরকার এখন তোমার কিছুই নাই—তুমি শুধু পড়ে থাকো নিজের পড়া নিয়ে—পনেরো টাকায় এখন তোমার চল্লেও পরে চল্‌বে না। দাদা পড়ায় ভাল ছিলেন বলিয়া তাকে খুব ভালরূপে লেখাপড়া শিখানোর সঙ্কল্প করিলেন। হেডমাষ্টার রতনমণি গুপ্তের আমলে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের স্থান ছিল পূর্ব্ববঙ্গে সর্ব্বপ্রথম। লোকমুখে একথা শোনামাত্র বাবার রোখ হইল দাদাকেও সেখানে পড়ানোর। বাবা চিরকালই রাশভারী এক-গুঁয়ে লোক ছিলেন। মাথায় একবার একটা ঝোঁক চাপিলে আগা-পাছা চিন্তা থাকিতো না—সেইকাজ করার জন্য মরিয়া হইয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিতেন। তিনি দাদাকে লইয়া গেলেন ঢাকায় রতণমণিবাবুর কাছে। সকলে-তো একেবারে অবাক, কিরূপে খরচ চলিবে, ঢাকায় তো পনেরো টাকার কম চলিতেই পারে না। বাবার মাহিনাও ততো

ছিল না। কিন্তু বাবা ভাবিলেন ছেলেকে মানুষ করাই আসল কাজ—দরকার হইলে বাড়ীঘর বিক্রী করা যাইবে। তখন পর্যন্ত আমাদের পুরাণো বাড়ী ভাঙে নাই।

দাদা কলেজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া দু'এক বছর সেখানে পড়িয়া ছিলেন। কিন্তু ফিটের ব্যামো হওয়ায় শেষে তাকে বাধ্য হইয়া চাঁদপুর যাইতে হয়।

অম্বিকা পণ্ডিত

আমি ছয় কি সাত বছর বয়সের সময় আমাদের গ্রামের তখনকার একমাত্র বিদ্যালয় অম্বিকা পণ্ডিতের পাঠশালায় ভর্ত্তি হই। প্রথম দিন স্কুলে যাওয়ার কথা আমার বেশ মনে আছে। আমাদের পাড়ার বারুই ছেলেদের সাথে আমার খুব ভাব ছিল। গ্রামে সব চেয়ে বেশী গরীব বলিয়া পাড়ার ছেলে-মেয়ে সকলেরই আমরা খুব প্রিয় ছিলাম। কি করিয়া আমাদের দুপয়সা আয় হইবে সেদিকে নজর ছিল তাদের সকলের। বিনা কারণে নিমন্ত্রণ খাওয়াইয়া তারা অনেক সময় আমাকে দু-এক আনা দক্ষিণাও দিতো। আর সে-সময় এই দুএক আনার মূল্য আমাদের কাছে ছিল খুব বেশী। গাছের প্রথম পাকা আমটি প্রায়ই আমার ভাগ্যে জুটিতো। এই জোটার জন্য দায়ী ছিল পাড়ার ছেলেরা। তাদের সেই প্রাণ-ঢালা ভালবাসার কথা মনে হইলে আনন্দে এখনো চোখ ছল ছলিয়ে ওঠে। বারুই ছেলেদের মধ্যে অনাথবন্ধু, রামকানাই, মহেন্দ্র ও রাসমোহনের নামই বিশেষ ভাবে মনে পড়ে। অনাথ বন্ধুর জীবনটা গেলো প্রায় বকামী করিয়াই—না করিল সে ভাল রূপে নিজের পানের ব্যবসা, না চেষ্টা

করিল অন্য কিছুর। রামকানাই ভোলাতে পানের কারবারে বেশ উন্নতি করিয়াছে। মহেন্দ্র ও রাসমোহন গ্রামেই ডাক্তারি করে। মহেন্দ্র ডাক্তারি শিখে লোনসিংএর ডাক্তার খানায় কম্পাউণ্ডার রূপে আমার কাকার কাছে। ডাক্তারি ব্যবসায় মহেন্দ্রের হাত-যশ খুবই বেশী।

এসময়ের একদিনের কথা আমি এখানেই শেষ করি। কি এক যোগ উপলক্ষে পাড়ার বুড়া জোয়ান বারুই মেয়েরা আমাকে ডাকিয়া নেয় নদীর পারে। গ্রামের বন জঙ্গল পার হইয়া সূর্য্যের কিরণ তখনো ভাল রূপে নদীর গায় পড়ে নাই। এমনি সময় এক শীতের প্রভাতে মেয়েরা হুড়মুড় করিয়া নদীতে নামিয়া ঝুপ করিয়া তিন ডুব দেয়। পরে তাড়াতাড়ি পাড়ে উঠিয়া একে একে আমার পায়ের কাছে দুএক পয়সা রাখিয়া ঢিপ করিয়া প্রণাম করিতে থাকে। আমি তো একেবারে অবাক। হতভম্বের মতো হাঁ করিয়া আমায় দাঁড়ান দেখিয়া রাসমোহনের মা কাছে আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—বুঝলে না ঠাকুর, তোমরা অতি গরীব কিনা তাই, কি-ই বা দিতে পারি, এই যোগ উপলক্ষে তোমাদের কিছু দেওয়া মাত্র। তখন আমার মনের ভাব কি হইয়াছিল বলিতে পারি না কিন্তু ঠাকুর মার হাতে সেই চার-পাঁচ আনা পয়সা দেওয়া মাত্র তাঁর মুখে ফুটে-ওঠা হাসি-রেখা আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে।

অনাথ বন্ধুর সাথেই ডানহাতে কলাপাতা, খাকের কলম ও দড়িতে ঝোলানো দোয়াত এবং বাঁ বগলে জড়ানো ছালা লইয়া আমি প্রথম যাই অম্বিকা পণ্ডিতের পাঠশালায়। সাথে ঠাকুরমাও ছিলেন। অম্বিকা পণ্ডিতের পাঠশালা বসিতো উত্তর নড়িয়ায়

ঠাকুরতা বাড়ীর ছনে-ছাওয়া চৌ-চালা মণ্ডপ ঘরে। কালো পানা, ছিপছিপে, ছোট-ছোট গোঁপ-ওয়ালা, দাড়ি-চাঁচা পণ্ডিত মশাই দেড়-হাত লম্বা একখানা চিকন বেত হাতে লইয়া পরিষ্কার কাপড়ের খুঁটখানা গায় দিয়া স্কুলে আসিতেন। পণ্ডিত মশায়ের বাড়ী ছিল খুব সম্ভব আমাদের গ্রাম হইতে মাইল তিনেক দক্ষিণে আঁকশা গ্রামে। থাকিতেন ঠাকুরতা বাড়ীতে, সেখানেই তাঁর দু'বেলা খাওয়া জুটিতো। নামজাদা পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া সারা গাঁয়ের ছেলেরা এই পাঠশালায় পড়িতে আসিতো। আমার সেখানে পড়ার সময় ছাত্রসংখ্যা ষাটের কম ছিল না। পাশের কামার বাড়ী হইতে পড়িতে আসা তিন চারটি মেয়ে দক্ষিন ভিটির বৈঠক খানা ঘরে বসিতো।

পাঠশালায় পড়ানো হইতো দিনে দুবার। খুব ভোরে ফরসা হইতে না হইতে সকালের পড়া আরম্ভ হইয়া বেলা প্রায় দশটা অবধি চলিতো। পাঠশালা হইতে ফিরার পর প্রায় সকলকে বাজারে যাইতে হইতো বলিয়া এরূপ বন্দোবস্ত ছিল। বিকালে আবার দুটোর সময় আরম্ভ হইয়া সন্ধ্যার আগে সকলের এক সাথে নামতা-পাঠের পর পাঠশালা ভাঙ্গিত।

পণ্ডিত মহাশয়ের শাসন ছিল অতি কঠোর। কল্পনীয় কোন শাস্তিই তাঁহার অদেয় ছিল না। দাঁড় করিয়ে রাখা, মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসানো, কপালে চাড়া দিয়ে আকাশের দিকে মুখ করাইয়া রাখা, হাতে ও পিঠে বেত মারা, দুহাতে দড়ি বেঁধে ঘরের আড়ার সাথে ঝুলিয়ে রাখা, লাল পিঁপড়ার বাসা পাছায় ভাঙা—শাসনের সকল উপায়ই তাঁহার খেয়ালে ছিল। কিন্তু আমাকে তিনি কখনো

কোন দিন মারেন নাই, বরং পড়া শিখিয়া স্কুলে যাইতাম বলিয়া তিনি আমায় ভালবাসিতেন। আমাকে দেখাইয়া সকলকে বলিতেন— এ কালে মানুষ হবে। এখন তিনি মুন্সীগঞ্জে কোনো মোক্তারের মুহুরীর কর্ম্ম করেন এবং একথা বলিয়া বন্ধুদের কাছে গৌরব করেন। তিনি মারিতেন বটে কিন্তু পড়ানো সম্বন্ধে তাঁর মনোযোগ ছিল খুব বেশী। দুবেলা ঠিক সময় স্কুলে আসিতেন, কখনো কামাই করিতেন না, চেয়ারে বসিয়া পড়ানোর ছলে ঝিমাইতেনও না। কড়া শাসনের মাঝেও ছাত্রদের জন্য তাঁর একটি সহজ স্নেহ ছিল বলিয়া ছাত্রেরা সকলেই তাঁহাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতো। অনেক দিন হইল তিনি গ্রাম ছাড়িয়াছেন। কিন্তু গ্রামের ছেলেরা তাঁহাকে ভুলিতে পারে নাই।

দুষ্টুমি করার অভ্যাস আমার কোনো দিনই বেশী ছিল না, তখনো করিতাম না। ফরসা হওয়ার অনেক আগে প্রতিদিন ঘুম হইতে উঠিয়া পাঠশালায় রওনা হইতাম। পথেই বৈদিক বাড়ীতে থাকিতো আমার তখনকার বন্ধু মহেন্দ্র চক্রবর্ত্তী। সে আমার কিছু উপরে পড়িতো। তাকে দেখাতো একটি কালো ফুটবলের মতো। তার পিতা হরি চক্রবর্ত্তী কিছুদিনের জন্য বৈদিক বাড়ীর এক কোণে বাড়ী করিয়াছিলেন। তাঁরা এখন অন্য গ্রামে উঠিয়া গিয়াছে। পাঠশালার পথে মহেন্দ্রকে ডাকিয়া তোলা ছিল আমার রোজকার অভ্যাস। এ-বিষয়ে সামান্য একটু নড়চড়ও আমার ভয়ানক রাগের কারণ হইতো। আমাকে ডাকিয়া উঠানোর ভার ছিল ঠাকুরমার উপর। উঠাইতে একটু দেরী হইলেই—কেন দেরীতে উঠালি-বলিয়া ঠাকুরমার পিঠে কিল চড় মারিতে আরম্ভ করিতাম। মারা শেষ হইলে বাড়ীর

সকলকে ঘর হইতে বাহির করিয়া ভিতর হইতে খিল দিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিতাম। পরে বেড়ার উপর দিয়া বাহির হইয়া স্কুলে চলিয়া যাইতাম। বাড়ীর মেয়েদের কারো সাধ্যে কুলইতো না ভিতরে গিয়া দরজা খোলে। আশ পাশের বাড়ীর খুব কম লোকই বেড়া বাইতে পারিতো আমার মতো। কাজেই অনেক দিন তাদের আমার পাঠশালা হইতে ফিরিয়া আসা অবধি সব কাজ কর্ম্ম বন্ধ রাখিয়া হতভম্বের মতো দাঁড়াইয়া থাকিতে হইতো। পাঠশালা হইতে ফিরিয়া অনেক সাধ্য সাধনার পর আমি দরজা খুলিয়া দিতাম।

আমি এমনি ছিলাম খুবই ঠাণ্ডা—জলের ঘটীর মতো। কিন্তু যতো গোল বাধিতো এই পাঠশালায় যাওয়া লইয়া। আর একদিন এমনি এক কারণে বুকে খুব জোরে এক ইঁট মারায় মা অনেক-ক্ষণ অবধি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন। জ্ঞান হইলে পর মা কিন্তু আমায় একটি কথাও বলেন নাই। পাছে মরিয়া যাই এ ভয়েই তাঁহারা সর্ব্বদা জড়সড় থাকিতেন। মার প্রতি সেই নিষ্ঠুর আচরণের কথা মনে হইলে দুঃখে এখনো বুক ফাটে, লজ্জায় মাথা নত হয়। মার সারাটা জীবন কাটিয়াছে বুক ভরা দুঃখের বোঝা বহিয়া। এগার বছর বয়সে প্রথম আমাদের সাবেক বাড়ী আসার দিন, বাপের বাড়ী হইতে থালা না লইয়া আসায় তাকে মাটিতে ভাত খাইতে দেওয়া হইয়াছিল। বাবার সাথে তাঁর সদ্ভাব ছিল না কোন দিনই। বুড়াবয়সে পর্য্যন্ত বাবা তাঁকে একদিন রাগ করিয়া আমাদের চোখের সামনে লাঠি শাসাইয়া মহাপুরুত বাড়ী পর্য্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া যায়।

ঠাকুরমার মতো মহিয়সী মহিলারও তাঁর প্রতি দুঃ... রের কারণ আজ অবধি আমার কাছে একটি প্রহেলিকা। প্রাতঃকা... ঠাকুর ঘরে ঢুকিয়া প্রতিদিন বেলা দুটা তিনটা পর্য্যন্ত ঠাকুরমা পূজা আহ্নিকেই কাটাইতেন। তারপর সেখান হইতে বাহির হইয়া মার সাথে একপালা ঝগড়া বাধাইতেন। ঠাকুরমাকে অনেক দিন বলিয়াছি—আপনার সমস্ত সাধনার ফল শেষ হয় এই এক ঝগড়াতেই। আমার একথা শুনিয়া তিনি শুধু হাসিতেন। মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে হঠাৎ একদিন ঠাকুরমার এভাব বদলায়। সেদিন পূজা-শেষে খাওয়ার ঘরে গিয়া মাকে তিনি বলিলেন—আয় তোকে খাইয়ে দিই, মাছ আছে তো। বলিয়াই তিনি গাল ভরিয়া হাসিলেন। আর চোখের জলে তাঁর সারা মুখ ভাসিলো। আনন্দে মার মুখও উজ্জ্বল হইল। তারপর ঠাকুরমার মাকে খাওয়ানোর দৃশ্য দেখিয়া সেখানকার কারোর চোখে জল বাকী ছিলনা। বিধবা হওয়ার পর ঠাকুরমা এই একবার মাত্র আমিষ রান্নাঘরে গিয়াছিলেন। মার মৃত্যুর পূর্ব্বে বড় বোনদি বিধবা হন, বিধবা হওয়ার কিছুদিন পরেই তিনি মারা যান। দাদাও মারা যান মার মৃত্যুর দুবছর পূর্ব্বে। আমাদের ভাই বোনদের মধ্যে এ-দুজনারই মার উপর ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল সব চাইতে বেশী। আমার শেষ জীবনে মার উপর ভালবাসা ছিল না মোটেই। দোষ অবশ্য আমারই। মাকে মা পর্য্যন্ত ডাকিতে পারিতাম না। মা বলিয়া ডাকিতে চেষ্টা করিলেই দম যেন আটকিয়া আসিতো। মার প্রাণে ইহা শেলের মত বাজিতো। লজ্জা এবং দুঃখে আমারও প্রাণ ভরিতো কিন্তু প্রতিকারের কোন

পথ খুঁজিয়া পাইতাম না। যার মৃত্যুর সময় আমাদের ছ ভাইয়ের মধ্যে তার কাছে উপস্থিত ছিল না কেহই। আমি বাহির হইয়াছিলাম কাঁথির লবণ আইন অমান্য অভিযানে। মেজদা ছিলেন সুদূর ব্রহ্মদেশে।

আমাদের তখনকার আর্থিক সঙ্কটের উল্লেখ পূর্ব্বেই করিয়াছি। এক এক দিন পাঠশালা হইতে বাড়ী আসিয়া বলিতাম—ঠাকুরমা, খেতে দে, বড় ক্ষুধা পেয়েছে। ঠাকুরমাকে তখন তুই বলিয়া ডাকিতাম, পরে কিন্তু এই 'তুই' বদলাইয়া 'আপনি' হইয়াছিল। ঠাকুরমা শিকায় তোলা হাঁড়ি হইতে দুই, তিনটী পেয়ারা হাতে দিয়া বলিতেন আজ এ-ই খা, ঘরে আরতো কিছু নাই। আমাদের বাড়ীর দক্ষিণ-পূব কোণে খুব উঁচু ও বড় একটা পেয়ারা গাছ ছিল। কোন কোন দিন সেটার দিকে তাকাইয়া বলিতেন—যা, ঐ গাছটা হতে পেয়ারা পেড়ে খা গে। আমি অমনি দৌড়িয়া গাছের আগ-ডালায় উঠিতাম। গ্রামে থাকায় আমার গাছে চড়ার অভ্যাস ছিল খুবই। আমার সমান বয়সী খুব কম ছেলেই গাছে চড়ায় এতো ওস্তাদ ছিল। এক দিন হঠাৎ উপরের ডালটা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় আমি 'ঠাকুরমা' বলিয়া পড়িয়া গেলাম। নীচের একটা ডাল ধরিয়া হঠাৎ ঝুলিতে পারায় সে যাত্রায় প্রাণ রক্ষা হইল। ঠাকুরমা দৌড়িয়া আসিয়া হাসিমুখে বলিলেন—সাবধানে নেমে আয়, আর একটু হোলে গেছিলি তো। ঐ হাসিই ছিল ঠাকুরমার বৈশিষ্ট্য। এতো দুঃখ কষ্টের মাঝেও তার মুখে কখনো বিষাদের মলিন ছায়া পড়ে নাই। সদা হাসি মুখ—একেবারে ভগবতীর মতো,

সিংহের পীঠে দাঁড়াইয়া অসুরের সাথে লড়ার সময়ও যুঁইএর মতো স্নিগ্ধ হাসি। এ-খানেই ছিল মার সাথে তাঁর পার্থক্য। সামান্য দুঃখেই মা মুসরিয়া পড়িতেন—আর ঠাকুরমা সকল অবস্থায় অচল অটল, শুভ্র আকাশে চুমা-দেওয়া তুষার ধবল শৈলের মতো।

গাছে ভাল চড়িতে পারায় তখন সংসারের অনেক কাজেও লাগিতাম। ঠানদি ও মুখুজ্যে বাড়ীর বড় বাগানের পাকা সুপারি আমি অনেক সময় পাড়িতাম। পাড়া ফলের পাওয়া অংশ বাজারে বেচিয়া পয়সাও উপার্জ্জন হইতো। এই পয়সায় অনেকদিন বাজার হইতে মাছও কিনিয়া আনিতাম। ভাগে পাওয়া আম বাড়ীতে আনিয়া বোনদের বিলাইয়া দিতাম।

গৌরীকান্ত কবিরাজ

নয় বৎসর বয়সের সময় আমি ঠাকুরতা বাড়ীর পাঠশালা হইতে নিম্ন প্রাইমারী পাশ করিয়া পড়িতে চাঁদপুর যাই। এর আগে আমার একবার খুব কঠিন জ্বর হয়। তখনকার কবিরাজ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন ত্রিদোষ ক্ষেত্র বলিয়া কিন্তু আমার এ[illegible] মনে হয় টাইফয়েড হইয়াছিল। আমাদের মতো গরীবের পক্ষে কোন চিকিৎসক মেলাই ভার, কারণ ভিজিট তো মিলিবেই না, ঔষধ পর্য্যন্ত মাগ্না দিতে হইবে। সোণাপতি লোনসিংএ তখন খুব বড় ডাক্তার। তার কাছে সংবাদ পাঠান হইল। কিন্তু তার আমার ফুরসুতই জুটিল না। আর সব বড় কবিরাজদের

কাছে তো যেসাই মুস্কিল, সকলেই রোগী লইয়া ব্যস্ত। আমাদের পরিবারের নাপিত রজনী শীলকে আমরা কাকা ডাকিতাম। তাহার ছোট ভাই গৌরীকান্ত কবিরাজ আমায় দেখিতে আরম্ভ করিল। গৌরীকান্ত কবিরাজের প্র্যাক্‌টিস তখন পর্য্যন্ত খুব বেশী না জমিয়া উঠিলেও গ্রাম্য কবিরাজ হিসাবে মোটের উপর সে ভালই ছিল। কিন্তু সব চেয়ে তার ভাল ছিল প্রাণ-ঢালা ব্যবহার। তারই চিকিৎসায় সেবার আমি সেরে উঠি।

তৃতীয় অধ্যায়।

চাঁদপুর

নিম্ন প্রাইমারী পাশের পর গ্রামের অনেকেই লোনসিংএ মাইনর পড়িতো। কিন্তু আমার তা ভাল লাগিল না। ছুটীতে বাড়ী আসা দাদাদের ইংরাজী বই দেখিয়া ইংরাজী পড়ার ঝোঁক আমারও মাথায় চাপে। আমি ১৮৯৬ সালে নিম্ন প্রাইমারী পাশ করি। দাদা সেবার চাঁদপুর হইতে এন্‌ট্রান্স পাশ করিয়া কলেজে পড়িতে কুচবিহার যান। আমি ঠাকুরমাকে চাঁদপুর যাওয়ার কথা বলিলাম। তিনি বিশেষ গা করিলেন না। চাঁদপুরে মেজদার কাছে এ-বিষয়ে লিখিলাম। তিনিও কোন উত্তর দিলেন না। বাড়ী আমার কাছে কারাগারের মতো ঠেকিতে লাগিল। দিনগুলি বছরের মতো লম্বা হইল। শেষে খাঁচায় আটকানো পাখীর মতো একেবারে ছটফটানি আরম্ভ হইল। এ-সময় একদিন শুনিলাম ভূঞা বাড়ীর বিহারী ঘটক চাঁদপুর যাইবেন। যাওয়ার দিন খাওয়া দাওয়া সারিয়াই ঠাকুরমাকে বলিলাম—আমি আজ বিহারী ভূঞার সাথে চাঁদপুর যাবো—বলিয়াই ছুটিলাম ভূঞা বাড়ীর দিকে। ঠাকুরমাও দিশেহারার মতো ছুটিলেন আমার পিছে। সে এক মজার দৃশ্য—বুড়া যেন ছুটিয়াছে শিশুর পিছনে তাকে আকড়ে ধরে তার অগ্রগতি অবরুদ্ধ করার জন্য। আমি আগে আগে

চলিয়াছি, আর ঠাকুর মা পিছন হইতে ডাকিয়া বলিতেছেন—আরে মাখা থাম্, থাম্, শোন্। ছোটকালে মাখনের মতো ধবধবে সাদা ও কোমল ছিলাম বলিয়া আমার ডাক নাম ছিল "মাখন"। কে শোনে ঠাকুরমার কথা—আর কে-ই বা তাকায় পেছনে তার পানে। আমার প্রাণ যে তখন মাতাল—সামনের উজান টানে।

সেদিন রাত্রে চাঁদপুর পৌঁছি। সকলে তো একেবারে অবাক্। বোনদি আদর করিয়া বলিলেন—আরে আগে একটু সংবাদ দিয়েও আসতে পারলি না? তাহার এই এক কথায়ই আমার সকল দ্বিধা সঙ্কোচ দূর হইল। খাওয়ার পর বাসার সামনের সরকারী রাস্তায় হাঁটিতে হাঁটিতে মেজদা বলিলেন—এ-খানে থাক্‌তে পার এক চুক্তিতে। দীনেশ তোমায় ইচ্ছামতো মারবে কিন্তু তুমি তার গায় হাতটী পর্য্যন্ত তুলতে পারবে না। বোনদির ছেলে দীনেশ ছিল তখন তিন বোনের মধ্যে একটি মাত্র ভাই। বয়সে সে আমার চেয়ে তিন মাসের ছোট।

তখনকার চাঁদপুর

১৮৯৬ সালের মাঝামাঝি আমি চাঁদপুর যাই। তখন চাঁদপুর এখনকার মতো উন্নত ছিল না। উন্নত কি অবনত বলা ভার কারণ যে সব পাটের অফিস চাঁদপুরে বর্ত্তমান শোভার কারণ তাদের মালিক প্রায় সবই বিদেশী। আমার চাঁদপুর যাবার সময় পুরাণ বাজারের কাছে শ্রীশ বাবু ও আমজাদ পাটওয়ারীর যে দুটী পাটের অফিস ছিল তাদের মালিক এখন ইংরাজ। মাঝ

খানে নদীর দক্ষিণপাড়ে কে, এম দে কোম্পানী যে একটি বড পাটের আফিস খুলিয়াছিল, তাও এখন ভ্রাতৃবিরোধের ফলে লোপ পাইয়াছে।

আমাদের বাসা নদীর ঠিক উত্তর ধারে। বাসাটী খুব বড় —এখন প্রায় লাখ টাকা দাম। চাঁদপুরের জমির দাম এতো বেশী বাড়ার আগে নবীন মুখুজ্যে মশায় ইহা কিনিয়াছিলেন গোবিন্দবাবু নামে জনৈক ভদ্রলোকের কাছ হইতে অতি অল্প মূল্যে। আমাদের বাসার ঠিক পূব দিকে ছিল খোলা মাঠ। বর্ষার জলে ভাসা এই মাঠে আমরা নৌকা বাচ খেলিতাম। খরাণীকালে সকালে সেখানে গরু চড়িতো। তখন চাঁদপুরে গরু পালার খুবই সুবিধা ছিল। মুখুজ্যে মশায়ও অনেক গরু পুষিতেন। গরু পালা তিনি ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন। লাভ লোকসানের কথা কেউ তুলিলে তিনি বলিতেন—ভাল দুধ খেতে হলে নিজের বাড়ীতে গরু রাখা চাই। দুধ বিনা বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য টিকে না। ঠেকা বিষয়ে অত হিসাব নিকাশের কাজকি? বিকালে আর আর ছেলেদের সাথে আমি ও মেজদা সে মাঠে খেলিতাম। খেলার মধ্যে গোল্লাছুট, কপাটী, দাড়িয়া বান্ধা, বৌ-বসন্ত, গাড়ী গাড়ী খেলাই ছিল প্রধান। মেজদাই ছিলেন এইসব খেলার বড় পাণ্ডা। খেলা ও শরীরের দিকে তার নজর ছিল চিরদিন। ফলে তাহার চেহারাখানা হইয়াছে মানুষের মতো, হাজার লোকের মধ্যেও এক মুহূর্ত্তে চিনিয়া লওয়া যায়। পথ দিয়া গেলে সকলে চাহিয়া থাকে মুগ্ধনেত্রে, ভাবে একখানা চেহারা বটে।

তখন পর্য্যন্ত চাঁদপুরে এতো ফুটবল ও ক্রীকেটের ধুম পড়ে

নাই। দেশী খেলার দিকেই ছেলে পিলেদের ঝোক্ ছিল বেশী। তাই স্কুল ছুটীর পরই সকলে ছুটিতো সেই মাঠের দিকে। নদীর পাড়ের সেই বিশাল মাঠ নানা বয়সের ছেলেদের সোরে মুখরিত হইয়া উঠিতো। আর তাদেরই আনন্দের সাথে নিজেদের প্রাণের আনন্দ মিলাইয়া ডাকিয়া উঠিতো সারাদিনের বিরহের পর সন্ধ্যায় মিলিত সেই মাঠের পূব-উত্তর কোণের বনের পাখী। এই বনে একদিন হঠাৎ কোথা হইতে একটি শূয়র আসিয়া জুটিল। সকলে মিলিয়া সেই বন ঘিরিয়া শুধু লাঠির পিটুনীতে সেই বন্য শূয়র মারার কাহিনী এখনো মনে হয় যেন কালকের ঘটনা। রবিবারের দুপুরটা কাটিতো ঘুড়ি খেলায়। কতো রকমের ঘুড়িই তখন বানাইতাম—পতঙ্গ, ঢাউস, সাপ, মানুষ প্রভৃতি। আর সূতো মাজার ঘটাই বা কতো। দুঃখ কষ্ট তখন ছিল অনেক, তবুও এই সব আনন্দের মাঝে দিনগুলি কাটিতো স্বপ্নের মতো। প্রতি রবিবারে স্নানের সময় লাগিতো সাঁতার কাটার ধূম। সহরের সব ছেলে আসিয়া জুটিতো নদীর পারে আর তাহাদের সকলের সাতারের চোটে নদীর জল তোল-পাড় হইতো। ভিতরের তারুণ্য সত্যি তখন উপচে পড়িতো এদের সকলের চোখে নাকে ও মুখে। কে কতবার সাঁতরাইয়া নদী পাড় হইতে পারে তা লইয়া লাগিতো তীব্র প্রতিযোগীতা। সকাল নয়টা থেকে সুরু করিয়া বেলা দুপুর পর্য্যন্ত হইতাম শুধু এপার-ওপার। অনেক অভিভাবক লাঠি হাতে ঘাটে আসিয়া নিজেদের ছেলেদের তাড়না ও ভর্ৎসনা করিতেন। কিন্তু নবীন মুখুজ্যে ছিলেন এ-সব বিষয়ে একেবারে উদার। বলিতেন—এমনি

করেই তো এরা মানুষ হবে, শরীর হবে লোহার মতো শক্ত, জ্বর ভয়েও কাছে ঘেস্‌বে না।

বর্ষাকালে নৌকা বাওয়াতেই ছিল আমাদের প্রধান আমোদ। নবীন মুখুজ্যের বড়দাদা করুণা মুখুজ্যে ঐ বাসাতে থাকিয়াই কনট্রাকটারী করিতেন। তাহার একখানা ডিঙ্গী নৌকা ছিল। বর্ষার দিনে স্কুলের ছুটীর পর আর সবুর সইতো না। ঐ নৌকাখানি লইয়া তাড়াতাড়ি বাহির হওয়া চাই-ই। আজ একখানা বড় ফ্ল্যাট এসেছে, ডেভিড কোম্পানীর, ঐ যে সামনে নদীর মাঝে, এর সম্মুখের কেবিনটা কতো বড়— বলিয়া দুই তিন জন সাথী সমেত ঐ নৌকা ভাসাইয়া দিতাম। এই সব কেবিন দেখার মাঝে যে কি মাধুর্য্য ছিল এখন বোঝাও শক্ত কিন্তু এই কেবিন দেখা লইয়া কতো দিন বাধিয়াছে কত গোল ফ্লাটের সারঙ্গদের সাথে। ধ্বস্তাধ্বস্তি ও হাতাহাতির উপক্রম পর্য্যন্ত হইতো কিন্তু শেষটায় কোননা কোন লোকের মধ্যস্থতায় সব আপোসে মিটিয়া যাইতো। কিন্তু আমরা সেই ফ্ল্যাটের আগাগোড়া তন্ন তন্ন করিয়া না দেখিয়া কিছুতেই ছাড়িতাম না। হারিয়া ফিরার কথা সে কিশোর বয়সে আমাদের চিন্তার ত্রিসীমায়ও ঠাঁই পাইতো না।

মাছ ধরার বাতিক মাথায় ঢুকিয়াছিল গ্রামে থাকিতেই। বর্ষাকালে পুকুরে, খালে, বাড়ীর দু পাশের জলে ভরা ডোবা-গুলিতে ছিপ ফেলিয়া চাঁই পাতিয়া মাছ ধরা ছিল একটা নিত্য নৈমত্তিক ব্যাপার। মাছ ধরার সেই ঝোঁকটা চাঁদপুর আসিয়া বাড়িল বই কমিল না। নৌকায় বসিয়া নদীর জলে চিংড়ি ও

জেলে মাছ ধরা কোন দিন বাদ পড়িলে পেটের ভাতই যেন হজম হইতো না। আর এতে বোনদিরও উৎসাহ ছিল কম নয়। মাছ ধরার ছুতায় মাঝে মাঝে স্কুল পর্য্যন্ত কামাই করিতাম।

তখন আমার বয়স দশ কি এগারো। বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা আমার চোখে মুখে—সারা প্রাণে। চাঁদপুর তখন দিনে দিনে বাড়িতেছে যৌবনের সমস্ত শক্তি লইয়া। আর সেই বিকাশের নিত্য নূতন রূপ মন প্রাণ ও ইন্দ্রিয় দিয়া ভোগ করার জন্য আমার সমস্ত অন্তর-আত্মা পাগলের মতো ছুটাছুটি করিতো। কিছু দিন আগে চাঁদপুরে রেল হইয়াছে। বিকাল ৪টা বাজা মাত্র সিটি দিয়া গাড়ী আসিতো আর তা দেখার জন্য আমি বেগে ছুটিয়া যাইতাম। গাড়ী দূর রেল পথে কালো সাপটার মতো একে বেঁকে চলিয়া যাইতো আর আমার শিশু প্রাণে কতো কথাই না জাগিতো—কোথা হইতে এই গাড়ী আসে, কিভাবে ইহা চলে ইত্যাদি।

একটি একটি করিয়া নদীর দুকুলে পাটের আফিস হওয়ার সাথে সাথে মেঘনা হইতে নানা রকমের ষ্টীমার ডাকাতিয়া বাহিয়া আমাদের বাসা পর্য্যন্ত আসিতো। তাহাদের ভোঁ শব্দ শোনা মাত্র দৌড়িয়া নদীর পাড়ে গিয়া দেখিতাম—কোনটা একতলা, কোনটা দেড়তলা, কোনটা দোতলা, কোনটার আবার দোতলার উপর ছোট একটা কোঠা। কোনটার চোঙ্গা একটি, কোনটার দুটি, কোনটার চারটি। এইসব ষ্টীমার আমার ফুটন-উন্মুখ মনে যে কতো প্রশ্ন জাগাইয়া তুলিতো আর সেই সব প্রশ্নের উত্তরের

জন্য বাসার লোকদের যে কতো বিব্রত হইতে হইতো তাহা ভাবিয়া এখনো বিস্ময়ে ও পুলকে প্রাণ নাঁচিয়া ওঠে। এসব আনন্দের মাঝে প্রাণটা দমিয়া গেল যখন বাসার পূবের মাঠটা আমাদের হাতছাড়া হইয়া পাটের আফিসে পরিণত হইল। আর সাথে সাথে সেখানে খেলাও বন্ধ হইল।

মিশন হাউস।

এসময়ে আমাদের বাসার অল্প পশ্চিমে মিশন হাউসের প্রতিষ্ঠা হয়। এই হাউসের পাদ্রীরূপে প্রথম যিনি আসেন তাহার নাম খুব সম্ভব ছিল হিউজ্। তিনি অত্যন্ত সরল প্রাণ মিশুনে লোক ছিলেন, আমাদের সকল খেলায় যোগ দিতেন, বাসার কাছে আসিয়া আমাদের নাম ধরিয়া ডাকিতেন। তাহার পর আসেন ডাক্তার নর্থ। ইনি আগের সাহেবের মতো এতোটা মিশুক ছিলেন না বটে, কিন্তু অস্ত্র চিকিৎসায় খুব নিপুণ ছিলেন। ফলে তাহার নাম অতিদ্রুত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। পসারও খুব জোটে কিন্তু প্র্যাক্টিসের একটি টাকাও তিনি নিজে নিতেন না। মিশন হইতে মাসে পাওয়া দুইশ টাকাতেই কোন মতে সংসার চালাইতেন। ফলে ইহার মারফতে প্রতিমাসে মিশনের যথেষ্ট আয় হইতো এবং ইহার এই স্বার্থ ত্যাগ ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে চাঁদপুর মিশন অতি অল্পকাল মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিল। আমি এসময় প্রতি রবিবার ভোরে মিশন হাউসে বাইবেল পড়িতে যাইতাম। বাইবেল পরীক্ষায় পাশ করায় নানা রকম পুরষ্কারও লাভ হইতো।

নবীন মুখুজ্যে চাঁদপুরে মোক্তারী করিতেন। চাঁদপুরের মোক্তারদের আয় চির দিনই ভাল। মুখুজ্যে মশায়ের উপার্জ্জনও যথেষ্ট ছিল। কিন্তু প্রাণটা খুব বড় থাকায় বেশী টাকা জমাইতে পারিতেন না। তাহার বাসা সর্ব্বদাই লোকে গম গম করিতো। অনেক দুঃস্থ আত্মীয়ের ছেলে তাহার বাসায় থাকিয়া পড়িয়া মানুষ হইয়াছে। অতিথি অভ্যাগতের জন্য তাহার গৃহদ্বার ছিল দিনরাত খোলা। অনেক রাত্রিতে অতিথি আসিলেও 'না' কথাটী তাহার মুখ হইতে বাহির হইতো না—বরং আনন্দে প্রাণ ফুলিয়া উঠিতো। কিন্তু ভয় হইতো বোনদির জন্য।

বাসায় ঠাকুর রাখার তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন—বলিতেন পাক না করিলে মেয়েদের যে বেকার সমস্যা দেখা দিবে। বোনদিদির সাথে ইহা লইয়া তার প্রায়ই ঝগড়া বাধিতো। বাসায় বিশ বাইশ জন লোক তো সর্ব্বদাই থাকিতো। তাহার উপর অতিথির কামাই ছিল না একদিনও। কোন কোন দিন দশ পনের জন পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইতো। ইহাদের সকলের রান্নাই করিতে হইতো বোনদিকে। অবশ্য কখনো কখনো দূর সম্পর্কের কোন আত্মীয়াকে বাসায় রাখা হইতো তাহার সাহায্যের জন্য। তাছাড়া বোনদির তখনকার পাঁচ ছয়টী ছেলে মেয়ের সেবা শুশ্রূষাও করিতে হইতো তাহাকে। এখনকার মতো তখন বাজারের খাবার কিনিয়া খাইবার দস্তুর ছিল না—বাসায়ই চিড়া মুড়ি খই প্রভৃতি তৈরী হইতো। তখন কম্বলের চল না থাকায় বর্ষার সারা দুপুর জাগিয়া

থাকিয়া মেয়েরা কাঁথা সেলাই করিতো। অবশ্য এখনকার ম… তখন মেয়ে মহলে তাস খেলা ও নভেল পড়ার এতো ধূম ছিল না। এরূপ হাড় ভাঙ্গা খাটুনীর ফলে মেয়েদের শরীর থাকিতো ভাল, প্রসবের সময় কষ্ট হইতো কম,—তাহারা বাঁচিতো অনেক দিন। এক এক দিন রাত্রে খাওয়া দাওয়া শেষ হওয়ার পর দশ বার জন অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইতো—ইহাদের জন্য ফিরিয়া পাক করিতে হইতো বোনদিকেই। এজন্য বোনদির কাছে মুখুজ্যে মশায়কে অনেক কথা শুনিতে হইতো কিন্তু এসব কথা তিনি কানেও তুলিতেন না। রাগ তাহার শরীরে ছিল না বলিলেই চলে। সারা জীবনে তাহাকে একদিন বই দুই দিন রাগ করিতে দেখি নাই। বোনদি খুব বেশী রাগ করলে তিনি শুধু হাসি মুখে বলিতেন—কষ্ট হয়তো বুঝি কিন্তু উপায় কি ? তার সইবার ক্ষমতা ছিল অসীম। ঢিলা মেজাজের জন্য বাসার চাকর পর্য্যন্ত তাহাকে গালি দিতো। কিন্তু তিনি কিছুতেই চটিতেন না। এতলোক তাহার বাসায় রহিয়াছে কিন্তু তিনি কখনো কাউকে বাসা হইতে তাড়াইয়া দেন নাই। অপরাধ অনেকেই করিতো কিন্তু সবই তিনি হাসিমুখে সহিতেন। একদা ক্ষীরোদ নামে এক পশ্চিমা অনাথ বালক চাকররূপে আমাদের বাসায় আশ্রয় নেয়। সে শেষে অত্যন্ত কুঁড়ে হওয়ায় বিকালে পাঁচটা পর্য্যন্ত ঘুমাইতো। বোনদির একদিন এ-সম্বন্ধে নালিশ শুনিয়া মুখুজ্যে মশায় বলিলেন—আমার ক্ষতি আর কি করবে, ওর কপাল ও খাচ্ছে, শেষে আর কোন বাসায় চাকরী করা সম্ভব হবে না।

নড়িয়ার মুখুজ্যা বাড়ীর আজকালকার এ সুগঠনের মূলে অনেকখানি তার অসীম ধৈর্য্য। পরিবারের সকলের সহস্র গালি মুখ না ফুটিয়া হাসিমুখে সহিতে পারিতেন বলিয়াই এই বিরাট পরিবারের বর্ত্তমানে এই বিকাশ সম্ভব হইয়াছে। আমাদের দেশের পরিবার ও প্রতিষ্ঠান গুলির গড়িয়া উঠিতে না উঠিতে ভাঙ্গিয়া চুরমার হওয়ার মূল কারণই আমাদের চরিত্রের সংযম, উদারতা ও পরমত সহন শক্তির অভাব। অভয় আশ্রমের সাথে প্রথম অবধি সংশ্লিষ্ট থাকিয়াও শুধু ইহাই শিখিয়াছি। ঝগড়া-ঝাটির সময় নিজের দুর্ব্বলতার মাঝে ফুটিয়া উঠিয়াছে মুখুজ্যে মশায়ের সেই সৌম্য মুখচ্ছবি—প্রভাতের আগেকার আঁধারের মাঝে উষা তারার মতো।

খুব বেশী অতিথি বাসায় আসায় আমার শোওয়ার জায়গাও ঠিক থাকিতো না। যতদূর মনে পড়ে চাঁদপুরের প্রথম অবস্থায় আমাকে অনেক সময় শুইতো হইত বৈঠকখানার ফরাসের উপর। সেখানে সকাল হইতে রাত একটা অবধি লাগিয়া থাকিতো অতিথি অভ্যাগত, বন্ধু, বান্ধব, মক্কেল, মুহুরী ও চাকর বাকরদের হাটুরে গোলমাল। তাহাদের ঠাট্টা, চাতুরী, হাসি, তামাসা, ইয়ারকী ও ফক্কড়ী অবিরাম ধারে চলিতো সামনের ডাকাতিয়ার মতো। সন্ধ্যার সময় আরম্ভ হওয়া পাশার বৈঠক শেষ হইতো না দুপুর রাতের এদিকে। তার মাঝেই এগার বার বছরের ছেলে আমাকে থাকিতে পড়িতে ঘুমাইতে হইতো। এ-সময় আমি পাশাখেলা শিখি। নবীন মুখুজ্যের মেজদা রজনী মুখুজ্যের বাসা ছিল আমাদের বাসার লাগাও পশ্চিমে। তার

ছেলে প্রফুল্লের সাথে রোজ বিকালে পাশাখেলা শেষে দাঁড়াইল আমার নেশার মধ্যে। একদিন অনেকক্ষণ অবধি নির্দ্দিষ্ট কোন একটি চাল না পড়ায় রাগে তাহার গালে খুব জোরে এক চড় মারি। ইহার পরই এই খেলায় ইস্তফা দেই। এ-সময় আরো যেসব দোষ চরিত্রে ঢোকে তাদের হাত হইতে পূর্ণ পরিত্রাণ এখনো পাই নাই। খুব বেশী অতিথি হইলে ফরাসে জায়গা জুটিতো না। মক্কেলের বসার বেঞ্চের উপর হাতে মাথা রাখিয়া শুইয়া অনেক রাত কাটাইতে হইতো।

এভাবেই কাটে ১৮৯৮-এর শেষ অবধি। তখন আমি ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি। আমাদের বাৎসরিক পরীক্ষা হইতো মাঘ মাসে। এবার পরীক্ষার সময় আমার পৈতা দেওয়া ঠিক হওয়ায় পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব হইল না। ক্লাশে পড়ায় ভাল ছিলাম বলিয়া প্রমোশন সম্বন্ধে কোন ব্যাঘাত ঘটিল না। আমার পৈতার সময় আমার বড় দাদা এবং ছোটদি কুমুদিনীরও বিবাহ হয়। বড়দাদার বিয়ে হয় রজনী মুখুজ্যের কন্যার সাথে। দাদার পণের টাকাতেই ছোটদির বিবাহের খরচ চলিয়া যায়। এ সময় আমার দুই ভাগ্নী গিরিবালা এবং নগেন্দ্রবালারও বিবাহ হয়। নগেন্দ্রের বিয়ে হয় নোয়াখালী জেলার নন্দী গ্রামের রাজেন্দ্র বাড়ুজ্যের সাথে। রাজেন্দ্র বয়সে আমার বড় ছিল। সে বিয়ের পর নবীন মুখুজ্যের বাসায় থাকিয়া চাঁদপুর স্কুলে পড়িতে আরম্ভ করে। সে পড়িতো আমার দু ক্লাশ নীচে। মেজদা এর আগের বছরই এন্ট্রান্স পাশ করিয়া এল, এ পড়িতে কুচবিহার যান।

আমার মেজদি হেমাঙ্গিনীর বিয়ের কথা এ পর্য্যন্ত বলা হয় নাই। মেজদির ছোটকাল হইতেই চোখ দুটী ছিল একটু বেশী লাল, বুদ্ধি কতকটা মোটা এবং পা-দুখানি খানিক ছোট ও খোঁড়া। সে সময়ে আমাদের আর্থিক অবস্থাও অতি অসচ্ছল। তাই তার জন্য বর জোটানো লইয়া সকলকেই গভীর জলে পড়িতে হইয়াছিল। শেষে এক বর জুটিল। ছেলেটীও মন্দ ছিল না। কিন্তু মেজদিকে লইয়া ঘর করা সকলের সাধ্যের বাহিরে—সে একটু বেশী ঝগড়াটে। সুতরাং তাহাকে স্বামী বাড়ী হইতে গিয়া আমাকেই লইয়া আসিতে হইল। এর পর তার স্বামীকে বাধ্য হইয়াই অন্য বিবাহ করিতে হয়। মেজদি সে-অবধি আমাদের সংসারেই আছেন। ঝগড় ঝাটি করিয়া অনেক সময় আমাদের প্রাণ অতিষ্ঠ করে বটে, কিন্তু এসবের মাঝেও সর্ব্বক্ষণ ধরা পড়ে অতি স্পষ্ট ভাবে আমাদের সকলের জন্য তার প্রাণের সত্যিকার দরদ।

তখন পূজা, গ্রীষ্ম ও বড়দিনের ছুটীতে বছরে তিনবার বাড়ী আসিতাম। বাড়ীর অনাহার অনটনের মাঝেও যেন কতো আনন্দ ছিল। ছুটী হইলেই প্রাণ পাগল হইতো ছোট বোনটীর হাসিমাখা সরল মুখ খানা দেখার জন্য। ছুটি হওয়ার রাত্রেই বাড়ী রওনা হওয়া চাই, একদিনও সবুর সইতো না। বাড়ীতে অনেক কাজও জমিয়া থাকিতো। গ্রীষ্মের ছুটীতে শুক্নো পুকুর হইতে মাটি কাটিয়া বাড়ীর পূব ও পশ্চিম দিকের ডোবাগুলি আমরাই ভরিয়াছি। একাজ মা, মেজদা, সেজদি, ছোটদি আমি সকলে মিলিয়াই করিতাম। সেই ছোট

বাড়ী খানার জন্য প্রাণ ভরা মায়াই এ-সব কাজে আনন্দ জোগাইতো। এভাবে মাটি তুলিয়া শুকনো পুকুরের প্রায় আধখানা আমরাই কাটিয়া ফেলিয়াছিলাম এবং এভাবে কাটা ডোবার জলেই আমাদের গ্রীষ্মের কাজ চলিতো।

মেয়েদের পড়ানোর দিকে আমার ঝোঁক ছোট কাল অবধি। ছোটদি ও ছোট বোন প্রফুল্লকে লেখাপড়া শেখাই আমিই। প্রফুল্ল লেখা পড়ায় খুবই ভাল ছিল। তার সুন্দর স্বর করিয়া পড়া কাশীরাম দাসের মহাভারত শুনিতে পাড়ার অনেক মেয়েই বিকালে আমাদের উঠানে জড় হইতো। শৈশব হইতে তার পাপপুণ্য বোধও ছিল অতি প্রখর। আমাকে কোনো অন্যায় করিতে দেখিলেই চোখ পাকাইয়া চাঁপা কলির মতো সুন্দর আঙ্গুলগুলি তুলিয়া বলিতো—ছোটদা, তুমি যদি একাজ কর তবে কিন্তু যমদূতেরা তোমায় ঠেলে অগ্নিকুণ্ডে ফেলে বাঁশ দিয়ে গুতোবে। তাহার কথা শুনিয়া আমার প্রাণ শিহরিয়া উঠিতো। তারপর পাশে বসা তার মধুর কথাগুলি শুনিতে শুনিতে আমার সারা মন প্রাণ পবিত্রতায় ধুইয়া যাইতো।

পৈতার পর চাঁদপুর পৌঁছার পরের দিনই পঞ্চম শ্রেণীতে গিয়া বসিলাম। আগের রাত কাটিয়াছে উমানাথ ঘোষালের দলের অভিমন্যু বধ পালা দেখিতে আদালত কাছারির বারোয়ারির মাঠে। তখন চাঁদপুরে প্রতি বছরই আদালত ও ফৌজদারী কাছারির আমলারা বারোয়ারি উপলক্ষে প্রচুর টাকা খরচ করিতো। নানা দেবদেবীর মূর্তি গড়ানোর সাথে নানা দেশ হইতে যাত্রা, কবি, খেমটার দলও আনা হইতো। মুখুজ্যে

মশায়ের উপদেশ ছিল সকল আমোদেই যোগ দিতে ঘোমটা ছাড়া। আমি আজ পর্য্যন্ত তার এ-উপদেশ প্রতি অক্ষরে হুবহু পালন করিয়াছি। ক্লাশে বসার পরই ঘুমে মাথা ঢুলিতে লাগিল। পঞ্চম শ্রেণীতে তখনকার মাষ্টার ছিলেন পঞ্চম শিক্ষক গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী। তিনি আমাকে ঝিমাইতে দেখিয়া বলিলেন—কি সুরেশ ঝিমাচ্ছ যে, কাল রাতে বুঝি ঘুম হয় নাই? মাষ্টারের ভয়ে কোন কথা লুকানো আমার স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল। দাঁড়াইয়া বলিলাম—সার, কাল সারারাত যাত্রা দেখেছি। তখনই একখানা বেঞ্চ খালি করিয়া আমায় ঘুমাইতে বলায় মুহূর্ত্ত মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িলাম। এই গোবিন্দ মাষ্টারের ছেলেদের ভদ্র ব্যবহার শেখানোর দিকে তীক্ষ্ণ নজর ছিল। অভদ্রভাবে কথা বলা তিনি সইতে পারিতেন না। "He"র বাংলা "সে" করিলে অমনি গালে এক চড় মারিয়া বলিতেন—"তিনি" বলতে পার না? আমাদের দেশের শিক্ষক ও অভিভাবকেরা এ-বিষয়ে উদাসীন বলিয়া বড় হওয়ার পর দেশ বিদেশে দশজনের সাথে মিশিয়া আমরা কাজ করার সাহস পাই না। বিদেশী কাউকে দেখিলেই আমরা যেন অথৈ জলে পড়ি, কি করিব কিছুই ঠিক করিতে পারি না। ইংলণ্ডের শিক্ষকদের এ-বিষয়ে কড়া নজর বলিয়াই সেখানকার ছেলেরা সংসারক্ষেত্রে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে স্ফীত বুকে বন্য সিংহের মতো।

কুলচন্দ্র

আমার ভাগ্নী নগেনের জামাই আমাদের বাসায় থাকিয়া চাঁদপুর স্কুলের সপ্তম শ্রেণীতে পড়িতো পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বাৎসরিক পরীক্ষা চলিতেছে। ভালো ছেলের খোঁজ নেওয়ার অভ্যাস আমার ছোট বেলা হইতেই ছিল। আমি রাজেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম—তোমাদের ক্লাশে পরীক্ষায় প্রথম হচ্ছে কে হে? সে বলিলো—কুলচন্দ্র। কুলচন্দ্র—সে আবার কে, আমার সাথে আলাপ করিয়ে দিবে? রাজেন্দ্র বলিলো 'আচ্ছা'। তার পর কুলচন্দ্র কোন পরীক্ষায় কত নম্বর পাইয়াছে সে বলিতে লাগিল। দেখিলাম সে প্রায় পরীক্ষাতেই পুরা নম্বর পাইয়াছে। অবাক হইয়া মনে মনে ভাবিলাম—এতো ভালো ছেলে অথচ আমি এর কোন খোঁজ রাখি না। তাকে দেখার জন্য মন চঞ্চল হইল। পরের দিন আমি যাইতেছি আমাদের বাসার সামনের রাস্তা দিয়া পশ্চিম দিকে, দেখি অপর দিক হইতে তিন চারটি ছেলে সহ রাজেন্দ্র আসিতেছে। তাহাদের পাশ কাটাইয়া যাইতেই একজন তাহাদের সঙ্গ ছাড়িয়া আমার সাথে চলিতে লাগিল। প্রাণের মাঝে কে যেন বলিল এই "কুলচন্দ্র।" আড়-নয়নে তার পানে বার বার তাকাইলাম কিন্তু লজ্জায় মুখ ফুটিয়া একটি কথাও বাহির হইল না। সন্ধ্যা অবধি সারা সহর পাশাপাশি হইয়া এভাবে ঘুরিলাম কিন্তু কোন কথাই হইল না আমাদের মাঝে। পরদিন বেলা একটায় পরীক্ষা-শেষে সহরের মাঝের পথে

বাসায় ফিরিতেছি, হঠাৎ শুনিলাম পাশের বাড়ী হইতে কে যেন ডাকিল—'সুরেশ!' ডাক শুনিয়া প্রাণটা চমকিয়া উঠিল। থমকে দাঁড়িয়ে সে দিকে তাকাইয়া রহিলাম কিন্তু দিশা করিতে পারিলাম না কাহার সে মধুর কণ্ঠস্বর।

সেদিন সন্ধ্যায় রাজেন্দ্রের সাথে গেলাম এক বাসায় যাত্রা শুনিতে। লোকে লোকারণ্য। আসরের এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া দেখি—পাশে কুলচন্দ্র দাঁড়ানো। অজ্ঞাতে আমার বাঁ হাত খানা উঠিল তাঁহার কাঁধের উপর। দু-চার মিনিটের কথায় বুঝিলাম—কার সে কণ্ঠস্বর। এক নূতন ভাব তড়িৎ বেগে সারা হৃদয়ে খেলিয়া গেল। একটু পরেই ভয়ানক তুফান উঠিল। আমরাও প্রাণ লইয়া পলাইলাম যে যার বাসা পানে। বাসায় পৌছিয়াই রাজেন্দ্র মুচকি হাসিয়া আমায় বলিল—তোমার বন্ধুত্ব হয়েছে কুলচন্দ্রের সাথে। লজ্জায় আমার মুখ হইল লাল, প্রাণ আড়ষ্ট। দ্বিধা জড়িত কণ্ঠে বলিলাম—দুর, তোমার যতো বাজে কথা। খাওয়া দাওয়ার পর বিছানায় শুইতে গেলাম—ঘুম আর আসে না। রহিয়া রহিয়া শুধু বন্ধুত্ব এই কথাটি বাজিতে লাগিল আমার কানের গোড়ায়, হৃদয়ের মাঝে। আনন্দে যেন দম আটকে আসে। বিছানায় আর শুইয়া থাকা যায় না—বেরিয়ে পড়িলাম রাস্তায়। মেটে মেটে জ্যোৎস্নায় সারা পৃথিবী ভরা। অদূরে নদীর জল চিক্ মিক্ করিতেছে। প্রাণের আনন্দ আরো বাড়িল। শেষ রাত অবধি নদীর পাড়ের রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইলাম। ফর্সা হওয়ার একটু আগে পাখীর ডাকার সাথে বিছানায় গিয়া শুইলাম।

ঘুম যখন ভাঙ্গিল তখন বেলা নয়টা। বোনদি জিজ্ঞাসা করিলেন—কি-রে, অসুখ হয়েছে নাকি, উঠতে এতো বেলা হ'লো কেন ? হাঁ, না—কিছু না বলিয়া তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়িলাম-বাসায় যে মন টিকে না।

উদাস প্রাণে রাস্তায় চলিতে চলিতে অজানা টানে ঠিক সেইখানে পৌঁছিলাম—যেখানে আগের দিন শুনিয়াছি অজানা কণ্ঠের অতি মধুর স্বরে উচ্চারিত "সুরেশ" এই ধ্বনি। সেখানে পৌঁছিয়াই দেখি পাশের এক বাসা হইতে ছোট একটি বোঁচকা হাতে লইয়া কুলচন্দ্র বাহির হইতেছে। আমাকে দেখিয়াই হাসিতে হাসিতে বলিল—সুরেশ, বাড়ী চল্লাম এই দশটার গাড়ীতে। আমার বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। সে বুক পকেটের ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিয়া বলিল—আর সময় নেই, সাত দিন পর আবার দেখা হবে। বলিয়াই সে জোরে ছুটিল ষ্টেশনের দিকে। আমি শুধু হাঁ করিয়া অতি জোরে চলিয়া যাওয়া তাহার পানে তাকাইয়া রহিলাম—মুখে একটি কথাও ফুটিল না। রাস্তার মোড়ে তাহার অদৃশ্য হওয়ার সাথে সাথে শুধু মনে হইল পৃথিবীটা যেন পায়ের তলা হইতে খসিয়া পড়িল। থতমত ভাবে খানিকক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া দূরে বিলীয়মান তাহার কালো ছায়া হৃদয়ে বহিয়া বাসার দিকে ফিরিলাম—ঢুলিতে ঢুলিতে মদের নেশায় ভোর মাতালের মতো।

সেদিন রাতের ষ্টীমারে আমার বাড়ী যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু পা নড়িতে চাহিল না। মন যেন চাঁদপুরের মাটীতে

শিকড় গাড়িয়াছে। কোন এক নূতন রূপের প্রবল টানে মন হইতে যেন দূর হইয়া গেল মা বোনদের জন্য এতোদিনকার পাথরের মতো ভার মায়ার বোঝা। আত্মীয় স্বজনের জন্য মনের টানের এই শিথিলতা আজো দূর হয় নাই। প্রয়োজন মতো তাহাদের সেবা করিয়াছি কিন্তু তাহাদের সাথে প্রাণের যোগ ছিল খুব কমই। অতি কষ্টের এই সাত দিন যেন আর কাটে না। দিনগুলি ক্রমশঃই যেন বড় হইতে লাগিল। তারপর এক সন্ধ্যায় কুলচন্দ্র আমাদের বাসায় হঠাৎ হাজির হইয়া বলিল—এই চারটার গাড়ীতে এসেছি।

দুজনে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম। তারপর তার ভাবে প্রাণ এমনি মজিল যে এক মুহূর্ত্তও তাহাকে ছাড়িয়া ভাল লাগিতো না। অনেক সকাল কাটিতো তাহাদের বাসায়। ইস্কুলেও ঘণ্টার ফাঁকে ফাঁকে একবার দেখা হওয়া চাই। ছুটীর পর প্রথম একদফা কাটিতো তাহার সাথে খাওয়ার আগ অবধি রাত নয়টা পর্য্যন্ত। খাওয়ার পর আবার বাহির হইতাম বাগানের রাস্তায়—অনেক আঁকা বাঁকা পথ পার হইয়া উপস্থিত হইতাম আমাদের মিলনস্থলে, চকের কাছে একটা উঁচু পুলের উপর। সেখানে বাজিতো রাত বারোটা একটা। পরে বিদায়ের শোকভার হৃদয়ে বহন করিয়া চুপে চুপে ফিরিয়া আসিয়া বাসায় শুইয়া পড়িতাম। এমনি অবস্থায় এ পুলের উপর হঠাৎ একদিন দেখা হইল হেড্‌মাষ্টার নবকান্ত মুখার্জ্জির সাথে। মোটালাঠি কাঁধে, দীর্ঘ শ্মশ্রু হেড্‌মাষ্টার মশায় ফিরিতেছিলেন কোন এক বন্ধুর বাসায় নিমন্ত্রণ রক্ষার পর।

তাঁহাকে আসিতে দেখিয়াই কুলচন্দ্র পলাইল। আমি সেখানেই দাঁড়াইয়া রহিলাম। কি করছিস দুষ্টু ছেলেরা এতোরাত্রে এখানে—বলিয়া হেডমাষ্টার মশায় আমার পিঠে কয়েক ঘা লাঠি মারিলেন। বাসায় চলে যা বলায় সুড় সুড় করিয়া নত-মুখে সেখান হইতে রওনা হইলাম।

এমনি মত্ত অবস্থায় ছয় মাস কাটিল। সামনেই ষাণ্মাসিক পরীক্ষা। কোন নূতন বই এ-নাগাৎ ছোঁয়া হয় নাই। অন্যান্য বিষয়ে ফল হইল মোটের উপর মন্দ নয়। কারণ আগের পড়াতেই অনেকটা চলিল কিন্তু অঙ্কে এক-শ নাটের মধ্যে মোটে পাইলাম ৩৯—জ্যামিতি ও এল্‌জাব্রায় ৮০ ও ৪০ এর মধ্যে শূণ্য।

বোনদি পরীক্ষার ফল শুনিয়া রাগিয়া আগুন হইলেন। মুখুজ্যে মশায় ব্যাঙ্গ করিয়া বলিলেন—সুরেশের আর ভয় কি? ওর তো চলবে নলিনীর বাসায় বাজার সরকারী করেই। কড়া শাসন তার ধাতেই ছিল না। পড়াশুনা না করিয়া কোন দিন ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিলে ঈষৎ হাসিয়া বলিতেন—আজ বুঝি ছুটী? শিরা যে বড় ঢিলা দেখাচ্ছে। সহরে ভাল ছেলে বলিয়া আমার একটা খ্যাতি ছিল। এই ফলের সংবাদে সারা সহরে তোলপাড় আরম্ভ হইল। পথে ঘাটে প্রায়ই শুনিতাম, লোকে বলাবলি করিতেছে—আরে শুনেছিস্ 'সুরেশে'র এই কীর্ত্তি। ক্লাশে চিরকালই থাকিতাম সকলের উপর, এখন স্থান হইল সকলের শেষে পিছনের বেঞ্চে। ইংরাজীর মাষ্টার ভুবনমোহন রায়—Suresh is going to the dogs day by day—এই

লাইনের বাংলা করিতে একদিন স্কুলের ছেলেদের বলিলেন। এই সব কথায় প্রাণ লজ্জা ও সঙ্কোচে ভরিয়া যাইতো, ভাবিতাম আর যাইব না তাহার কাছে কিন্তু একটু পরেই তার কাছে যাওয়ার জন্য মনের আকাঙ্ক্ষা ফুলিয়া উঠিতো রুদ্ধ স্রোতের মতো। আবার ছুটিয়া যাইতাম তাহার কাছে—কাটিতো অধিকাংশ সময় তাহারই সাথে।

আরো গেল মাস খানেক—তারপর আর তার কোন পাত্তা নাই। না আসে সে আমার কাছে, না দেখা যায় তার টিকিটি। ইস্কুলে টিফিনের সময় না মিলে তার সাক্ষাৎ, ছুটির পর না পাওয়া যায় তাকে তার বাসায়। কাউকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেও লজ্জায় প্রাণ আড়ষ্ট হয়—মুখে ফোটে না কথা। একলা কাটাইতে লাগিলাম টানা দিনগুলি প্রাণের মাঝে বিরহের কালো মেঘ বহিয়া। এরপর হঠাৎ একদিন তার দেখা পাওয়া গেল আমাদের সহপাঠী জ্ঞান দত্তের বাসায়। সে খেলিতেছিল তাস ফরসা চেহারা, কোঁকড়ান চুলে তেড়ি কাটা, আমার সমান বয়সী একটি ছেলের সাথে। তাহাকে দেখামাত্র আমার চোখে যেন সূচ বিঁধিল। কুল আমার পানে চাহিয়া একটু ম্লান হাসি হাসিল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম ছেলেটীর নাম ভূপালচন্দ্র ঘোষ, পড়ে সে বরিশাল ব্রজমোহন স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে। বিশেষ কোন কথা কেউ বলিল না আমার সাথে কিন্তু প্রাণের নাওখানা হইল ভারী চঞ্চল। আচমকা তুফানের দারুণ আক্রমণে ছুটিল সে সেখান হইতে এধার ওধার উদাসভাবে বিদ্যুৎগতিতে।

কয়েকদিনের পরের কথা। দেখি ইস্কুলের কাছের পথে কুলচন্দ্র হন্‌হন্‌ করিয়া যাইতেছে পোষ্টাফিসের দিকে। উপরের পকেটে উঁকি মারা একখানি এনভেলাপ ছোঁ মারিয়া লইয়া দেখি ভূপালের কাছে লেখা। পড়িয়া বুঝিলাম কুলচন্দ্রের প্রাণ এখন ভূপালের প্রেমে ভরা। রাগে টুকরা টুকরা করিয়া ছুড়িয়া ফেলিলাম পত্রখানি তার গায়ে মুখে। তবুও শরীর ঠাণ্ডা হইল না—রাগে গর্‌ গর্‌ করিয়া তার গায়ে কয়েক ঘা ঘুসী বসাইয়া দিয়া তাড়াতাড়ি সেখান হইতে বিদায় হইলাম।

সে-রাত্রে মনে ভারী দুঃখ হইল—কেন তাকে মারিলাম? ভূপালকে ভালবাসিয়া সে এমন কি অপরাধ করিয়াছে—এ কথাটি ঘুরিয়া ফিরিয়া মনের মাঝে বার বার খেলিতে লাগিল। আগাগোড়া সব ঘটনার সংক্ষেপ বর্ণনার পর ক্ষমা চাহিয়া তার কাছে লেখা পত্রখানি পরদিন ডাকে দিলাম। উত্তরে সে লিখিল—তুমি ব্রাহ্মণ, আমি শূদ্র, তোমার ও আমার মাঝে খাদ্য খাদক সম্বন্ধ। খাদ্য খাদকের বন্ধুত্ব অসম্ভব। পত্র পড়িয়া আমি অবাক্‌। উত্তরে লিখিলাম—ব্রাহ্মণের অভিমান মনে আমার কোন দিনই নাই। যদি সত্যিকার বামুণ হই, তবে এর জন্য তোমায় একদিন আমার পা ছুঁইয়া ক্ষমা চাহিতে হইবে।

মনের ভিতরের সংগ্রাম চলিল আরো কিছুকাল। এর পরের একটি ঘটনা আমার বিশেষ সহায় হইল মনকে শান্ত করিতে। সামনেই এলজাব্রার পরীক্ষা। স্থির করিলাম এ-চঞ্চল মনকে সমাহিত করিব দিন রাত এল্‌জাব্রার আঁক কষায়। এরূপ করার ফলে এল্‌জাব্রার সে পরীক্ষায় প্রথম

হইলাম। অঙ্কের মাষ্টার বরদাবাবু প্রফুল্লমুখে বলিলেন—পড়লেই তো তুমি বেশ পার। বরদাবাবু ধীর স্থির গম্ভীর মানুষ। তার প্রত্যেকটি কথা ওজনকরা।

এর কিছুদিন পরে চাঁদপুরে আসিলো একটি সার্কাস পার্টি। ছেলেদের খেলা দেখিয়া আমারও ভারী সখ হইল তাদের মতো খেলা শিখিতে। এক আধবার ইচ্ছা হইল তাদের সাথে চলিয়া গিয়া সারাজীবন সার্কাস পার্টিতে কাটানোর। কিছুদিন আগে সুরেশ বিশ্বাসের জীবনী পড়িয়াছিলাম। তার ভাবেই তখন মন ছিল আনাচে কাণাচে ভরা। দলের ধারে দুচার দিন আনাগোণাও করিলাম কিন্তু শেষটায় ফল ফলিল না কিছুই। সে-অবধি মনে জেদ চড়িল ডন্ শিখিতে—উদ্দেশ্য নিজের পরে একটি সার্কাস পার্টি খোলার। ভর্ত্তি হইলাম রজনী মুখুজ্যের ছেলে উপেনের আখড়ায়। সে কসরৎ খুব বেশী শিখাইতো না বটে কিন্তু বলিতো শরীর লোহার মতো শক্ত করিতে মুগুর পিটিয়ে পিটিয়ে। নিজের শরীর সে অনেকটা লোহা করিয়াওছিল। এখন সে কুমিল্লায় বহু কোম্পানীর কর্ম্মকর্ত্তা। শরীরখানা এখনো তাহার নিটোল, খাটিতেও পারে সে গাধার মতো সকাল হইতে সন্ধ্যা অবধি। কিন্তু আমার তুলার শরীর শত পিটানো সত্ত্বেও খুব বেশী শক্ত হইল না।

এর কিছুদিন পরেই চাঁদপুরে আসিল বড় বড় বাঘ সহ শ্যামাকান্ত বাবুর দল। ডনবীর শ্যামাকান্তের বাড়ী আমাদের গ্রামেই। তিনি আড্ডা গাড়িলেন তার মেয়ের শ্বশুর রজনী মুখুজ্যের বাসায়। আমি তার কাছে প্রায়ই যাইতাম। তিনি

আমায় স্নেহও করিতেন অন্যের চেয়ে একটু বেশী। আমার দোহারা শরীরখানা দেখাইতো জোয়ানের মতো। তিনি একদিন আমার শরীর টিপিতে টিপিতে বলিলেন—তোর্ শরীর খুব ভাল হয় যদি ব্রহ্মচর্য্য পালন করিস্। ব্রহ্মচর্য্য কথা এই আমি প্রথম শুনি। একটু অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম তাহা আবার পালন করে কিরূপে। উত্তরে তিনি বলিলেন—শরীরকে ভাল বাসতে হবে কৃপণের ধনের মতো, এতোটুকু যেন অযথা নষ্ট না হয়। এই কথা কয়টি এখন হইতে হইলো আমার পথের আলো।

গোবিন্দ কীর্ত্তনীয়া

তারপর আসিল গোবিন্দ কীর্ত্তনীয়ার দল। গোবিন্দ কীর্ত্তনীয়ার বাড়ী আমাদেরই দেশে পালং গ্রামে। তখন তা'র চেয়ে বড় কীর্ত্তনীয়া আমাদের অঞ্চলে তো ছিলই না—সারা বাংলায়ও ছিল কি না সন্দেহ। সে গাইতো পুরাণ—কৃষ্ণলীলা, রাই উন্মাদিনী, বিচিত্র বিলাস প্রভৃতি। তার গান একনাগাড়ে আঠারো দিন শুনিয়া আমার প্রাণ কৃষ্ণের প্রেমে পাগলের মতো হইল। সামিয়ানার নীচে বিছানা পাতা হইতে না হইতেই আমি গিয়া বসিতাম আসরের মাঝখানে গোবিন্দ কীর্ত্তনীয়ার সামনাসামনি—প্রায় মুখোমুখী ভাবে। গোবিন্দ কীর্ত্তনীয়া নিজে সাধক ছিলেন। প্রাণের অধীর আবেগে প্রায় বেহুস তিনি যখন মাথা ও হাত নাড়িতে নাড়িতে মধুর পদাবলী আরো মধুর কণ্ঠে আমার মুখের কাছে মাথা নামাইয়া কাঁদ কাঁদ সুরে

গাহিতেন তখন আমার প্রাণের বিগলিত প্রেম শতধারে নয়ন কোণে ঝরিয়া পড়িতো। এমনিভাবে চলিতো সাত আট ঘণ্টা। খাওয়া দাওয়ার কথাও মনে থাকিতো না। রাত দুটার সময় বাসায় ফিরিয়া লুকাইয়া ঠাণ্ডা ভাত খাইতাম। পরদিন প্রাতে ঘুম হইতে উঠিয়াই আবার যাইতাম তাহার কাছে কৃষ্ণকথা শুনিতে। তিনি আমাদের বাসার কাছেই থাকিতেন। কথা কইতে কইতে উচ্ছ্বাসে তার প্রাণ ভরিয়া উঠিতো। ডুবিব ডুবিব সখী রাধাকুণ্ড নীরে—এই পংক্তিটি ধীরে ধীরে বার বার গাহিয়া কহিতেন—রাধার প্রেম-সাগরে ডোবা চাই, পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখলে কিংবা উপরে ভেসে থাকলে চলবে না। এ-সব গভীর তত্ত্বপূর্ণ কথার ভিতরের ভাব বোঝা আমার তখনকার বয়সের পক্ষে অসম্ভব ছিল। আমার শুধু মনে হইতো, বাড়ী-ঘর, আত্মীয়-স্বজন, লেখাপড়া সব ভুলিয়া প্রায় এমনি এক প্রেমেতো মজিয়াছিলাম কিন্তু তলা অবধি ডুবিতে পারিলাম কৈ? হৃদয়ের তলদেশ মথিত করিয়া বাহির হইয়া আসা এক দীর্ঘশ্বাস শূন্যে বিলীন হইয়া যাইতো।

বিল্বমঙ্গল নাটক।

চাঁদপুরে এ-সময়ে অভিনীত বিল্বমঙ্গল নাটক আমার তখনকার চরিত্রের উপর বিশেষ একটী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। চাঁদপুরে তখন কোনো স্থায়ী ষ্টেজ ছিল না। আমাদের স্কুল ঘরে সীন্ টানাইয়া চাঁদপুরের শিক্ষিতেরা কখনো কখনো নাটক করিতো। বিল্বমঙ্গল নাটকে বিল্বমঙ্গলের পাঠ

নেয় দাদারই চাঁদপুর স্কুলের সহপাঠী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া নরেন বাবু এল্, এ পড়িতে ঢাকা যান। সেখানে ডায়মণ্ড থিয়েটারে নাটক করায় মত্ত হওয়ায় এল, এ পাশ আর তার অদৃষ্টে ঘটে না। চাঁদপুর ফিরিলেন বেশ্যাসক্ত মাতালরূপে। মাতাল নরেন বাবুর প্রাণঢালা বিল্বমঙ্গলের অভিনয় দেখিয়া আমার প্রাণ পাগল হইলো বিল্ব-মঙ্গলের মতো সব ছাড়িয়া কৃষ্ণলাভের জন্য। বিল্ব-মঙ্গলের মতো দিনরাত প্রার্থনা করিতাম—কৃষ্ণ, তুমি আমায় হাত ধরে বৃন্দাবন লয়ে চল। আমি চিরদিনই ভাবপ্রবণ। ভাবের মুখেই আমি জীবন পথে অগ্রসর হই। নিত্য নূতন ভাব-আহার না জুটিলে আমার ক্ষুধিত প্রাণ শুকাইয়া হয় ঝুনা নারিকেলের মতো। যে ক'দিন বিল্ব-মঙ্গল নাটক হইল—কৃষ্ণের প্রেমসাগরে ডুবিয়া বেশ কাটাইলাম। তারপর ভাবের অভাবে প্রাণ যখন আধমরা হইয়া আসিল, চারিদিকের অন্ধকারে হাতড়াইতে হাতড়াইতে যেখানে ঠেকিলাম, সেখানে যে আলোর সন্ধান মিলিল, তা একেবারে নূতন।

চাঁদপুরের বাসায় পীঠা ও পায়স প্রায়ই হইতো। আর বাসী ঠাণ্ডা সে-সব খাওয়ায় পেটের অসুখ লাগিয়াই থাকিতো। জিহ্বার লালচে বার বার পাতলা দাস্ত হওয়া সত্ত্বেও সেই পীঠাই আবার পেট ভরিয়া গিলিতাম। মাঝে মাঝে লুকাইয়া সরকারী ডাক্তার খানায় গিয়া ওষুধ খাইতাম বটে, কিন্তু এতো অত্যাচারের সামাল দেওয়া ছিল সে সামান্য ওষুধের শক্তির বাহিরে। ফলে পেটের অসুখ আর সারিতো না। তার উপর বাতির সামনে

মাথা রাখিয়া শেষরাত্রে পড়ার ফলেও এ-অসুখ বাড়িতো। শেষ রাত্রে জাগিয়া পড়ায় লাভ হইতো না কিছুই, বরং সুন্দর সকালটা বসিয়া বসিয়া ঝিমানোয় মাটি হইতো। এলোপ্যাথি, হোমিও-প্যাথি কবিরাজী এবং জোয়ানের আরকেও যখন কোন ফল ফলিল না তখন প্রতীকারের চেষ্টা করিলাম অন্য পথে।

প্রথম সাধু সঙ্গ।

চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্ট যাওয়ার পথে বলিয়া তখন চাঁদপুরে অনেক সাধু সন্ন্যাসীর শুভপদার্পণ ঘটিতো। মহেন্দ্র ডাক্তারের বাসায়ই ছিল এই সব সাধুদের আড্ডা। পেটের অসুখের খুব ভাল ঔষধ জানে বলিয়া একবন্ধু আমায় লইয়া গেলেন মহেন্দ্র ডাক্তারের বাসায় এক তরুণ সন্ন্যাসীর কাছে। সেই তরুণ সন্ন্যাসীর মুখে ইংরাজী কথা শুনিয়া প্রাণের সমস্ত ভক্তি লুটাইয়া পড়িল তাহার চরণতলে। তার কাছেই প্রথম শিখিলাম মা কালীর নাম-যপ। পেটের অসুখেরও একটা ওষুধ তিনি বাতলাইলেন বটে, কিন্তু তাতে ফল ফলিল না কিছুই। কিন্তু মা কালী আমায় পাইয়া বসিলেন। প্রাতে, সন্ধ্যায়, স্কুল ছুটীর পর সুপারী বাগানের আড়ালে, রবিবার সারা দুপুর আমগাছের ডালে বসিয়া শুধু মার নাম জপিতাম। মার নাম জপার লোভ বাড়িল আরো একটি কারণে। স্কুলের সময় পায়খানা পাইলে মার নাম করিলেই তাহা বন্ধ হইতো, এমনি মন মজিতো মার নামে। মার নাম জপিতে জপিতে পড়াশুনা পুনঃ প্রায় সিকায় উঠিল। তখন আমি থাকিতাম বাসার ভিতর পশ্চিমের ঘরে। সন্ধ্যার

পর অনেক দিন দক্ষিণের জানালা দিয়া চাহিয়া থাকিতাম বাহিরের অন্ধকার পানে। কি দেখছ—কেউ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতাম—অন্ধকারের সাথে আলাপ করছি। সকলে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিতো, পাগল ভাবিতো—তাহারা বুঝিবে কিরূপে আমার আধার রূপিণী জীবন্ত মার সাথে আলাপের কথা। এই ভাবে বিভোর—এমনি সময়ের দুটি ঘটনা আমার মন টানিয়া নিল মার চরণ হইতে সংসারের অপর প্রান্তে।

বুয়ার যুদ্ধ।

এই দুটি ঘটনার প্রথমটি দক্ষিণ আফ্রিকার ১৮৯৯ সালের বুয়ার যুদ্ধ। এই যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ অনাবশ্যক। শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে দক্ষিণ আফ্রিকার ওলন্দাজদের উপনিবেশ অরেঞ্জ ফ্রী ষ্টেট্ ও ট্রান্সভাল ইংরেজেরা প্রথম দখল করে ১৮৭৭ সালে। এই উপনিবেশদ্বয়ের ওলন্দাজদেরই বলা হইতো বুয়ার। বীর বুয়ারেরা এই পরাজয়কে বিধির বিধান বলিয়া মানিয়া না লইয়া স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। ফলে ইংরাজেরা হারে মাজুবা পাহাড়ের যুদ্ধে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে। এরপর বুয়ারেরা আবার স্বাধীন হয়। অপমান পকেটে গুজিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকা ইংরাজদের স্বভাব বিরুদ্ধ। তাই ১৮৯৯ খৃঃ অব্দে আবার যুদ্ধ বাঁধে। এই যুদ্ধ চলে তিন বৎসর অবধি। মুষ্টিমেয় বুয়ার নরনারীর জলন্ত ত্যাগ ও অসীম সাহস আমার প্রাণে নূতন আগুন জ্বালিল। তখনকার মনোভাবের

বিস্তৃতবিবরণ বর্ত্তমানে দেওয়া অসম্ভব। শুধু এটুকু মনে আছে যে বুয়ারদের জয় ও ইংরাজের পরাজয়ের জন্য মার কাছে দিন রাত প্রার্থনা করিতাম। তখন আমার বয়স বারো কি তেরো। ইংরাজী কাগজ পড়িবার ক্ষমতা তখনো হয়নি। কিন্তু চাঁদপুরে-আসা বাংলা কাগজ কখানা আগাগোড়া পড়িয়া মুখস্থ করিয়া ফেলিতাম আর বন্ধুদের বাড়ী ঘুরিয়া সে-সব তাহাদের বলিতাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ইহা লইয়া আলোচনা চলিতো। বুয়ারদের জয় সংবাদে প্রাণ আহ্লাদে আটখানা হইতো। আর তাদের পরাজয়ে প্রাণ মুষড়াইতো। উন্মত্ত প্রাণের অদমনীয় আবেগে বাসার সামনে পোতা এক বাঁশের আগায় উড়াইয়া দিলাম কালো অক্ষরে "Long live Botha" লেখা সাদা নিশান। সকলেই ভয় দেখাইল পুলিশে ধরিবে, কিন্তু সেই ভয়ের কথা আমার প্রাণের কিনারাতকও পৌছিলনা। এই নেশার ঝোঁকেও অনেকদিন পর্য্যন্ত পড়া বন্ধ রহিল।

বকসার জাগরণ

বুয়ার যুদ্ধের মাঝামাঝি সময় চীনের বকসারেরা মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়ায় পৃথিবীর প্রায় সব সভ্যজাতির বিরুদ্ধে। ১৮৯৪—৯৫ সালে জাপানীদের সাথে যুদ্ধে পরাজয়েই চীনাদের প্রথম চোখ খোলে। তখন হইতেই একদল চীনা তরুণ নিজেদের সঙ্ঘবদ্ধ করে আফিংএর নেশায় আচ্ছন্ন মৃতপ্রায় জাতির বুকে নূতন প্রাণের সাড়া জাগাইতে। এইদলই বক্সার নামে অভিহিত। ইহাদের দৃষ্টি পড়িল শুধু জাপানের দিকে নয়, ইউরোপের বড়

বড় শক্তির উপরও। ঘুমন্ত চীনকে ভাগ বাঁটোয়ারা করিয়া ভাগ দখল করার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাপানের সাথে সাথে জাগে রুষ, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স এবং জার্ম্মাণীর মনেও। ১৮৯৮ সালে জার্ম্মাণী দখল করে কায়াচো, ইংল্যাণ্ড উই-হাই-উই এবং রুষ মাঞ্চু দখল করিয়া সাইবেরিয়ার রেলপথ বাড়ায় পোর্ট আর্থার বন্দর অবধি। চারিদিক হইতে পিষিয়া মারার এই প্রবল চেষ্টাকে জাতীয় মহাপ্রমাদ মনে করিয়া ইউরোপীয়ানদের চীন হইতে তাড়ানোর উদ্দেশ্যে ১৯০০ সালে বকসারেরা কোমর বাঁধে। যাহার ফলে বহু ইউরোপীয়ান ও খৃষ্টান হত হয়। শেষে একটা রফা হইয়া এই যুদ্ধের অবসান ঘটে।

বকসারদের জাগরণের ঢেউ ভারতের কিনারায়ও ধাক্কা মারে। সেই ধাক্কার চোটে দীর্ঘ দিনের পুরাণ ঘুম পুরাপুরি না ভাঙ্গিলেও ভারতের চোখ খাণিক খোলে—আর কাণ একটু খাড়া হয়। বিদেশীরা যে তাহার বুকের রক্ত চুষিয়া চীনাদের মতো তাহাকেও রক্ত শূন্য করিতেছে, এই প্রশ্ন তাহার প্রাণের মাঝে বার বার চমকাইতে থাকে। সে ভাবিতে আরম্ভ করে, সেও কি বকসারদের মতো কিছু করিতে পারে না—পাথরের মতো বুকে চেপে-বসা বিদেশীদের হাত হইতে দেশ মুক্ত করিতে।

এই সব আন্দোলনের দুটি কার্য্যকরী ফল ফলে আমার উপর। আমি বুঝিতে আরম্ভ করি ধর্ম্ম সেবার নামে মিশনারীরা এই যে আমাদের বুকে দিনের পর দিন অধিক শিকড় গাড়িতেছে তাহারও প্রধান উদ্দেশ্য ইংরাজের শাসন ভিত আরো বেশী পাকা

করা। ফলে মিশনারীদের বিরুদ্ধে আমার মনে বিদ্বেষ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। আগের মতো বাইবেলের কথা আর বিনা প্রতিবাদে গিলিতে পারিতাম না। প্রায়ই বলিয়া উঠিতাম—আমাদের ধর্ম্ম তোমাদের ধর্ম্মের চেয়ে অনেক ভাল। শাস্ত্র কখনো পড়িনি—শাস্ত্রের কথা কিছু জানিতামও না। শাস্ত্রের নামে মনগড়া কথা অনর্গল আওড়াইতাম প্রাণের আবেগে।

স্বদেশী

ইহার পর হইতেই স্বদেশী জিনিষের ব্যবহারের দিকে আমার নজর পড়িল। এর আগে ফিন্‌ফিনে বিলাতী কাপড় ও পাতলা আদ্দীর জামার জন্য প্রাণ উতলা হইতো। নিজের কেনার ক্ষমতা না থাকিলেও বোনদিদি ও মুখুজ্যেমশায় এসব দিতেন। আমাদের স্কুলের ডিবেটিং ক্লাবের এক সভায় স্বদেশী ও বিলাতী একবার করা হইলো আলোচ্য বিষয়। প্রধান প্রবন্ধ লেখার ভার পড়িল আমারই উপর। বাংলায় লেখা আমার সেই প্রবন্ধ পড়িয়া অনেকের প্রাণেই নূতন ভাব-শিখা জ্বলিয়া উঠে। প্রশংসার বাণীও শোনা গেল সে-প্রবন্ধ সম্বন্ধে, সে সভায় ও তাহার বাহিরে। একদিন এক বন্ধু আমার বাসায় আসিয়া বলিলেন—চেষ্টা করিলে আপনার হাত হতে কালে তালো লেখা বার হবে। সারাজীবন চেষ্টাও করি নাই, চেষ্টা করিলে কি হইতো বলিতেও পারি না। তাহার পর হইতেই কোন জিনিষ কেনার আগে তলাইয়া জানিতে চাহিতাম, জিনিষটা স্বদেশী কি বিদেশী। যদিও দেশী জিনিষ সম্বন্ধে ধারণা তখন

আমার অতি অল্পই ছিল এবং বজ্র আঁটনী ফস্‌কা গিরোর মতো স্বদেশীর কম জ্ঞানের ফাঁকে অনেক বিলাতী জিনিষই আমার গায়ে উঠিতো, তবু সে-সময় হইতে স্বদেশী-ভাবটা ফুলের বুকে গন্ধের মতো আমার প্রাণে জড়াইয়া রহিলো।

বড়দাদা

চরিত্রের নিজের কোন পাকা গাঁথনি না থাকায় তখন আমাকে চলিতে হইতো নদীতে ভাসা কাষ্ঠ খণ্ডের মতো ঢেউএর ধাক্কা খাইতে খাইতে। এমনি সময় বি-এ পাশ করার পর আইনের ক্লাশে এক বৎসর হাজিরা দিয়া দাদা আসিলেন পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনের মাষ্টাররূপে আমাদের স্কুলে। বহুদিন হইতে এক ভাবে চলিয়া আসায় চাঁদপুর স্কুলের আবহাওয়া অনেকটা এক ঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছিল। মাষ্টারেরা ভাল পড়াইতে পারেন না এই অভিযোগ ছাত্রদের মুখে প্রায়ই শোনা যাইতো। অনেক ভাল ছেলে রাগে স্কুল ছাড়িয়া চলিয়াও গেল। যাওয়ার বাতিক আমার মাথায়ও চাপিয়াছিল, কুচ-বিহার যাওয়ার গোঁও ধরিয়াছিলাম, অভিভাবকেরা নিম রাজীও হইয়াছিলেন কিন্তু শেষে সব ফসকিয়ে গেল আচম্বিতে দাদার চাঁদপুর আসাতে। দাদা পড়ায় চিরদিনই ভাল ছিলেন, চেহারাও ছিল সুন্দর, প্রাণটাও ছিল সরস। তাহার আসার সাথে সাথে এক যাদু মন্ত্রে যেন সমস্ত স্কুলের চেহারাটা বদলে গেল। তিনি স্কুলের জন্য মনে প্রাণে খাটিতেন —সকলে বুঝিল মরাগাঙ্গে বান ডাকিয়াছে। দাদা শুধু

স্কুলে কয়ঘণ্টা পড়াইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন না—বাসায় ও ছেলেদের পড়াইতেন। রবিবারও বাসায় তাহার স্কুল চলিতো দুপুর দুটো থেকে সন্ধ্যা নাগাৎ। কোন কোন দিন রাত আটটা নয়টা পর্য্যন্ত বাজিতো। ইংরাজী, সংস্কৃত, ইতিহাস সকল বিষয়ই তিনি পড়াইতেন—সকল বিষয়ই যেন প্রাণ পাইতো তাহার সজীব প্রাণের স্পর্শে। কঠোর নিয়মে বাঁধা ব্যাকরণ পর্য্যন্ত তাহার হাতে পড়িয়া বাঁচিয়া উঠিতো। সেই পড়ানোর বন্যায় আমিও ভাসিয়া গেলাম। আর সব আকাঙ্ক্ষা ছাপাইয়া পড়াতে আরো ভালো হওয়ার আকাঙ্ক্ষাই সতেজে জাগিয়া উঠিলো। পেটের অসুখ আগেরই মতন চলিল বটে, কিন্তু কালীর সাধনা আস্তে আস্তে লোপ পাইল।

অনেক ছেলের সাথেই দাদার খুব ভাব হইলো। ভাল ছেলেদের প্রায় সকলেই তার কাছে আসিতো—তিনিও তাদের খোঁজ খবর লইতেন। সন্ধ্যার পর তাদের বাসায় গিয়া দেখিতেন—তারা ঠিক সময় মতো বাসায় ফিরিয়া পড়ায় মন দিয়াছে কি না। কুলচন্দ্রও দাদার কাছে আসিতে লাগিলো। কুলচন্দ্রের স্মৃতি আমার হৃদয় হইতে একেবারে মুছিয়া না গেলেও অনেকটা আবছা হইয়া আসিয়াছিল। সে দেখিতে সুন্দর বলিয়া দুষ্ট ছেলেরা তাহার নামে অনেক কুৎসা রটাইয়া ছিল। টেলিগ্রামের খামে আঁটা হাতে-লেখা অনেক কাহিনীও তাহার নামে বাহির হইয়াছিল। এসব আমার কানে গেলে এবং চোখে পড়িলেও এসবে বিশ্বাস আমার কখনো হয় নাই, কারণ তাহাকে কখনো আমি এতো ছোট ভাবিতাম না—চিরদিনই প্রেম ভক্তি এবং শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতাম।

সে দাদার কাছে আসিয়া আমাদের সম্বন্ধীয় সকল কথা বলিল। আরো বলিল আমার সাথে মিল না হইলে তাহার পক্ষে ভালরূপে লেখাপড়া করা অসম্ভব। সে ছিল আগে পড়াতে খুব ভালো, মাষ্টারদের আশাও ছিল তার উপর খুব। তাকে ভাল করার জন্য দাদাও তার পিছনে লাগিলেন। কাজেই দাদাকে এই সব কথা শুনিতে হইল। এর পর দাদা একদিন আমায় ডাকিয়া বলিলেন—কুলচন্দ্রের সাথে তুমি কথা না বল্লে একটি ভাল ছেলে নষ্ট হয়ে যায় যে। আমি বলিলাম—আমি অতি দুর্ব্বল, একবার এ-আবর্ত্তে পড়ে অনেক ঘুর-পাক খেয়েছি, ভয় হয় মেলামেশা করে শেষে আবার নাকানিচোবানি না খেয়ে মরি। দাদা বলিলেন—তখন ছিলে তুমি ছেলে মানুষ, এখন বড় হয়েছ, আর ভয় কি? আমিও তো এখন কাছে আছি। আমি বলিলাম—বয়স বেড়েছে বটে কিন্তু প্রাণটা আছে আগের মতোই কোমল। দাদার কথা সম্পূর্ণ এড়ানো অসম্ভব। তাই শেষে বলিলাম—আমি রাজী আছি, শুধু একদিনের জন্য ঘড়ি ধরে তার সাথে পাঁচ মিনিট কথা ক'তে। দাদা তাহাই মানিয়া লইলেন।

দাদার কথায় রাজী কুলচন্দ্র পরদিন বিকালে আমার সাথে দেখা করিতে আসিলো। দাদার ডাকে ঘড়ি হাতে লইয়া আমি তার কাছে গেলাম। কথা হইল মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য শুধু মামুলী গোছের, কোন প্রাণ ছিল না তাতে। তার অনেক মিনতি সত্ত্বেও পাঁচ মিনিট সম্বন্ধে একটু নড়চড় ঘটিলো না, নিজেকে করিলাম লোহার মতো শক্ত। তার অতি করুণ চাহনীতে

পরের দিনও পাঁচ মিনিটের জন্য দেখা করিতে রাজী হইয়া সেদিন বিদায় লইলাম। এমনি ভাবে আবার তার সাথে মিল হইলো। পাচ মিনিট ক্রমশঃ বাড়িয়া এক ঘণ্টায় দাঁড়াইল। এবারকার বন্ধুত্বে কোনরূপ আবিলতা, মনে অভিমানের পুতিগন্ধ না থাকায় তা চলিতেছে আজ-ও। মিলনের আবেগ শূণ্য, বিচ্ছেদের বেদনা বিহীন, স্বচ্ছ সরল এই সখ্যতা আশা করি জীবনের শেষ অবধি অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

মেজদার বিবাহ

১৮৯৯ সালে এন্ট্রান্স পাশ করিয়া এল্-এ পড়িতে মেজদা কুচবিহার যান। ১৯০১ সালে দাদার চাঁদপুরে আসার কিছু পর ঠাকুরমা খালি বাড়ীতে কাহারো সাথে পরামর্শ না করিয়া মেজদার বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করেন। মুন্সীগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত পাটাভোগ গ্রামের কালীকুমার ঠাকুরের হরি পাওয়ার খ্যাতি আমাদের অঞ্চলের ব্যবসায়ী মহলে বহুদিন হইতে প্রচারিত বিচিত্ররূপে। কালীকুমার ঠাকুরের 'হরি' পাওয়ার অনেক আজগুবি কাহিনী আমরাও ছোট কাল থেকে ইহাদের মুখে শুনিয়াছি। ইহাদের ভক্তির দানে ফাঁপিয়া ওঠা সেই বংশের ধন দৌলতের কথাও আমাদের কানে কম পৌছে নাই। সেই বাড়ীর মেয়ের সাথে বিবাহের সম্বন্ধ আসিলে পর ঠাকুরমা নিজেকে ভালরূপে সামলাইতে পারিলেন না। বিশেষতঃ ঠাকুরমাকে ঘিরিয়া বসিয়া ঠাকুরের ভক্তগণ যখন হাত চোখ মুখের বিচিত্র ভঙ্গীর সাথে বলিল সোণা রূপা আম কাঁঠালে

এ-বাড়ী ভরিয়া যাইবে, তখন মেয়ে দেখার কথা ঠাকুরমার মনেও আসিল না—তিনি দশ টাকা বায়না লইয়া পাকা কথা দিলেন।

সুন্দর বধূ গৃহে আনার সখ বাবার প্রাণে চিরদিনই ছিল। দাদার বিয়েতে বাবার সে-সখ তো মিটেই নাই—বরং বউএর রূপ তার প্রাণে ব্যথার খোঁচাই মারিয়াছিল। বাবা বাড়ী আসিয়া যখন শুনিলেন মেজদার ভাবী বধূর রং ফর্সা তো নয়ই, বরং কালো, তখন তিনি রাগিয়া অগ্নিশর্ম্মা হইলেন। মাতা পুত্রে অনেক কথা কাটাকাটিও হইল। কিন্তু ঠাকুরমা বায়নার টাকা ফেরৎ দিতে কিছুতেই রাজী হইলেন না, বলিলেন—কথা দিয়েছি যে। এল, এ, পরীক্ষা দিয়া মেজদা বাড়ী আসিলে পর নবীন মুখুজ্যে ও দাদা পরামর্শ করিয়া তাহাকে লইয়া গেলেন চাঁদপুর—তাদের ইচ্ছা এ-বিয়ে কিছুতেই না হইতে দেওয়া। সকলের বারণ পায়ে ঠেলিয়া ঠাকুরমা একাই ষ্টীমারে চাঁদপুর রওনা হইলেন। তাহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে গোপাল তাহার কথা কিছুতেই না শুনিয়া পারিবে না। যাওয়ার আগে বলিয়া গেলেন—গোপাল রাজী না হইলে আমার সাথেই তিনি এ-মেয়ের বিয়ে দিবেন। তেজোদীপ্ত তাঁহার তখনকার চেহারা দেখাইতেছিল হোমশিখার মতো। নবীন মুখুজ্যে ও দাদা কাহারো সাধ্যে কুলাইল না তাহার মুখের সামনে একটি কথা বলার। ঠাকুরমা মেজদাকে হাতে ধরিয়া ফিরাইয়া আনিলেন যেমনি করে মা লইয়া আসে তার অবাধ্য শিশুসন্তানটীকে। দিশেহারা বাবা গেলেন কুলগুরুর সাথে পরামর্শ করিতে। অনেক পরামর্শের

পর ঠিক হইল এই কালো মেয়ের সাথে বিবাহ হইবে না কিছুতেই। বিয়ের তখন মাত্র একদিন বাকী—কন্যাপক্ষের লোকেরা টাকা পয়সা লইয়া আনাগোনা করিতে লাগিল। বাবা অতি স্পষ্ট শব্দে তাহাদের ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। আত্মীয় স্বজনে তখন আমাদের বাড়ী গম গম করিতেছিল। সব গোলমাল এক নিমেষে বন্ধ হইল। বিষাদের ছায়ার সাথে রজনীর ঘন অন্ধকার আমাদের বাড়ীর উপর নামিয়া আসিল। ভারী মনে আমরা সকলে শুইতে গেলাম।

ঠাকুরমা জেদী ছিলেন দ্রৌপদীরই মতো। সারা রাত তার চোখে ঘুম আসে নাই। জাগিয়া শুধু ভাবিতেছিলেন কি করা যায় এখন? কথা দিয়া না রাখিতে পারায় সঙ্কুচিত মুখ লইয়া কেমনে কাল প্রভাতের আলোয় সকলের সামনে তিনি বাহির হইবেন। বহুক্ষণ তিনি আপন মনে ভাবিলেন। নানা ভাব নানারূপে তার ঘোলাটে মনের মাঝে বিজলীর মতো খেলিয়া গেল। শেষে আঁধার-রাত-অন্তে-ওঠা প্রভাত তারার মতো তার মনে ঝলমলিয়া উঠিল একটি দৃঢ় সঙ্কল্প। এই লজ্জার ছায়ায় তার চিরদিনের গৌরব-উজ্জ্বল মুখ আচ্ছন্ন হওয়ার আগেই তিনি গলায় কলসী বাঁধিয়া ডুবিয়া মরিবেন আমাদের সেই আধ শুক্‌নো পচা ডোবায়। কি সব কথা তখন তার মনে খেলিতে-ছিল ঠিক করিয়া বলা শক্ত কারণ সে-সব কথা মুখ খুলিয়া তিনি কখনো কাহাকেও বলেন নাই। গরব করার অভ্যাস তার কোন দিন ছিল না। যাহা ভাল মনে করিতেন শেষ পর্য্যন্ত তাহা করিয়া যাওয়াই ছিল তাহার দস্তুর।

তবে আমার বিশ্বাস তার এই অপমানে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সমস্ত নারীজাতির লজ্জা ও পরাভবের ছবি তার মনে ভাসিয়া উঠিয়াছিল। তাই সমস্ত নারীজাতির মুখ রাখার জন্য তিনি হাসিমুখে আপন প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে চাহিয়াছিলেন। সারাদিন কোনকথা তাহার মুখ হইতে বাহির হয় নাই, কোনো মলিন রেখায়ও তাহা আচ্ছন্ন হয় নাই—এইরূপ একটা সম্ভাবনার অস্ফুট ইঙ্গিত ও শুইতে যাওয়ার আগে আমাদের কারো মনে খেলে নাই। কলসী গলায় বাঁধিয়া তিনি জলে নামিয়াছেন, এমনি সময় আমাদের এক পুরাতন বন্ধু আকস্মিক ঘাটে গিয়া ঠাকুরমার এ-কাণ্ড দেখা মাত্র চীৎকার করিয়া উঠে এবং বিদ্যুৎ-বেগে জলে নামিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরে। ইহার পর অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তি সুরু হয়। ঠাকুরমা উপরে উঠিতে নারাজ, বলিলেন এ-মুখ নিয়ে তিনি আর বেঁচে থাকতে পারবেন না। বন্ধুর ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকিতে আমরা সকলে ঘাট-পাড়ে ভাঙ্গিয়া পড়িলাম। বাবা তাড়াতাড়ি জলে নামিয়া—মা, তোমার কথাই থাকবে,—বলিয়া তাহাকে তুলিয়া আনিলেন। বিয়ে হওয়াই ঠিক হইল। রাত ভোর হওয়ার আগেই কন্যা পক্ষের আবার ডাক পড়িল। ফরসা হওয়ার সাথে জলে-ভাসা-চোখে আমরা বরযাত্র যাওয়ার যোগাড়-যন্ত্র সুরু করিলাম—ষ্টীমার যে ছাড়ে সকাল আটটায়। মেজদার বৌকে দেখিয়া তখন সত্যিই ভারী দুঃখ হইয়াছিল। কিন্তু এখন ভাবিতেও আনন্দ হয় ঠাকুরমার মতো একজন মহিয়সী মহিলা কিছুদিন আগে আমাদের বংশে আসিয়াছিলেন। সংসারে কিছুই চিরদিন টিকে না।

প্রভাতের কুয়াসার মতো দেখিতে দেখিতে সবই বিলীন হইয়া যায়। শুধু বাঁচিয়া থাকে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও জাতির মহত্ত্ব। সে-মহত্ত্ব খোয়ানর মতো—বড়কে ছাড়িয়া ছোট ও সংকীর্ণতাকে আঁকড়ে ধরার মতো—সর্ব্বনেশে আর কিছুই নাই। ভাবী যুগের জাতির প্রাণের খোরাকই বর্ত্তমানে বেঁচে-থাকাদের চরিত্রের এই উদারতা।

দাদার ওকালতী

এর পরের দু-বছর আমার জীবনে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। ১৯০৩ সালে গ্রীষ্মের ছুটীর পর চাঁদপুরে দাদার ওকালতী আরম্ভই এর পরের বড় ঘটনা। দাদার চাঁদপুরে মাষ্টারী আরম্ভ করার পর হইতেই আমাদের পরিবারের অন্ন বস্ত্রের অনটন অনেকটা ঘুচিয়াছিল। দাদা থাকিতেন বোনদির বাসাতে—খাই-খরচ বাবত তার লাগিতো না কিছুই। মাইনের পঁয়ত্রিশ টাকার প্রায় সবই বাড়ী পাঠাইতেন। আমাদের পরিবার তখন ছিল ছোট, অভাব বোধ ছিল অতি কম—বিলাসীতাও ছিল না মোটেই। তাই এই পঁয়ত্রিশ টাকাতেই বেশ চলিয়া যাইতো। ইতিমধ্যে বাবার চাকুরীতেও উন্নতি ঘটিয়াছিল। কুচবিহার ছাড়িয়া তিনি আর এক জমিদারের অধীনে চাকুরী লইয়া যান মালদহ। সেখানে মাহিনা পাইতেন কুড়ি টাকা, উপরি পাওনাও ছিল দুপয়সা মন্দ নয়। কিন্তু হইলে কি হয়—গরীবের ঘরে জন্মিলেও তার মেজাজটা ছিল বরাবরই অনেকটা রাজরাজড়াদের মতো।

গরীবের মতো থাকিতে তার চিরকালই কষ্ট হইতো, মনে মনে হয়তো একটু লজ্জাও অনুভব করিতেন কিন্তু অন্য উপায় ছিল না যে। বাড়ীর চাপ দাদার ঘাড়ে পড়ার পর হইতেই তার থাকার ষ্টাইল উঁচুতে উঠিয়া গেল অনেকখানি। প্রচুর পরিমাণ ঘী ও রোজ তিন চার সের দুধের কম তার চলিতো না কিছুতেই। এর উপর একটি চাকরও ছিল বোধ হয়। বাবার টান্ পরিবারের লোকদের জন্য চিরদিনই খুব কম ছিল—এখনও সে ধারা বহাল রহিলো।

চাঁদপুর আসার একবছর পর দাদা ওকালতী পাশ করিলেন। ওকালতী ব্যবসা আরম্ভ সম্বন্ধে ইহার পর আলোচনাও চলিতে লাগিলো। মাষ্টারী ছাড়ার কথা ওঠাতেই দাদার প্রাণ আঁতকে উঠিল—ধরা-বাঁধা মাসিক পঁয়ত্রিশ টাকা ছাড়িয়া ওকালতীর অনিশ্চিত আয়ের উপর দাঁড়াইলে সংসার চলিবে কিরূপে। জিলা কোর্টে প্র্যাক্‌টিস করার কথাই প্রথম ঠিক হইয়াছিল, কিন্তু শেষ নাগাত দাদার সাহসে অতোটা কুলাইল না। চাঁদপুরে অন্ততঃ আলেদা বাসা করিতে হইবে না, ওকালতীতে যা কিছু পাইবেন সবই বাড়ী পাঠানো যাইবে, ওকালতীর প্রারম্ভে এটা কম সাহায্য নয়—এই সব ভাবিয়া শেষে চাঁদপুরেই ওকালতী আরম্ভ করিলেন।

তার প্র্যাকটিস্ হু-হু করিয়া বাড়িয়া চলিল। তিনি যে খুব বড় উকীল হইবেন, এ-বিশ্বাস তার ছাত্রদের ছিল চিরদিনই। তার সুন্দর চেহারা, স্পষ্ট তেজালো কণ্ঠস্বর ও পরিষ্কার বুদ্ধির পরিচয় তার প্রত্যেক ছাত্রই প্রচুর পরিমাণে পাইয়াছিল বলিয়া

তাহাদের মনে এই বিশ্বাস সজোরে গাঁথা ছিল। হাই কোর্টে বসিলেও তার প্র্যাকটিস্ খুব জাঁকাইয়া উঠিতো। দাদার অশেষ গুণের মধ্যে প্রধান দোষ ছিল সাহসের অভাব। বুকের পাটার জোরের অভাবে তাহাকে শেষ অবধি চাঁদপুরেই ওকালতী করিতে হইয়াছে। তাঁর চাঁদপুরের প্র্যাকটিসের জমকাল অবস্থায় আমরাও তাঁহাকে অনেকবার কুমিল্লায় যাইতে বলিয়াছি। কুমিল্লা গেলে তাঁর প্র্যাকটিস যে অন্ততঃ দ্বিগুণ হইতো একথা তিনিও স্বীকার করিতেন। কিন্তু সাহসের অভাবে প্রায় আধমরা অবস্থায়ই তাঁহার জীবনের দিনগুলি কাটিয়া গেল।

স্কুল ছাড়ার সাথে সাথেই তার সংস্পর্শে চাঁদপুর স্কুলের প্রাণে যে-নূতন ধারা বহিয়াছিল উৎস-বন্ধ নদীর মতো তাহা শুকাইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে সেই মৃতপ্রায় পুরাণো চেহারা আবার ফিরিয়া আসিল। আমি কোন দিনই পড়ায় খুব ভাল ছিলাম না। চাঁদপুর স্কুলে অনেকবার প্রথম হইয়াছি বটে, কিন্তু চাঁদপুর স্কুলের ষ্ট্যাণ্ডার্ড খুব উঁচু নয়। তারপর দাদার ঘসা মাজায় যেটুকু উজ্জল হইয়াছিল, মনোযোগের অভাবে তাতেও আবার মরচে ধরিল। পড়ায় আবার ফাঁকিবাজি আরম্ভ হইল। শুধু পড়ায়ই নয়—চরিত্রেও এ-সময় বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। এভাবে কাটিল প্রায় দু-বছর। তার পরের ঘটনাতে বাংলা ও ভারতের ইতিহাসে নূতন রূপ ধরার সূত্রপাত হইলো। সেকথাই এখন বলিব।

বঙ্গভঙ্গ

সাতকোটী লোকের বাস তখনকার বাঙ্গলা এক হইলে ভারত ময় একটা প্রলয় সৃষ্টি করিতে পারে এ-ধারণা মাথায় ঢোকায় বড় লাট লর্ড কার্জ্জন বাংলাকে তিন ভাগে বিভক্ত করার সঙ্কল্প করিলেন। পশ্চিমের ভাগ যাইবে বিহারের সাথে। উত্তর ও পূবের ভাগ আসামের সাথে জুড়িয়া দিয়া করা হইবে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম নামে একটী নূতন প্রদেশ। আর মাঝের বাকিটুকু থাকিবে বাংলা নামে পরিচিত। একশ বছর যাবৎ বাংলার বুকে অবিরাম ধারে নূতন ভাব তরঙ্গ খেলার ফলে বাংলা যে শীঘ্রই সতেজে মাথা উচাইয়া উঠিবে, বাংলার ভাবধারা যে একদিন কোটালের বন্যার মতো গর্জ্জিয়া উঠিবে আর সেই গর্জ্জন নিনাদে যে সারা ভারতের কান খাড়া ও প্রাণ সজাগ হইবে লর্ড কার্জ্জনের মতো বিচক্ষণ রাষ্ট্র নেতার তাহা বুঝিতে খুব বেশী বেগ পাইতে হইল না। তাই এই আসন্ন বিপদের হাত হইতে বৃটিশ-সাম্রাজ্যের রক্ষার জন্যই বঙ্গ ভঙ্গের এই ব্যবস্থা করা হইল। কিন্তু সুরেন ব্যানার্জ্জি ও আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি তখনকার নেতারা লর্ড কার্জ্জনের এই অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া সভা সমিতি ও সংবাদ পত্রের সাহায্যে তুমুল অন্দোলনের সৃষ্টি করিলেন। দেশের প্রকৃত মনোভাব জানার ছলে লর্ড কার্জ্জন বাহির হইলেন পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণে।

চাটগাঁ

তাঁহার চাটগাঁ হইতে ঢাকা যাওয়ার পথে পড়িল চাঁদপুর। আমরা সকলে—Save us from Assam, Pray no

partition—প্রভৃতি লেখা নিশান ও ফেষ্টুন সহ দাঁড়াইলাম ভলানটীয়াররূপে রেল পথের দুপাশে। আমার বেশ মনে আছে, রাস্তার দুধারে ও ষ্টেশনে লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছিল। কেন তাহারা আসিয়াছিল—প্রতিবাদ জানাইতে না লর্ড কার্জ্জনকে দেখিতে—ঠিক বলিতে পারি না কিন্তু আমার প্রাণ যে এক নূতন ভাবে জাগিয়াছিল সে-কথা আজও শপথ করিয়া বলিতে পারি। এই জাগরণের গোড়ার তত্ত্ব বোঝা কঠিন। ইংরাজকে তাড়াইয়া ভারত স্বাধীন করিতে হইবে এভাব তখনও আমাদের প্রাণে জাগে নাই। বঙ্গভঙ্গ হইলে বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশ হইবে এই দুঃখই তখন বাজিয়াছিল আমাদের সবাকার প্রাণে। আরো একটী কথা। আমাদের নিজেদেরও যে একটী শক্তি আছে, চেষ্টা করিলে নিজেদের পায় দাঁড়াইয়া যে আমরা অনেক কিছু করিতে পারি—এ-ভাবও তখন আমাদের ছিল না। তাই আমাদের নিশানের ভাষায় ছিল শুধু কাকুতি মিনতি—তাই লর্ড কার্জ্জনের গাড়ী ষ্টেশনে পৌছা মাত্র আমরা ছুটিয়া গিয়া দাঁড়াইলাম তাহার ষ্টীমারের তিন দিক বেড়িয়া—ক্ষুধিত ভিক্ষুকের মতো দাঁড়াইয়া রহিলাম নদীর পাড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার মুখ খানা একবার দেখার জন্য যে আমাদের বিভক্ত করিয়া চিরতরে হীন ও দুর্ব্বল করিতে চায়। ভাবিতেও লজ্জা হয় কিন্তু করিয়াছিলাম তখন তাহাই। আমি একলা নয়, সারা সহরের লোক, নেতারা শুদ্ধ।

এই ঘটনা ঘটে ১৯০৪-এর প্রথম ভাগে। এর কিছু পরে মার্চ্চ মাসে আমি এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিতে ঢাকা যাই। ঢাকা

পৌঁছিয়া দেখি পথের মাঝে মাঝে বড় বড় কাগজের তোরণ, তোরণের দুপাশে লর্ড কার্জ্জন ও ঢাকার নবাবের চেহারা আঁকা। রাস্তার দুপাশের বাড়ী সমূহের গায়ে লটকানো লাল কাপড়ে সাদা অক্ষরে বড় লাটকে অভ্যর্থনা জানাইয়া কতো কিছু লেখা। Save us from Assam, Pray no partition প্রভৃতির চিহ্ন কোথাও নাই। আমার বুকটা কেমন করিয়া উঠিল। আসক জমাদারের গলিতে এক মেসে গিয়া উঠিলাম। সেখানে পৌঁছিয়াই দেখি মেসের ছেলেরা জটলা পাকাইয়া লর্ড কার্জ্জনের মৈমনসিংহে দেওয়া বক্তৃতা একখানা দৈনিক ইংরাজী কাগজ হইতে পড়িয়া সমালোচনা করিতেছে। কাগজ খানা বোধ হয় Bengalee হইবে কারণ সে-সময় জাতীয় কাগজ সমূহের মধ্যে এখানাই ছিল সব চেয়ে বেশী নামজাদা। তাদের কথা হইতে বুঝিলাম বড় লাটের ঢাকা আগমন উপলক্ষে নবাবের প্রায় এক লাখ টাকা খরচ হইয়াছে। যে লাট আমাদের বুকে এরূপ শেল হানিতে পারে, তার অভ্যর্থনার জন্য দেশের লোক যে এতো টাকা খরচ করিতে পারে এরূপ কল্পনা করাও তখন আমার পক্ষে কঠিন ছিল—কারণ দাসত্ব নামে যে একটা দৈত্য আছে, যার চরণ তলে মানুষ মনুষ্যত্ব বিনা সঙ্কোচে বিসর্জ্জন দিতে পারে, একথা আমার মতো সরল হৃদয় বালক তখন বুঝিবে কিরূপে?

মৈমনসিংহের মহারাজের যে-বাগান বাড়ীতে বড় লাটের থাকার বন্দোবস্ত হইয়াছিল, তার চারিদিকে রক্ষা কর আসাম থেকে প্রভৃতি বাণী নাকি এতো অধিক সংখ্যায় আঁটা ছিল যে

পত্রিকার সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেনের সভাপতিত্বে এক বিরাট সভা হয়। এই সভায় জনমত অগ্রাহ্য করিয়া ইংরেজ এরূপ কাজ করার প্রতিবাদ স্বরূপ বিলাতী জিনিষ বর্জ্জনের প্রস্তাব গৃহীত হইলো। কুল ভাঙ্গা বন্যার মতো এই বর্জ্জন আন্দোলন সারা দেশময় ছড়াইয়া পড়িলো। আমি তখন কুচবিহার কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি। ৭ই আগষ্ট প্রাতে হুকুম হইলো বিকাল তিনটায় খেলার মাঠে সকল ছেলেকেই মিলিতে হইবে। বিকালে মাঠে গিয়া দেখি, ইস্কুল কলেজের সকল ছেলেই সেখানে উপস্থিত, কেউ বাকী নাই, কোন্ এক বাঁশীর সুর না জানি তাদের সকলের প্রাণ ধরিয়া টানিয়া সেখানে জড় করিয়াছে। সকলের মুখেই আনন্দ উৎসবের চিহ্ন, যেমনটি এর আগে আমি কখনো দেখি নাই। ইহাদের দেখিয়া মনে হইলো, ইহারা যে শুধু বাঁশি শুনিয়াছে এমন নয়, এক অমৃত ধারার বর্ষণে যেন ইহাদের মনপ্রাণ প্রথম বর্ষার শ্যামল বনের মতো সজীব হইয়াছে। তারপর সেখান হইতে আমরা ড্রিল মাষ্টার কালীমোহন দত্তের নেতৃত্বে, বন্দেমাতরম্ ধ্বনী করিতে করিতে, "চল্‌রে চল্‌রে চল্‌রে আজ জীবন আহবে চল" গানটি গাইতে গাইতে মিছিল করিয়া সহরের সকল রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইলাম। রাস্তার দুপাশে সমবেত পুরুষ ও মেয়েদের মুখে অপূর্ব্ব তেজের চিহ্ন দেখিয়া আমার হৃদয় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলো। মিছিলের পর সভা করিয়া আমরা সেদিনের মতো বিদায় লইলাম।

তারপর থেকে সাত দিন আমাদের খালি পায় কলেজে যাইতে হইলো। বাঙ্গালীদের মধ্যে কোন আপত্তি উঠিলো না

কিন্তু কলেজের কয়েকজন আসামী ছাত্রেরা আপত্তি করিলো। ফলে তাহাদের উপর কিছু জুলুমও চলিলো। আমার মুরলী বাঁশের মত কচি ও সরল চিত্তে বড় ব্যাথা বাজিলো। বন্ধুদের বলিলাম ইহা লইয়া কোন জবরদস্তী না করাই ভাল। কিন্তু কে শোনে তখন আমার কথা—সকলের প্রাণই যে গরম। পঁচিশ বৎসর পরে এখন বুঝিয়াছি, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে জুলুমের স্থান কিছু কিছু আছে বটে, কিন্তু যখন তখন যেখানে সেখানে অনুষ্ঠিত অত্যাচারের ফল খুবই খারাপ। দেশের মন না বদলাইলে স্বাধীনতা লাভ অসম্ভব। জবরদস্তি কাজ করে তীরের খোঁচার মত—কোমল প্রাণ শুকাইয়া শীর্ণ হয়, নূতন ভাব তো ঢোকেই না, পুরাণো যা ছিল তার গায়েও বিরক্তির আঁচড় পড়ে।

দেখিতে দেখিতে পূজার ছুটী ঘনাইয়া আসিল। এ-বছর এল, এ পরীক্ষা। তাই আগে ভাবিয়াছিলাম পূজার ছুটীতে বাড়ী যাইব না। কিন্তু এখন যে প্রাণে উন্মাদনার সুরু হইলো, বাইরে আর মন টেকে না, ছুটিয়া যাইতে ইচ্ছা হয় দেশে, দেখিতে সেখানে কে কি করিতেছে। বাড়ী গিয়া দেখি সকল সহরের ছেলেরাই আগুন হইয়া দেশে ফিরিয়াছে। চাঁদপুরের দাদাও আমাদের সাথে লাগিয়া গেলেন। আমাদের সকলের নেতা হইলেন হরিপ্রসাদ বাবু। তখন তার বয়স সত্তরের কাছাকাছি। তার শুভ্র চুল ও গোঁপ দাড়ির মাঝে পদ্মের মতো সাদা মুখখানি দেখিয়া সাত্ত্বিকতার ভাব সকলের মনে আপনা-আপনি জাগিয়া উঠিতো। তখন আমাদের কাজ ছিলো দুটি। প্রথম—গ্রামের

কাপড়ের দোকানসমূহে বসিয়া লোকদের দেশী মিলের কাপড় কিনিতে বলা। দ্বিতীয়—গ্রামে গ্রামে মিছিল ও মিটিং করা। হরিপ্রসাদ বাবু আমায় খুব ভালবাসিতেন, বলিতেন—তোমার উপরই কিন্তু আমার ভরসা সবচেয়ে বেশী। ফলে অনেক কাজেরই ভার পড়িতো আমার উপর।

বড়দের মধ্যে সকল কাজেই খুব বেশী উৎসাহ ছিল দাদার। আর এ-সব কাজে তার ক্ষমতাও ছিল অনন্যসাধারণ। তার সুন্দর চেহারা লইয়া উদাত্তকণ্ঠে প্রাণখোলা ভাষায় যখন তিনি বিদেশী ব্যবহারের কুফলের কথা সকলের সামনে সতেজে ব্যক্ত করিতেন—তখন পাষাণ হৃদয় গলিয়াও চোখ দিয়া দু'চার ফোঁটা জল পড়িতো। কোন সুযোগই আমরা ছাড়িতাম না। যাত্রা ও কবি গানের আসর, বাজার ও হাট সকল স্থানেই আমাদের গান ও বক্তৃতা চলিতো। জনসাধারণের উৎসাহের সুরও উঠিল পঞ্চমে।

রাখী বন্ধন।

এমনি উত্তেজনার মাঝে বাংলার ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয় দিন ১৬ই অক্টোবর, ৩০শে আশ্বিন, আসিয়া হাজির হইলো। এই দিন হইতেই বাংলা দুই ভাগে বিভক্ত হইলো। কলিকাতা হইতে হুকুম আসিলো ঐ দিন রাখী উৎসব সম্পন্ন হইবে—ভোরে নদীতে স্নান করিয়া পরস্পরের হাতে মিলন-ডোর বাঁধিয়া দিয়া এই সঙ্কল্প করিতে হইবে যে বিদেশী সরকারের শতো চেষ্টা-ও আমাদের ছিন্ন করিতে সমর্থ হইবে না। আমাদের মিলন—দেবতার তূণের

মতো অক্ষয়, হোমশিখার মতো পবিত্র। সেদিন কারো বাড়ীতে উনুন জ্বলিবে না। দিনের বেলা সুস্থ ও সবল সকলকে উপোষ থাকিতে হইবে। শোকের চিহ্ন স্বরূপ কেউ সে-দিন কোন কাজ কারবার করিবে না। হাট বাজার দোকান পাট সব বন্ধ থাকিবে। বিকালে গ্রামে গ্রামে সভা-সমিতি করিয়া স্বদেশী গ্রহণের সঙ্কল্প সকলে মিলিয়া নূতন করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। আমাদের গ্রামের সকল কাজই ভালরূপে সম্পন্ন হইলো। শুধু দোকান বন্ধ লইয়া হালুইকর জগৎকুণ্ডুর সাথে সকালে একটু গোলমাল বাঁধিলো। সে নিজে ইচ্ছা করিয়া দোকান বন্ধ না করায় আমরা জোর করিয়াই তাহার দোকান বন্ধ করিয়া দিলাম। সে বাধা দেওয়ায় জবরদস্তীর ফলে তার জিনিষ পত্রের সামান্য কিছু লোকসান হইয়াছিলো। সে রাগিয়া ক্ষতি পূরণের নালিশ করার ভয় দেখাইলো। বুড়োদের উপদেশে পঁয়ত্রিশ টাকা খেসারৎ দিয়া তার সাথে রফা করা হইলো। যতোটা মনে পড়ে এর প্রায় সব টাকাটা দাদাকে নিজ পকেট হইতেই দিতে হইয়াছিলো।

ঐ দিন কলিকাতায় বেশ একটু হুলুস্থুল পড়িলো। এবং তাহার বিরবণ কাগজে পড়িয়া আমাদের প্রাণে আষাঢ়ের নীল মেঘের মতো নূতন আশার সঞ্চার হইলো বলিয়া সেই ঘটনার উল্লেখও সংক্ষেপে এখানে করা দরকার। এই আন্দোলনের নেতা সুরেন ব্যানার্জির পরামর্শ অনুসারে এই দিনের স্মৃতি স্বরূপ ফেডারেশন হল্ নামে একটি স্মৃতি সৌধ তৈরী করা ঠিক হইলো। আনন্দ মোহন বসুর সভাপতিত্বে কলিকাতায় সে-দিন যে-সভা হয়

তাহাতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক সমবেত হইয়াছিলো। বিলাতী বর্জ্জন ও স্বদেশীর প্রস্তাব গ্রহণের পর বয়ন শিল্পের উন্নতির জন্য একটি জাতীয় ধনভাণ্ডার স্থাপনের সঙ্কল্পও এই সভায় গৃহীত হয়। সে-দিন সভা-শেষে কলিকাতার রাস্তায় মিছিল করিয়া সুরেন বাবু প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ এই উদ্দেশ্যে সত্তর হাজার টাকা তুলিয়াছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় একা মহাত্মাজী বড় বড় লোকদের কাছ থেকে এক-একদিন লক্ষ লক্ষ টাকা তুলিয়াছেন বটে, কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের যুগে কলিকাতার মধ্যবিত্তদের দেওয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান কুড়াইয়া একদিনে সত্তর হাজার টাকা একত্র করা তাজ্জবের ব্যাপারই বটে। এই সংবাদ পড়িয়া সকলেরই তাক লাগিলো। মনে হইলো এবার বড়রকমের একটা কিছু না ঘটিয়া যায় না।

এণ্টি সার্কুলার সোসাইটী

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের তখন ছোট-লাট ছিলেন সার ব্যামফ্ল্যাইড ফুলার। তার প্রধান আড্ডা ছিলো ঢাকা নগরে। এই আন্দোলনের বনের আগুণের মতো দ্রুত প্রসার দেখিয়া তাহার মাথা গরম হইলো। তিনি ইহাকে দাবানোর জন্য নিত্য নূতন সার্কুলার জারী করিতে লাগিলেন। সকলের আগে রাস্তা ঘাট সভা-সমিতিতে বন্দেমাতরম ধ্বনি করা নিষিদ্ধ হইলো। তারপর এই মর্ম্মে এক সার্কুলার বাহির হইলো যে যে-সব স্কুল-কলেজের ছাত্রেরা স্বদেশী সভা-সমিতিতে যোগ দিবে তাহাদের সরকারী সাহায্য বন্ধ হইবে। সেই সব বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ ছেলেরা

সরকারী বৃত্তিতো পাইবেই না—এমন কি তাহাদের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর কোন সংস্রবও না থাকিতে পারে। এই সব অত্যাচার হইতে ছাত্রদের রক্ষার জন্য এন্‌টিসার্কুলার সোসাইটীর প্রতিষ্ঠা হইলো। এই সোসাইটীর সভাপতি হইলেন কৃষ্ণকুমার মিত্র, সম্পাদক শচীন্দ্র প্রসাদ বসু। এই আন্দোলনের উত্তেজনার মাঝে পূজার ছুটিটা কাটিলো নিশা-শেষের স্বপ্নের মতো। হুঁশ হওয়ার পর তাড়াতাড়ি কুচবিহার গিয়া কাঁধ পাতিতে হইলো পরীক্ষার জোয়ালের নীচে। কুচবিহার করদ রাজ্য বলিয়া ভয়ে ত্রাসে সেখানকার রাজাকে দাসত্বের বোঝা বহিতে হইতো আমাদের চেয়ে অনেক বেশী। তাই সরকারের সার্কুলার বাহির হওয়ার পর সেখানকার সকল সভা-সমিতি বন্ধ হইয়া গেলো। আর এ-সব চালাইবেই বা কে—সকলেই যে রাজার গোলাম, ভয়ে জড়সড়। বিকালে সাগর দীঘির ঘাটে বসিয়া এ-সব লইয়া আমরা জল্পনা কল্পনা করিতাম বটে, রংপুর হইতে কখনো কখনো ছেলে আসিয়া আমাদের উৎসাহের নিবন্ত আগুণকে উস্কাইয়া তুলিতে চেষ্টাও করিতো কিন্তু আগুণের ভিতর তেজ না থাকিলে বাহিরের ফুঁয়ে তাহা নিভে বই জলে না। তাই শীতের মাঝামাঝি সেখানকার সমস্ত আন্দোলন একেবারে মরিয়া গেলো।

পড়াশুনা চলিতেছিলো ভালই। কিন্তু পরীক্ষার দুমাস আগে এক বন্ধুর ফিটের ব্যামো দেখিতে গিয়া মাথা ঘুরিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলাম। ইহার পর মাথা সর্ব্বক্ষণ গরম থাকিতো ফলে ডাক্তারের উপদেশে পড়াশুনা বন্ধ হইলো।

আমার মনটা একেবারে দমিয়া গেলো। মনে হইলো এ-দুবছরের এতো মেহনৎ একেবারে মাঠে মারা গেলো। পরীক্ষা দিবনা-ই ঠিক্ করিয়াছিলাম কিন্তু শেষে দাদার উপদেশে একরকম না পড়িয়াই পরীক্ষা গৃহে উপস্থিত হইতে হইলো। কোন দিনই পড়ায় খুব ভাল ছিলাম না, খেটে খুটে যা-কিছু করিতে হইতো, তা-ও বিফল হইলো অদৃষ্ট বাদী হওয়ায়।

পরীক্ষার পর বাড়ী যাওয়ার পথে দু-চারদিনের জন্য চাঁদপুর অপেক্ষা করিলাম। সেখানে দেখিলাম আন্দোলন পূরা দমে চলিতেছে। সেখানকার আন্দোলনের মূল নেতা হরদয়াল বাবু হইলেও কাজের বেশীর ভাগ চাপই পড়িয়াছিলো দাদার উপর। দাদাও এ-কাজে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। সে-সময় স্কুল কলেজ হইতে তাড়িত ছেলেদের জন্য অনেক জায়গায় জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিলো। চাঁদপুরেও তারা এরূপ একটি বিদ্যালয় স্থাপনা করিয়াছিলেন। দাদাই ছিলেন তার সম্পাদক। সন্ধ্যার পর প্রতিদিন তিনি বাক্স হাতে যাইতেন চাঁদা তোলার জন্য ষ্টেশনে—রেল ও ষ্টীমারের কেউ বাদ পড়িতো না, সকলের কাছ হইতেই তিনি যে প্রকারে হোক কিছু না কিছু আদায় করিতেন। এ-ভাবে অনেক টাকা উঠিলো। উকীলদের বৈঠক খানায় হাত বাক্সর পাশে ছোট একটি চাঁদার বাক্সও রাখা হইতো। তাহাতে মামলা করিতে আসা প্রত্যেককে জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে কিছু না কিছু ফেলিতে হইতো। একদিন একজন ভদ্রলোক হাসিতে হাসিতে দাদাকে বলিলেন—দেখুন, নলিনী বাবু, আপনাদের সকলকে কিন্তু পুলিস ধরিয়া লইয়া

যাইবে। দাদা অমনি হাসিয়া বলিলেন—আমাকে একাতো নিবে না, দেশের সকলকে নিলে আমারই বা যাইতে আপত্তি কি। দাদা কোনদিন খুববেশী সাহসী ছিলেন না কিন্তু এ-আন্দোলনে মরা গাঙেও বান ডাকিয়া ছিলো, ভীরুর প্রাণও সাহসে মাতিয়া উঠিয়াছিলো। এদের সাথে কয়েকদিন ঘোরা-ফেরার ফলে আমার ঠাণ্ডা প্রাণও তাতিয়া উঠিলো।

বিদ্রোহের সূচনা

এরপর গেলাম বাড়ী। দাদা ওকালতী আরম্ভ করার এক বৎসর পরেই বাবা চাকরী ছাড়িয়া বাড়ী আসিয়াছিলেন। বাবা ছিলেন গোড়া ব্রাহ্মণ। হিন্দুর সমস্ত সংস্কার ছি[illegible]াহার প্রাণে রন্ধ্রে রন্ধ্রে গাদা। আমাদের অবস্থা তখন আগে[illegible]র খাণিক ভাল হইয়াছে। ছিপছিপে, কালো চেহারা, বারো [illegible] বছর বয়সের, শ্রীহট্টের একটি ছেলে তখন আমাদের বাড়ী[illegible] চাকরের কাজ করিতো। নাম ছিলো তা'র পূর্ণ, আমরা সক[illegible] ডাকিতাম পূণা বলিয়া। একদিন দুপুরে আমি ও বাবা খাই[illegible] বসিয়াছি, এমনি সময় কোথা হইতে হাঁপাইতে হাঁপা[illegible] ছুটিয়া আসিয়া সে হঠাৎ এক পা দিয়া ফেলি[illegible]। চৌকাঠ ডিঙ্গাইয়া আমাদের খাওয়ার ঘরের মেঝেতে। বাবা দাঁত মুখ খিচাইয়া অতি কর্কশকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—পূণা, তুই খাওয়ার ঘরে ঢুকে আমার ভাত নষ্ট করলি যে। রাগে বাবার সাদাচুলের গোড়া অবধি লাল হইয়া উঠিলো। সেই লালমুখের পানে তাকাইয়া ও তাহার কথা শুনিয়া ভয়ে পূণার

প্রাণ উড়িয়া গেলো। তাহার কালো মুখখানা শুখাইয়া একেবারে হইলো আমার মতো ফ্যাকাসে। তড়িৎবেগে পা সরাইয়া লইয়া হাবার মতো সে দাঁড়াইয়া রহিলো। বাবার কথা শুনিয়া এবং ঐ ছেলেটির মলিন মুখ দেখিয়া ব্যাথায় আমার প্রাণ ফাটিয়া গেলো। বাবা খুব রাসভারী লোক ছিলেন, তার মুখ-পানে চাহিয়া কথা বলার সাহস খুব কমলোকেরই হইতো। কিন্তু সে-দিন আমার প্রাণের রুদ্ধ বেদনা উৎস-বেগে মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িলো। আমি বাবার মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়া ফেলিলাম—এ কি মানুষ নয়? বাবা আরো রাগিয়া বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন—তোদের কাছে এ-মানুষ হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে নয়। আর কোন কথা আমার মুখে ফুটিলো না বটে, কিন্তু প্রাণে একটা খটকা বাজিয়া রহিলো। বার বার মনে হইতে লাগিলো এমনি কতো ঘটনাই তো ঘটিতে দেখিয়াছি শৈশব অবধি আমাদের বাড়ীর আসে পাশে। যেই বেদনার মলিন ছায়ায় আজ ঢাকা পড়িলো আমার চোখের সামনে ঐ ছেলেটির মুখের সহজ সরল হাসিটুকু, সেই বেদনার মলিন ছায়া আরো কতোদিন দেখিয়াছি ঐ যে আমাদের বাহির বাড়ীর পূব দক্ষিণ কোনে লাঠি ভর দিয়া আসিয়া উপু হইয়া বসে মহিম নমঃ, তাহার মুখে। এতোদিন এ-সব দেখিয়াছি যেন অন্ধের মতো, কিন্তু আজ তার প্রত্যেকটি স্মৃতি সূচ হইয়া বিঁধিতে লাগিলো আমার প্রাণের প্রতি পরতে।

এর কিছুদিন পরেই বাড়ীতে আসিলেন আমাদের বেল-পুকুরের ঠাকুর-মশাই। ঠাকুরমা, বাবা, মা সকলেই ভূমিষ্ঠ

হইয়া প্রণাম করিয়া তার পায়ের ধূলা লইলেন। এর আগেও তাকে অনেকবার দেখিয়াছি এবং তাহাকে দেখামাত্র প্রতিবারই শ্রদ্ধায় আমার হৃদয়ের পুষ্প-পাত্র ভরিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আজ আমার মাথা তার পায়ের কাছে কিছুতেই নুইলো না। ঠাকুর-মার অনেক সাধ্য-সাধনা সত্ত্বেও মুহূর্ত্তমধ্যে আমার ভিতরে গড়িয়া ওঠা বিদ্রোহের লৌহ-দণ্ড যেন তাকে খাড়া ও অটল করিয়া রাখিলো। কোন কাজের জন্য বেশী পীড়াপীড়ি করার অভ্যাস না থাকায় তিনি সহজেই আমাকে রেহাই দিলেন। মুস্কিল বাঁধিলো আবার পাতের প্রসাদ খাওয়া লইয়া। মনে হইলো আমার মতো ইনি-ও একজন সাধারণ মানুষ, এর পাতের প্রসাদ ভক্তিভরে মাথায় ঠেকাইয়া শ্রদ্ধার সাথে খাইব কেন। তাই আমি সজোড়ে বলিয়া ফেলিলাম—এখন থেকে আমি কারো প্রসাদ খেতে পারবো না, এর তো নয়ই, ঠাকুরমার বাবারও নয়। ঠাকুরমার শক্ত প্রাণ এতে অনড় থাকিলেও মার নরম বুক ভয়ে কাঁপিয়া উঠিলো। কাঁদ-কাঁদ স্বরে তিনি বলিলেন—যতো সৃষ্টি ছাড়া কথা তোর মুখে, এ-সব কি বলতে আছেরে, না খেলে পাপ হবে যে। বিদ্রোহের আগুণ তখন ধক্ ধক্ করিয়া আমার প্রাণে জ্বলিয়া উঠিয়াছে, কে শোনে পাপ-পুণ্যের হিত-উপদেশ।

বরিশাল কনফারেন্স

এর পরই আসিলো বরিশালের প্রসিদ্ধ প্রাদেশিক সম্মিলনী। আমি এল, এ পরীক্ষা দিই ১৯০৬-এর মার্চ্চে। সম্মিলনীর

অধিবেশন হয় এপ্রিলের মাঝামাঝি। কুমিল্লার এ, রসুল ছিলেন সভাপতি। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের ছোটলাট সার ব্যাম ফ্লাইড্ ফুলারের রাস্তায় বন্দেমাতরম্ করার নিষেধ আজ্ঞা লইয়া বরিশাল কন্‌ফারেন্সের সময় হুলুস্থুল বাঁধিবে, এই আশঙ্কা কিছুদিন হইতে জমাট বাঁধিতে ছিলো সকলেরই প্রাণে। তাই বাংলার সকল জেলা হইতে প্রতিনিধিরা দল বাঁধিয়া সেখানে আসিয়া জড় হইলেন। বরিশালের তখনকার ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার ইমার্সনের সাথে কন্‌ফারেন্সের স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষদের এই রফা হইয়াছিলো যে প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনার সময় বন্দেমাতরম্ করা হইবে না। এ-সংবাদ শোনা মাত্র ষ্টীমারে আসা প্রতিনিধিগণ রাগিয়া আগুন হইলেন, বলিলেন—এই অপমানের বোঝা বয়ে আমরা কন্‌ফারেন্সে কিছুতেই যোগ দিব না। শেষে সুরেন ব্যানার্জ্জি ও ভূপেন বসুর মধ্যস্থতায় ঠিক হইলো যে কন্‌ফারেন্সের কর্ত্তৃপক্ষের সম্মান রাখার জন্য প্রতিনিধিরা অভ্যর্থনার সময় বন্দেমাতরম্ করিবেন না বটে, কিন্তু এরপর বন্দেমাতরম্ করার তাদের আর কোন বাধাই থাকিবে না।

ঠিক হইলো, রাজার হাবেলী হইতে প্রতিনিধিগণ মিছিল করিয়া রাস্তায় বন্দেমাতরম্ করিতে করিতে যাইবেন প্যাণ্ডেলে কন্‌ফারেন্সে যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে। মিছিল রওনা হইতে না হইতেই পুলিস সুপারিন্‌টেনডেণ্ট মিঃ কেম্প লাল পাগড়ীর দল লইয়া আসিয়া প্রতিনিধিদের লাঠিপেটা করিতে লাগিলেন। লাঠি-মারা আরম্ভ হওয়া মাত্রই বরিশালের মাঠ, ঘাট, বন, নদীর জল কাঁপাইয়া প্রতিনিধিদের বন্দেমাতরম ধ্বনি সুরু

হইলো। বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করিতে করিতে নির্ব্বিবাদে তাহারা মার খাইতে লাগিলো, প্রতিবাদ স্বরূপ হাত তুলিলো না কেউ। যতো মার খায় ততোই তারা বলে বন্দেমাতরম্, কোতোয়ালের চাবুক খাইতে খাইতে যবন হরিদাসের হরি বলার মতো। লাঠির পিটুনী খাইতে খাইতে চিত্তরঞ্জন ঠাকুরতা পড়িয়া গেলো পাশের একটা পুকুরের অঁঠাই জলে। জলে পড়িয়াও নিস্তার নাই, পুলিসের লাঠি চারিদিক হইতে পড়িতেই লাগিলো মুষল ধারে বৃষ্টির মতো। প্রতিবাদ করিতে আসিয়া সুরেন ব্যানার্জ্জি কেম্প সাহেবের হাতে গ্রেপ্তার হইলেন। তারপর তাঁকে ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলায় লইয়া যাওয়া হয়, কয়েদী বলিয়া সেখানে তাহাকে বসিতেও দেওয়া হয় না, চারিশত টাকা জরিমানা করিয়া বিদায় দেওয়া হয়। কন্‌ফারেন্স-শেষে সে-দিন প্রতিনিধিরা পথে প্রাণভরিয়া বন্দেমাতরম্ বলিতে বলিতে আপন আড্ডায় ফিরে। পরদিন কন্‌ফারেন্সের মাঝখানে কেম্প সাহেব আসিয়া সভাপতিকে বলিলেন—কন্‌ফারেন্সের পর স্ব স্ব ক্যাম্পে ফেরার পথে প্রতিনিধিরা বন্দেমাতরম্ করিবে না, এ গ্যারেন্টি না দিলে কন্‌ফারেন্স তখনি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। প্রতিনিধিদের মধ্যে মহা উত্তেজনার সৃষ্টি হইলো। তরুণের দল বলিলো—আমরা কোনো গ্যারান্টিও দেব না, কন্‌ফারেন্সও চালাব, যা হয় হবে। কিন্তু এতোটা আগানো সুরেন বাবুদের সাহসে কুলাইলো না। তাই তাহাদের বিশেষ অনুরোধে কন্‌ফারেন্স ভাঙ্গিয়া দিয়া সকলেই তখন প্যাণ্ডাল ছাড়িয়া চলিলো। কিন্তু বসিয়া রহিলেন শুধু তখনকার গোঁয়ার

গোবিন্দ কৃষ্ণকুমার মিত্র। তার সেদিনকার তেজ দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হইয়াছিলো। কিন্তু সেই কৃষ্ণকুমার বাবুর বর্ত্তমান অধঃপতনের কথা ভাবিলে দুঃখে বুক ফাটে, লজ্জায় মাথা নত হয়, নানাভাব-মেশানো একটা দীর্ঘশ্বাস হৃদয়ের তলদেশ মথিত করিয়া বাহির হইয়া যেন কোন্ দূর শূন্যে মিলিয়া যায়।

সুরেন বাবুরা কি ভাব লইয়া কলিকাতায় ফিরিলেন বলিতে পারি না কিন্তু তরুণ আমাদের মনে হইলো ইংরেজের আইন মানিয়া আর বেশী আগোনো সম্ভব হইবে না। ইংরেজ সাত সমুদ্র তেরনদী পার হইয়া এ-দেশে আসিয়াছে, আমাদের ভালবাসিয়া আমাদের মুক্তির জন্য নয়। তাহারা আসিয়াছে তাহাদের শূন্য থলি এখানে ভর্ত্তি করিয়া লইয়া, পরে তাহা উজার করিয়া ঢালিয়া দিতে তাদের বরফে-ঢাকা অনুর্ব্বর দেশে, যেন তাহা ধনে দৌলতে পূর্ণ হইতে পারে। যে-রক্ত ঝরিয়া পড়ায় আমাদের দেহ পাংশুটে হইতেছে, তাই তো তাদের দেশে শিরায় শিরায় বহিয়া তাহাদের সজীব করিয়া তুলিতেছে। তারা তো ত্যাগী সন্ন্যাসী নয়। তারা মহা ভোগী। আইনের নাগপাশে হাত পা কষিয়া-বাঁধা আমাদের বুকে পাষাণের মতো চাপিয়া বসিয়া চলিতেছে তাদের ভোগ সাধনা। সেই আইনের নাগ পাশ আমরা যতোই মানিব, তার পাশ ততোই শক্ত হইয়া বাটিয়া বসিবে আমাদের দেহের চারিদিকে। এ-কথা সুরেন বাবুরা বুঝিতেন না—আমি বলিতে চাই না; কিন্তু বুকের পাটার যে শক্ত খিচুনীতে সেই নাগ পাশ ছিন্ন হইতে পারিতো সেই খিচুনী দেবার আন্দাজ মনের তাগদ তখন

তাদের ছিলো না। তাই এর পর থেকে এরা ভারতের রাজনৈতিক শ্মশানে সাধক রুদ্র না হইয়া হইলেন ভূত মাত্র। এদের লম্ফঝম্ফ ভারত মাতার ললাটে মঙ্গলের শুভ্র তিলক না আঁকিয়া লেপিলো কলঙ্কের কালিমা।

দলী

এই উত্তেজনার গরম ঠাণ্ডা হইতে না হইতে একদিন আচমকা নজরে পড়িলো, আমাদের পাশের বাড়ীর একটি হৃদয় লতার নিভৃত পাতার নিরালা আড়ালে ফুটিয়া ওঠা প্রেম কলিটির লাল পাঁপড়ি গুলি আমারই পানে চাহিয়া মেলিতে শুরু করিয়াছে। তাদের বাড়ীর পাশ কাটিয়া যাইতে দেখিলাম, বার বছরর একটি সাদা ফুট্ ফুটে মেয়ে আমাকে দেখা মাত্র লাল মুখে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া পালাইতেছে। দেখিয়াই আমার প্রাণের ভিতরটায় কেমন যেন একটা আঁচড় মারিয়া উঠিলো। সাথে সাথে মনে যে-ভাবের উদয় হইলো, সে-ধরণের কতকটা ভাব আমার অনুভব হইয়াছিলো, কুলচন্দ্রের সাথে প্রথম সাক্ষাতের সময়। এর পর এক বিচিত্র টানে আমার প্রায়ই আনাগোনা চলিতো তাদের বাড়ীর পাশের পথে। আর তার বিদ্যুতের মতো চমকে পালানোর বেদনা-মধুর দৃশ্য দিনের পর দিন আমায় অধিক পাগল করিতে লাগিলো। তার একটি ছোট ভাই ছিলো, দেখিতে প্রায় তারই মতো। তাকে ডাকিয়া নিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলিতাম, আদর করিয়া যাহা পারিতাম খাওয়াইতাম। চৈত্র সংক্রান্তিতে আমাদের নিজেদের গ্রামে ও পাশের লোনসিং

গ্রামে প্রতি বৎসর মেলা বসিতো। লোনসিংয়ের মেলায় সেই ছেলেটিকে লইয়া গিয়া মুড়ি মুড়কী জিলাপী কিনিয়া তার কোচরে ভরিয়া তাদের বাড়ী পাঠাইয়া দিলাম। এ-সব খাওয়ায় তার প্রাণে যে-আনন্দ হইবে তার কল্পনায় আমার সারা শরীর পুলকে নাচিয়া উঠিলো। মনে হইতে লাগিলো যেন আমি নিজে তার পাশে বসিয়া এ-সব তাকে খাওয়াইতেছি, আর সে খাওয়ানোয় কতো আনন্দ। সে-আনন্দের কিরণ আমার উজ্জ্বল চোখের ভিতর দিয়া চারি দিকের গাছপালা আকাশে ছড়াইয়া পড়িয়া তাদের সকলের গায়ে নানা রঙ্ ফলাইয়া তুলিলো।

এর পরই আমার এল্-এ, পরীক্ষার ফল বাহির হইলো। ফল খুব ভাল না হইলেও কুচবিহার হইতে উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে প্রথম হওয়ায় মাসিক ২০৲ টাকার জলপানী আমার অদৃষ্টে জুটিলো। বি-এ তো পড়িবই কিন্তু কোন্ কোর্সে, তা লইয়া জটলা সুরু হইলো। অঙ্ক ও বিজ্ঞান আমার বেশী ভাল লাগিতো না বলিয়া এ-কোর্স পড়ার রোখই ছিল আমার বেশী। কিন্তু মেজদা উল্টা গোঁ ধরিয়া বলিলেন—তা হ'তে পারে না কিছুতেই, আমরা দু-ভাই এ-কোর্স পড়েছি, তোমায় বি-কোর্স নিতেই হবে, নইলে তোমার বি-এ পড়ার দরকারই নাই। অনেক রকমে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম তাঁকে, কিন্তু তার ঝোঁক কমিলো না কিছুতেই। শেষে আমাকেই তার জেদের কাছে মাথা নোওয়াইতে হইলো। ঠিক্ হইলো আমি বি-কোর্স লইয়া ইংরেজীতে অনার্স পড়িব।

সরস্বতী পূজা

থার্ড ইয়ারে পড়ার সময় কুচবিহার কলেজের সরস্বতী পূজার সম্পাদকের কাজ করাই আমার জীবনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। খুব ধুমধামের সহিত বহুদিন যাবৎ এ-পূজা সেখানে সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। রাজকোষ থেকে বাৎসরিক সাহায্যের বরাদ্দ-ও এজন্য আছে। আর রাজবাড়ী হইতে সকল প্রকার সাজসরঞ্জামের সুবিধা পাওয়া যাইতো বলিয়াই এতো জাঁকালো ভাবে এ-পূজাশেষ করা সম্ভব হইতো। কৃষ্ণনগরের কুমারদের গড়া পুতুল হইতো একটা দেখবার জিনিষ। এ-ছাড়া সভা সমিতি, বিভিন্ন রকমের প্রবন্ধ পাঠ, জাতীয় ধরণের কথকতা এবং দরিদ্র বিদায় ও থিয়েটার ছিলো এর আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান। পূজার আগের দিন সন্ধ্যার সময় দেওয়ান কালিকা দাস দত্ত বাহাদুরের বাড়ীতে গিয়া তাহাকে বলিলাম—আপনাকে কিন্তু কাল পূজা দেখতে যেতে হবে। তিনি বলিলেন—কখন পূজো? আমি বলিলাম—ঠিক সকাল আটটায়। তিনি হাসিয়া বলিলেন—আমরা কাজের লোক, আটটা বলে দশটা বাজাবে তোমরা, এমনি আমাদের জাতের ধরণ, আমার যাওয়া ঘটে উঠবে না। আমি প্রাণের সমস্ত জোড় দিয়া বলিয়া উঠিলাম—পূজা আটটার তোপের সাথেই আরম্ভ হবে, আপনাকে অবশ্যই যেতে হবে। তিনি রাজী হইলেন। উৎসব প্রাঙ্গণে ফিরিয়া দেখি, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, পূজার কোন জোগাড়ই নাই। কাল সকালে ঠিক আটটায় পূজা আরম্ভ করিতে হইলে, রাতের মাঝেই বেবাক আয়োজন শেষ করিয়া

রাখা চাই। অথচ কুচবিহারের শীতের মাঝে বসিয়া রাত্রে কেউ কাজ করিতে রাজী হইলো না। তখন আমি নিজেই পূজার বাসন পত্র কন্‌কনে ঠাণ্ডা জলে মাজিতে আরম্ভ করিলাম। আমার দেখাদেখি আরো দু-চারটি ছেলে আগাইয়া আসিলো। রাত বারটায় বাসন মাজা শেষ হইলো। ইহার পর প্রায় দু মাইল দূর হইতে কাঁধে করিয়া প্রতিমা আনার পালা পড়িলো। হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি করিয়া লোকজন জুটাইতে দু-টা বাজিলো। এরপর প্রতিমা যখন প্রাঙ্গনে পৌছিলো তখন পূব আকাশে অরুণ আভার সূচনা হইয়াছে। তারপর পুরুত ডাকিয়া আর সব কাজ সারিয়া ঠিক আটটার তোপের সাথে যখন পূজা আরম্ভ হইলো, দেওয়ানজী পিঠে হাত চাপড়াইয়া বলিলেন—এমনি ভাবে সারা জীবন কাজ করা চাই। দেওয়ানজীর তখনকার একথাটার মূল্য আমাদের কাছে ছিলো খুবই বেশী। কারণ তাকে আমরা দেখিতাম ঠিক রাজার নীচে। থিয়েটারের পার্ট, তাঁবু খাটানো, তাঁবু নামানো, ভলানটীয়ারদের খাওয়া দাওয়া শোয়া লইয়া ছোট খাট গোলমাল লাগিয়াই থাকিতো। কারণ, কোন কাজই আমাদের সহজে সম্পন্ন হয় না। গণ্ডগোলের পর গণ্ডগোল আসিয়া জোটেই জোটে। কাজ করার চেয়ে তর্ক ও ঝগড়া করার অভ্যাসই যেন আমাদের বেশী মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। তখন অনেক গণ্ডগোলের মাঝে ধৈর্য্য সহকারে কাজ করিতে পারায় আমার এই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, নিজে কোন গোলমাল না করিয়া, চুপে চাপে ধীর স্থির ভাবে কাজ করিলে, দুনিয়াতে হয় তো অনেক বড় কাজ করা সম্ভব।

ব্রজেন্দ্র শীল

সে-বার জ্যৈষ্ঠমাসের ছুটিতে আর বাড়ী আসা হইলো না। ইচ্ছা ছিলো কুচবিহার থাকিয়া পড়া শুনা করিব, কিন্তু দরবার, উৎসব, ম্যাচ খেলা, থিয়েটার ও যাত্রা দেখাতেই সারা বন্ধটা কাটিলো।

গ্রীষ্মের ছুটির পর কলেজে যাওয়া মাত্রই প্রিন্সিপ্যাল ব্রজেন্দ্র নাথ শীলের সাথে সাক্ষাৎ হইলো। গেলো বছর বিলাতে ছিলেন বলিয়া থার্ড ইয়ারে আমাদের পড়াইতে পারেন নাই। ইংরাজী গদ্য পড়ানোর ভার ছিল তার উপর। পদ্য পড়াইতেন কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান প্রোফেসর জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। বার্কের ফ্রেন্স রিভলিউসন্ পড়াইতে আরম্ভ করিয়াই শীল মহাশয় তার বড় বড় দাড়ি ও মোটা মোটা আঙ্গুল নাড়িয়া অতি গম্ভীরস্বরে বলিলেন—তোমাদের কেউ বি-এ পাশ করে কি না করে সে-জন্য আমার গ্রাহ্য অতি কম, বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি গ্রেজুয়েট তৈরীর ফ্যাকটরী এ-কলেজ নয়। বার্ক পড়ে তোমাদের মধ্যে কেউ যদি বিপিন পালের মতো হতে পারে তবেই আমার পড়ানো সার্থক হবে। তার পড়ানোর দস্তরই ছিলো এ-রূপ। শুধু পাশের জন্য পড়ানোকে তিনি ঘৃণা করিতেন। ছেলেদের মাঝে যাতে দেশ সেবার ভাব জাগে, জগতের বড় বড় পণ্ডিতদের মনের সাথে যাতে তাদের পরিচয় ঘটে, সেদিকেই তার চেষ্টা থাকিতো সর্ব্বক্ষণ। পড়াইতে পড়াইতে তিনি একেবারে তন্ময় হইয়া যাইতেন, ঘণ্টার পর

ঘণ্টা চলিয়া যাইতো তবু তার পড়ানো থামিতো না। অনেক দিন সন্ধ্যার আঁধারে ঘর ছাইয়া গেলে তাকে লিখিয়া জানাইতে হইতো, আঁধার হইয়াছে, আর দেখা যায় না, তবে তার হুঁশ হইতো।

পূজার বন্ধে সেবার বাড়ী গেলাম। কারণ একনাগাড়ে অনেকদিন কুচবিহার থাকায় পিঁজরার পাখীর মতো প্রাণটা ছট্‌-ফট্‌ করিতে লাগিলো। বাড়ী গিয়া সেই মেয়েটির সাথে আবার দেখা হইলো। সে এখন বড় হইয়া দেখিতে হইয়াছে ফোটা সাদা ফুলে মাথা ভরা রজনী গন্ধার ডাটাটির মতো। একদিন দুপুরে আমি আমাদের বৈঠকখানা ঘরে একলা বসিয়া আছি, দেখি সে সামনের পথে টিপিটিপি হাঁটিয়া মাথা নীচু করিয়া চলিয়াছে। তার মুখের কোণের হাসি রেখাটি ফুটিয়া উঠিয়াছিলো ঠিক একটি ছোট কুন্দের মতো। বার বার ইচ্ছা হইলো তাকে ডাকিয়া দুটো কথা বলি, তারও বোধ হয় অনিচ্ছা ছিল না কিন্তু লজ্জায় প্রাণ আড়ষ্ট হইয়া আসিলো। শুভ লগ্ন বহিয়া গেলো—ডাকি ডাকি করিয়াও ডাকা হইলো না। তারপর সে যখন পূব কোণের সাকোঁটির উপর দিয়া খাল পার হইতে লাগিলো, জানালা পথে আমি অপলক নয়নে সে-দিকে তাকাইয়া রহিলাম। শুধু দেখা গেলো তার খোলা চুলগুলি এলাইয়া পড়িয়াছে কালো পেড়ে শাড়ীর পিছনে দোলানো আঁচলের উপর।

সেদিন রাতেই তাদের বাড়ী আমার খাওয়ার নিমন্ত্রণ হইলো। খাওয়ার সময় তার মা নিরালা আমায় বলিলেন—আমার সাথে বিয়ে হলে সে খুব খুসী হবে। আমি অতি সহজ ভাবে

বলিলাম—আমার তো কোনো আপত্তি নাই, তবে বাবা ও দাদার মত ছাড়া হবে না। আমার আপত্তি নাই জানিয়া তিনি আশ্বস্ত হইলেন।

বঙ্কিমের প্রতাপ

কলেজে ভাল ছাত্র ছিলাম বলিয়া ব্রজেন্দ্র শীলের সাথে পরিচয় হইতে দেরী হইলো না। একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করিলাম বাইরের কি কি বই আমার পড়া উচিত। তিনি বলিলেন—প্রথম ইংরেজী বই পড়ে কোন লাভ হবে না। মাতৃ-ভাষায় লেখা সব ভাল বই পড়ে সময় থাকলে ইংরেজী বই পড়তে সুরু করো। বাংলা বইয়ের মধ্যে কোন্ বই আগে আরম্ভ করিবো জিজ্ঞাসা করায়, বঙ্কিমের বইগুলি আগে পড়িয়া ফেলিতে তিনি উপদেশ দিলেন। সে-দিনই বসুমতী আফিস থেকে সবে মাত্র প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর জন্য অর্ডার দিলাম।

বঙ্কিমচন্দ্রের সব বই-ই পড়িলাম বটে কিন্তু চন্দ্রশেখরের প্রতাপই যেন আমাকে নূতন প্রাণ দিলো। মনে হইলো এ-রূপ বীর ও ত্যাগী না হইতে পারিলে এ-সংসারে আসাই বৃথা। শৈবলিনীকে বুকের মাঝে পাইয়াও সে তার চরিত্রের পবিত্রতা নষ্ট হইতে দিলো না। যাহাকে সে জীবনের প্রথম হইতে ভালবাসিয়াছে, তার জন্য তার ইচ্ছা মাত্র জীবন বিসর্জ্জন দিলো। পিসীমার সে-আঁধার ঘরে শুইয়া শুইয়া এ-সব কথা ভাবিতাম আর আমার বুকখানা আনন্দে ও গরবে ফুলিয়া উঁচু হইয়া উঠিতো।

সুরাট কংগ্রেস (১৯০৭)

সে-বৎসর ডিসেম্বর মাসের শেষাশেষি একদিন হাতে একখানা অমৃতবাজার পত্রিকা লইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ক্লাশে ছুটিয়া আসিয়া ব্রজেন্দ্র শীল বলিলেন—এ-কাগজে এই মাত্র পড়লাম গোলমাল হ'য়ে সুরাট কংগ্রেস ভেঙ্গে গেছে। প্যাণ্ডেলে নেতাদের গায়ে জুতা পর্য্যন্ত ছোড়া হোয়েছে। তারপর তিনি বলিলেন—এতোদিন পর্য্যন্ত কংগ্রেস ছিলো কতোগুলো মড়াহাড্ডি, এবার সে মড়া হাড়েও প্রাণ দেখা দিয়েছে। তারপর সুরেন ব্যানার্জ্জি, অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতির দোষ গুণ বর্ণনা করিয়া তিলক সম্বন্ধে বলিলেন—কর্সিকায় জন্মালে তিনি হোতেন নেপোলিয়ান, আমেরিকায় জন্মালে ওয়াশিংটন কিন্তু হতভাগ্য ভারতবর্ষ, এখানে কারো কোন সুযোগ নাই। আরো অনেক কথার পর শেষে বলিলেন—প্রকৃত নেতা এখনো ভারতে জন্মায় নাই। প্রকৃত নেতার স্বরূপ বর্ণনা করিতে করিতে গুরু গোবিন্দ সিংহের উল্লেখ করিলেন। বলিলেন—তিনি রাস্তায় বেড়িয়ে ধর্ম্ম ও দেশের নামে লোকদের ডাকতেন, আর লক্ষ লক্ষ লোক তার পেছনে প্রাণ দিতে ছুটতো। এই কথার মানে সে-দিন ভালো করিয়া বুঝিতে পারি নাই। তিলকের নামে তখন সারা ভারতে জয় জয়কার। তিনিও প্রকৃত নেতা নন—এ-কথাটা বরদাস্ত করা সে সময় আমাদের পক্ষে একটু শক্তই ছিলো। তারপর মহাত্মা গান্ধীকে দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছি সেই মানীষীর দৃষ্টি ছিলো কতো দূর-প্রসারী।

গুরুদাস গুপ্ত

গুরুদাস গুপ্তের সাথে আমার প্রথম আলাপ হয় বি, এ, পরীক্ষার অল্প আগে। আমার ফোর্থ ইয়ারের প্রারম্ভে সে কলিকাতার কোন কলেজ হইতে গনিতে অনার্স সহ বি, এ, পাশ করিয়া জেন্‌কিন্‌স স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক রূপে কুচবিহারে আসে। এই ছোট-খাট কালো তরুণটির হাসি-মধুর মুখখানি দেখিতে আমার প্রথম থেকেই ভালো লাগিতো। কিন্তু তার ভিতরটা যে আরো মধুর তা হঠাৎ টের পাইলাম কুয়াসা ঘেরা এক শীতের সন্ধ্যায় তার সাথে বেড়াইতে বেড়াইতে। ধর্ম্ম লাভের জন্য একটা আত্যিকার আকাঙ্ক্ষা তার প্রাণে তখনই হোম-শিখার মতো দিন-রাত জ্বলিতো। তার সেই শিখার পবিত্র স্পর্শে আমার হৃদয়ের এতোদিনের ঘুমন্ত ধর্ম্মভাব আবার জাগিয়া উঠিলো। সেবা-ই ধর্ম্ম পথের শ্রেষ্ঠ সাধনা এ-কথা প্রথম শুনিলাম তারই মুখে। অন্ধকার মেঘে বিদ্যুৎ খেলার মতো আচমকা আমার মনে হইলো বি, এ, পাশ করিয়াই ডাক্তারী পড়িব, ডাক্তার হইলেই সেবার সুযোগ মিলিবে সব চেয়ে বেশী। সেবার পথ যে অনন্ত, রোগী সেবার চেয়ে ও যে আরো উচ্চ দেশ-সেবার পথ আছে, সে ধারণা তখন পর্য্যন্ত আমার মাথায় ঢুকে নাই। ডাক্তারী পড়ার কথা মনে হওয়ায় প্রাণ আনন্দে ভরিয়া গেলো। জোর জবরদস্তী করিয়া বি-কোর্সে-এ বি, এ, পড়িতে আমায় বাধ্য করায় মেজদার উপর ভক্তি ও শ্রদ্ধার প্রাণের পুষ্পপাত্রটি ভরিয়া উঠিলো। জীবনের অন্ধকার পথে যেন নূতন আলোর সন্ধান পাইলাম। প্রাণের মাঝে কে যেন বারবার বলিলো—

সুরেশ, এ-পথে চল্লে এ-জীবনে যা-কিছু শ্রেয় তোমায় মিলবার, সব মিলবে।

এ-চিন্তায় সে-রাত্রি কাটিলো। আরো একটা খটকা চিন্‌-চিনে ব্যাথার মতো প্রাণের মাঝে বার বার উঠিতে লাগিলো—সেই যে মেয়েটি একদিন জোড় করিয়া তোমার হৃদয় কোণে স্থান করিয়া লইয়াছে—তার সে-ছবি এখনো সেখান হইতে মুছিয়া যায় নাই, বরং তার শুভ্র মুখখানি শতদল পদ্মের মতো নিত্য নূতন পাঁপড়ি মেলিয়া তোমায় মুগ্ধ করিতেছে। এই দুইটি ভাবের মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়? এ-সমস্যার কোন কূল-কিনারা না পাইয়া, উভয় চিন্তাকে তখনকার মতো চাপা দিয়া, পরীক্ষা পাশের জন্য কোমর বাঁধিয়া তৈরী হইতে লাগিলাম।

অঙ্ক ও বিজ্ঞান কোন দিনই আমার প্রিয় বিষয় ছিলো না। তখন বি-কোর্সে বি, এ, কোন বছর শতকরা পনর জনের বেশী পাশ করিতো না। বিদ্‌ঘুটে প্রশ্ন সব করিয়া ক্রল সাহেব প্রায় সকলকেই বিজ্ঞানে ঘায়েল করিতো। তাই এ-দুটি বিষয় তৈরী করার জন্যই আমাকে হাড় ভাঙ্গা খাটুনী খাটিতে হইলো। ইংরেজীর দিকে মনোযোগ দিবার ফুরসুৎ খুব কমই জুটিলো।

রাতে পড়ার কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম ছিলো না। কোনো দিন পড়িতাম আগ-রাতে বারোটা-একটা অবধি, কোনো দিন আগ-রাতে ঘুমাইয়া শেষরাতে উঠিয়া ফর্সা না হওয়া পর্য্যন্ত পড়িতাম। আগ-রাতে পড়ার দিন পিসিমা, পিসেমশায় এগারটা পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকিয়া পাক করিতে যাইতেন, ঠাণ্ডা ভাত খাইলে আমার অসুখ হইবে যে। শেষ রাতে পড়ার পালা যে

দিন পড়িতো, একটা পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকিয়া আমায় ডাকিয়া তুলিয়া তারা ঘুমাইতে যাইতেন, না জাগিতে পারিলে পাছে আমার পড়া কামাই হয়।

অনুশীলন সমিতি

পরীক্ষার পরই বরাবর বাড়ী চলিয়া আসিলাম। আসিয়া দেখি আমাদের বাড়ীর পশ্চিমের মাঠে লাঠি খেলার ধুম পড়িয়া গিয়াছে। মেজদার ও শ্যামাকান্তবাবুর ছোট ভাই শীতল বাড়ুয্যে মিলিয়া আমাদের গ্রামে অনুশীলন সমিতির একটি শাখা খুলিয়াছিলেন। গাঁয়ের অনেক ছেলেই ইহার সভ্য হইয়াছিলো, আমাকেও হইতে বলিলেন। হাতে-লেখা নিয়মাবলী পড়িয়া দেখিলাম আমার তখনকার অবস্থায় সে-সব নিয়ম মানিয়া চলা অসম্ভব। তাই সভ্য হইতে পারিলাম না। কিন্তু সমিতির সেবকরূপে আমাদের বাড়ী থেকে লাঠিগুলি মাঠ পর্য্যন্ত প্রতিদিন বিকালে বহিয়া লইয়া যাইতাম, কিছু কিছু লাঠি খেলাও শিখিতাম, এতে আমার আনন্দও ছিল কম নয়।

বাবার সাহস

বাবা এখন বাড়ীতে বেশ ভাল ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বসিয়াছেন। ছোট কাল হইতেই তিনি বিদেশে থাকিতেন। তাই তার সাথে এতোকাল মেলা-মেশার বিশেষ সুযোগ ঘটে নাই। এখন দেখিলাম, ভাল লেখাপড়া না শিখিলেও, তিনি একজন হৃদয়বান বীরপুরুষ—চাঁদরায় কেদার রায়ের পাশে

দাঁড়াইয়া লড়নে-ওয়ালা বাপ দাদাদের লাল রক্ত এখনো তেম্‌নি জোড়ে তাহার শিরায়-উপশিরায় প্রবাহিত হইতেছে। আমার এখনও বিশ্বাস, স্বাধীন দেশের লোকদের মতো যুদ্ধে মনুষ্যত্ব দেখানোর সুযোগ জুটিলে, ইনিও বড় বড় বাহিনীর সেনাপতি হইতে পারিতেন। পরাধীনতার এমনি কুফল, মানুষের বিকাশের সুযোগ দেয় না।

অন্য কোন অস্ত্র রাখার সুযোগ না পাইয়া তিনি ঘরের কোণে ঠেস দিয়া রাখিতেন তিন চারখানা বড় বড় লাঠি আর বেড়ায় টাঙ্গাইয়া রাখিতেন দু-তিন খানা খাঁড়া। স্নানের আগে এ-সব লাঠিতে নিজে বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া তেল মাখাইতেন। রাত্রে কোন বাড়ীতে চোর পড়িয়াছে এই সোর শোনা মাত্র উর্দ্ধশ্বাসে লাঠি কাঁধে সে-দিকে দৌড়িয়া যাইতেন। শাঁ শাঁ করিয়া তার পিছন পিছন ছুটিতো তার অতি আদরের বাঘা কুকুরটি। ভয় কাকে বলে তিনি জানিতেন বলিয়া মনে হয় না। একদিন রাত্রে কোনো কারণে গ্রামের মুসলমানেরা আমাদের বাড়ী আক্রমণ করে। সারা গাঁয়ের লোক নিঝুম রাতের মতো চুপ করিয়া রহিলো, ভয়ে একটি শব্দও কারো মুখ হইতে বাহির হইলো না। দিক্-বিদিক্ গ্রাহ্য না করিয়া লাঠি, কুকুর ও এক বরিশালী চাকরের সাহায্যে তিনি তাহাদের তাড়াইয়া দিয়া মা ও বৌদির ইজ্জত রক্ষা করিলেন। তার অসীম সাহসের এমনি আরো অনেক ঘটনার উল্লেখ করা যাইতো। বর্ত্তমান সময়ে বিভিন্ন সমিতির সাহায্যে দেশের নানাস্থানে সাহসী যুবকদল গড়িয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু আমার মনে হয় সাধারণ লোকদের

স্বাভাবিক সাহস দিনের পর দিনই কমিতেছে এবং পরাধীনতাই ইহার মূল কারণ।

প্রথম বিয়ের প্রস্তাব

কিছুদিন পরেই সেই মেয়েটির সাথে আমার সম্বন্ধ পাকাপাকি ঠিক করার জন্য তার বাবা তাদের একজন আত্মীয়কে আমাদের বাড়ী পাঠাইলেন। বাবার সাথে সব কথা ঠিক হইলো কিন্তু বেঁকে বসিলেন মেজদা। তিনি বলিলেন—এ-বিয়ে হোলে বিয়ের সাতদিন আ[illegible] হোতে সাতদিন পর পর্য্যন্ত তিনি বাড়ী থাকবেন না, বিয়েতে [illegible]ওয়া তো দূরের কথা। তাহার এই সঙ্কল্প শুনিয়া বেদনায় আমা[illegible] [illegible]কে টন্ টন্ করিতে লাগিলো। অনেকবার ইচ্ছা হইলো সব [illegible]থা খুলিয়া মেজদাকে বলি কিন্তু সাহসে কুলাইলো না। শেষে লম্বা একখানা চিঠিতে আগা-গোড়া সব লিখিলাম। পরে তাহা তাহার রোজকার পড়ার বই-এর পাতার মাঝে খানিকটা বাহির করি[illegible] রাখিয়া দিলাম। কিন্তু ভোর হইতে না হইতেই সে-খা[illegible] ছিঁড়িয়া ফেলিলাম। মনে হইলো—এ কথাগুলো পড়ে [illegible] নির্লজ্জ বেহায়াই না তিনি আমায় মনে করবেন। এ[illegible] [illegible]ব আরো একদিন কাটিলো। শেষে হৃদয়ের রুদ্ধ[illegible]াব সামলাইতে না পারিয়া আমতা-আমতা করিয়া সব কথা তাহাকে বলিয়া ফেলিলাম। স্নিগ্ধ নয়ন-দ্বয় আমার মুখের উপর রাখিয়া অতি মধুর কণ্ঠে ধীর স্থির ভাবে তিনি আমায় বলিলেন—এর চেয়ে সুন্দর মেয়ে আমি তোমার জন্য দেখে রেখেছি। প্রত্যেকটি

কথা সুধা-মাখা হইলেও বিষাক্ত তীরের মতো আমার বুকে বিঁধিতে লাগিলো। আমি ছল ছল চোখে আর্দ্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম—কোথায় সে মেয়ে? তিনি বলিলেন—সময় হোলে নিজেই বোল্‌ব, এখন জেনে কি করবে? আমার বুক ফাটিয়া কান্না আসিলো। সেখান হইতে আমি তাড়াতাড়ি বাহিরে চলিয়া গেলাম। আর কোন কথাই আমার মুখে ফুটিলো না, মেজদার সে-সিদ্ধান্তই দগ্ধ-হৃদয়ে আমায় মানিয়া লইতে হইলো।

এতো সহজে কেন মানিয়া লইলাম, সে-সম্বন্ধেও দু-চারটি কথা এখানে বলা দরকার। তিনি বড় ভাই হইলেও তখন পর্য্যন্ত তাকে মনে হইতো জীবন-পথে চলার একমাত্র ধ্রুবতারা তাঁর উপদেশই ছিলো আমার কাছে বেদ-বাক্য। এর কারণও ছিলো। জীবনে সে-পর্য্যন্ত যে-কয়জন লোক দেখার সুযোগ হইয়াছিলো, তাদের মধ্যে তার চেয়ে উদার, সাহসী ও মহৎ কাউকেও দেখি নাই। কুচবিহার হইতে বাড়ী আসার পথে গীতালদহ ষ্টেশনে কাবুলীদের বাড়াবাড়িতে গাড়ীতে ওঠা অসম্ভব হইলে, তিনিই তো যাইতেন সকলের আগে বুক ফুলাইয়া ও আস্তিন গুটাইয়া তাহাদের সাথে হাতাহাতি করিতে। পথে ঘাটে কোনো ফিরিঙ্গীকে এদেশের কোনো লোকের উপর অত্যাচার করিতে দেখিলে, সেই ফিরিঙ্গীর গায় দু-এক ঘা না বসানো পর্য্যন্ত তার হাতের গুড়গুড়নিই দূর হইতো না।

কুচবিহারে আইনের ক্লাসে হাজিরা দেওয়া শেষ করার পর হইতে তিনি গ্রামে থাকিয়া লোনসিং স্কুলে মাষ্টারী করিতে

ছিলেন। মাইনের বেশীর ভাগ টাকা তাহার খরচ হইতো গাঁয়ের অনাহারে-মরা ভদ্রলোকদের গোপন সাহায্যে। গ্রামে কলেরা লাগিলে রাতে ডিউটী দেওয়ার পালা প্রায়ই পড়িতো তাহার ঘাড়ে। কোনোও এক অন্য কোন রোগে আক্রান্ত একটি তরুণীর পাশে বসিয়া তিনি রাতে ডিউটী দিতে ছিলেন, এমন সময় সেই মেয়েটি তাহাকে বলিলো—আপনি দেখ্‌তে খুব সুন্দর। মেজদা বলিলেন—মা তো ছেলেকে চিরদিনই সুন্দর দেখে। লজ্জায় মেয়েটির মাথা নত হইলো। এই গল্পটি মেয়েটির কাছ হইতে আমি নিজেই শুনিয়াছি। গ্রামে চুরি আরম্ভ হইলে তিনি রাত্রে লাঠি-কাঁধে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া পাহারা দিতেন। আমার ভূতের ভয় দূর করার জন্য আমাদের বাড়ীর পশ্চিম পাশের একটি বড় তেঁতুল গাছের তলায় দুপুর রাতে আমায় লইয়া গিয়া উপরের দিকে তাকাইয়া বলিতেন—ঐ দেখ্‌, গাছে ভূত নাই। এমনি কতোভাবে নিজের জীবনে আচরণ করিয়া তিনি আমায় সংসার পথে মানুষের মতো চলিতে শিখাইতেন। রাস্তায় ধীরে ধীরে চলিলে তিনি পীঠের উপর কীল্‌ মারিয়া বলিতেন—এমনিভাবে বুক টান করে সংসারে চলবি, ভয় কাকে। তিনি সর্ব্বদাই শির উঁচা করিয়া, বুক ফুলাইয়া, বীরের মতো পাশে দুহাত দুলাইয়া চলিতেন। অল্প বয়সে বিয়ে করায় এবং পরে বৎসরের পর বৎসর ছেলে-মেয়ে হওয়ায়, এ-রূপ একটি মহৎ প্রাণকেও দেশের সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়া ক্ষুদ্র পরিবারের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে হাবুডুবু খাইয়া মরিতে হইতেছে। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট পথে চলার সংকল্প দৃঢ়রূপে অনেকেরই

হৃদয়ে অঙ্কিত হয় না বলিয়া, বেশী বয়সের সেবকের অভাব খুবই অনুভব করিতে হয়।

বি, এ পরীক্ষার ফল বাহির হইলো। পাশ কোর্সে পাশ করিয়াছি, অনার্স পাই নাই। মেডিক্যাল কলেজে পড়ার কথা মেজদাকে আগেই বলিয়াছিলাম। সেখানে পড়াই ঠিক হইলো। বি, এল পরীক্ষার পড়া তৈরী করার জন্য মেজদারও আমার সাথে কলিকাতা যাওয়া ঠিক হইলো। পূর্ব্ব হইতে বন্দোবস্ত করায়, ওয়াই, এম, সি-এর কলেজ ষ্ট্রীট শাখার এক-ই কামরায় আমাদের দুজনেরই সীট্ জুটিলো।

চতুর্থ অধ্যায়

মেডিক্যাল কলেজ

প্রথম দিন মেডিক্যাল কলেজে গিয়াই দেখি বোটানীর ক্লাশে নাম ডাকার জন্য গোল-গাল মুখ ফর্সা চেহারার একটি যুবক রেজেষ্ট্রী হাতে আসিয়া হাজির হইলো। তাহার মুখের স্নিগ্ধ হাসি ও চশমার ভিতর দিয়া বাহির হইয়া আসা চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টি এক মুহূর্ত্তে আমাকে তাহার পানে আকৃষ্ট করিলো। পাশে-বসা ছিপ্ ছিপে একটি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিলাম—কে ঐ ছেলেটি? সে তার অপেক্ষাকৃত ছোট চোখ দুটি যথাসম্ভব বড় করিয়া বিস্ময় দৃষ্টিতে আমার পানে তাকাইয়া বলিলো—ওকে আপনি চিনেন না? এ-ই তো এবার প্রথম হ'য়ে সেকেণ্ড ইয়ারে উঠেছে, বোটানী এবং জুওলজীতে প্রথম হওয়ায় দুটো সোণার মেডেল ও মাসে ষোল টাকা বৃত্তি ও পেয়েছে, এ-ছাড়া সাধারণ স্কলারসিপতো আছেই। একটু অবাক হইয়া খানিকক্ষণ সেই ছেলেটির পানে তাকাইয়া রহিলাম। পরে আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনি ওকে চিনেন?—চিনি বৈ কি, এ-তো মেসে আমার ঘরেই থাকে। আপনারা থাকেন কোথায়—আমার এ-প্রশ্নের উত্তরে সে বলিলো—মিকাডো ক্লাবে।

—মিকাডো ক্লাব? সেটা আবার কি?

আশ্চর্য্য হইয়া ছেলেটি বলিলো—আপনি অবাক্ করলেন, মিকাডো ক্লাব জানেন না ?

জানবো কি করে? আমি যে সবে মাত্র কলকাতা এসেছি।

তারপর সে বলিলো—মিকাডো ক্লাব মেডিকেল কলেজের সবচেয়ে ভাল মেস ; কলেজের ভাল ছেলেদের প্রায় সকলেই সেখানে থাকে। মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে খোলা-মেলা তেতলা বাড়ী। এ-ধরণের অনেক কথাবার্ত্তার পর ঠিক হইলো সে-দিন বিকালে ওয়াই, এম, সি এ-তে আসিয়া সে আমাকে তাদের মেসে লইয়া যাইবে। রেজেষ্ট্রী হাতে ছেলেটির নাম যুগল। আর যার সাথে আমার কথা হইতেছিলো তার নাম ব্রজবল্লভ। যুগলের উপাধি আঢ্য, জাতিতে সে সোণার বেণে, বাড়ী তার চেতলা, অমূল্য আঢ্যদের সে নিকট আত্মীয়। ব্রজবল্লভের বাড়ী ময়মনসিং জেলার নাগরপুর গ্রামে। তার বাবা কলিকাতায় এক বড় মহাজনের চাকরী করেন।

যুগল

সেদিন বিকালে ব্রজবল্লভের মেসে গিয়া দেখি যুগল একখানা চৌকীর উপর জানালার পাশে বসিয়া এনাটমী পড়িতেছে। ব্রজবল্লভ তার সাথে আমার পরিচয় করাইয়া দিলো। যুগল কোনো কথাই বলিলো না। শুধু মুখ তুলিয়া আমার পানে চাহিয়া একটু চাপা হাসি হাসিলো—পরে আবার পড়ায় মন দিলো। খানিক পর সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিলো, আর চোখে

দেখা যায় না। কাজেই সে বই বন্ধ করিয়া বেড়াইতে চলিয়া গেলো।

এর পর আমি রোজই বিকালে সেখানে বেড়াইতে যাইতাম। না গেলে ভালো লাগিতো না। বুকের ভিতর-টা ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিতো, তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘুরিয়া ফিরিয়া শেষ নাগাৎ সেখানে যাইতে হইতো। কোনো দিন ব্রজবল্লভ থাকিতো—কোনো দিন থাকিতো না। যুগল সবদিনই নিজের চৌকীর উপর বসিয়া তেমনি ভাবে আপন মনে বই পড়িতো। আমি ব্রজবল্লভের চৌকীর উপর বসিয়া তার পানে চাহিয়া থাকিতাম। সূর্য্য অস্ত গেলে তার পিছন পিছন বাহির হইয়া আসিতাম, কোনো কথাই হইতো না।

মেডিক্যাল কলেজে ফি বছর পূজার আগে জমকালো ভাবে নাটক হইতো। নাটক দেখার সখ্ ছিল আমার চিরদিনই। ইচ্ছা হইলো একদিন মহড়া দেখিতে যাইবো। কিন্তু কোথায় তাহা হয় জানিতাম না। তাই একদিন যুগলকে জিজ্ঞাসা করিলাম—থিয়েটারের মহড়া কোথা হয় জানেন? সে বলিলো—আউট ডোরে। আমি বলিলাম—আউট ডোর কোথায় আমি জানি না, আপনি কি আমায় নিয়ে যাবেন। সে বলিলো—আচ্ছা, একটু দেরী করুন, কিছু খেয়ে নি। আমি বলিলাম—পথেই খেয়ে নেওয়া যাবে। সে প্রথমে একটু আপত্তি করিলেও শেষে কিন্তু রাজী হইলো।

পথেই পুঁটিরামের দোকান। দুজনে মিলিয়া তাতে ঢোকা গেলো। দাদার নূতন পসার তখন খুব জাঁকিয়া উঠিয়াছে, কাজেই

কলিকাতায় আমাদের কোন অভাব ছিলো না। ছোট কালে আমাদের জন্য কিছু করিতে পারেন নাই বলিয়া দাদা তখন খোলা হাতেই আমাদের জন্য খরচ করিতেন। তাই যুগলের নানারূপ ওজর আপত্তি সত্ত্বেও দোকানের যতোরকমের ভাল খাবার প্রাণ ভরিয়া তাহাকে খাওয়াইলাম।

তারপর তাকে একদিন আমাদের হোষ্টেলে বিকালে যাওয়ার নিমন্ত্রণ করিলাম। ষ্টোভে ভালো ভালো খাবার তৈরী করিতে আমার সারাদিন কাটিলো। বাজার থেকে বড় বড় ফজলী আমও আনিয়া রাখিলাম। সে আসিলে পর খুব আদর ও যত্নের সহিত তাহাকে এ-সব খাইতে দিলাম। খাওয়া-শেষে সে আমায় জিজ্ঞাসা করিলো—আমায় আসতে বলেছিলেন কেন? এরূপ প্রশ্নের জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। তাই তাহার এ-প্রশ্ন শুনিয়া আমার বুকের ভিতরটা ছ্যাৎ করিয়া উঠিলো। কিন্তু মুখে কিছু বলিলাম না। তাহাকে শুধু লইয়া গেলাম নীচে খেলার ঘরে। সেখানে খানিকক্ষণ পিং পং খেলা গেলো। পরে মার্কাস স্কোয়ারে গিয়া উভয়ে কিছু সময় পাশাপাশি হইয়া বেড়াইলাম। সে-দিন আর কোন কথা জমিয়া উঠিলো না। প্রাণের মাঝটা বড় ভারী ঠেকিলো, কি ভীষণ বোঝা যেন তাহার উপর চাপিয়া বসিয়াছিলো।

এদিকে ব্রজবল্লভ-ও আমার সাথে খুব ভাব করিতে লাগিলো। সে সকলের আগে ক্লাসে গিয়া সামনের বেঞ্চে তার পাশে আমার জন্য জায়গা ঠিক্ করিয়া রাখিতো। বিকালে মেসে গেলে নানা কথাবার্ত্তার মাঝে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কথা তুলিতো। আমি

আগে কখনো রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নাম শুনি নাই, তাদের সম্বন্ধে কোন বইও পড়ি নাই শুনিয়া সে অবাক্ হইলো। এরপর বিবেকানন্দের বই থেকে আমাকে ভাল ভাল জায়গা পড়িয়া শুনাইতো, আর আমি অবাক্ হইয়া তার পড়া শুনিতাম। এ-সব পড়া শুনিতে আমার খুব ভাল লাগিতো। তার পড়ার তালে তালে আমার প্রাণের তন্ত্রীগুলি যেন হৃদয়-ভোলানো তালে নাচিয়া উঠিতো। প্রায় রবিবার দক্ষিণেশ্বর কি বেলুর মঠে লইয়া গিয়া সেখানকার সাধুদের সাথে আমার আলাপ করাইয়া দিতো। তাদের জীবন আমার জীবনেও নূতন ঝঙ্কারের সৃষ্টি করিতো। এক-একদিন মনে হইতো লেখা পড়া শেষ করিয়া ইহাদের সাথে আসিয়া থাকিবো।

নূতনরূপে কুলচন্দ্র

ওয়াই, এম, সি, এর একলাঘরে বসিয়া আছি, এমন সময় হঠাৎ একদিন কুলচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত। তার চেহারায় কৈশোরের সেই কমনীয়তা আর নাই। তাহার চোখ মুখ হইতে এক দিব্য প্রভা বাহির হইয়া আসিয়া এক নিমেষে আমায় অভি-ভূত করিলো। ভক্তি ও শ্রদ্ধায় আমার সারা প্রাণ নুইয়া তার চরণতলে লুটাইয়া পড়িলো। আমি তাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলাম —কেমন করে এমন হোলো? তার বড় বড় চুলগুলি এলো থেলো, গায়ে জামা ছিল কিনা মনে নাই, শরীরের আগাগোড়া বৈরাগ্যভাবে মাখা। সে আমায় সব কথা খুলিয়া বলিলো। স্বদেশী আন্দোলনের সুরুতেই সে চাঁদপুর স্কুল ছাড়িয়া কুমিল্লা

জাতীয় বিদ্যালয়ে গিয়া ভর্ত্তি হয়। সেখানকার পড়া শেষ করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছে ন্যাশনাল কলেজে পড়িতে। অরবিন্দ ঘোষ তাদের প্রিন্সিপ্যাল। আলীপুর ষড়যন্ত্রের মামলায় আসামী-রূপে তিনি এখন প্রেসিডেন্সী জেলে। বড় ভাল লোক। কুলচন্দ্র এখন আমহার্ষ্ট স্ট্রীটে একটা মেসে থাকে। আমাকে সে-দিনই সেখানে ধরিয়া লইয়া যাইতে চাহিলো। কিন্তু আমি কাল যাইবো বলিয়া রেহাই পাইলাম।

পরদিন তাহাদের মেসে গিয়া দেখি ছোট একটা দোতলা বাড়ী, আলো বাতাসের পথ প্রায় অবরুদ্ধ, নীচ তলাটা স্যাঁৎ-স্যাঁতে। সেখানকার সকলেই ন্যাশনাল কলেজের ছাত্র। তাদের দেখিয়া আমার বড় ভাল লাগিলো। সকলেরই সাদা সিদে ভাব—যেন তপবনের ব্রহ্মচারী। তাদের ভিতরের সাধনার উজ্জ্বল শিখাটি দেহের মধ্য দিয়া যেন বেশ পরিষ্কার দেখা যাই-তেছে। আমায় দেখিয়া কুলচন্দ্রের কয়েকটি বন্ধু আসিয়া আমার কাছে বসিলো। দিন চারেক আগে কানাই দত্ত নরেন গোঁসাইকে প্রেসিডেন্সী জেলের ভিতর গুলী করিয়া মারিয়াছে। সারাদেশ তখন ইহা লইয়া চঞ্চলিত। আমাদের কথাও সে-দিকে গিয়া পড়িলো। কথা চলিতে চলিতে আমরা এমন এক জায়গায় পৌঁছিলাম যেখানে একমত হওয়া কিছুতেই সম্ভব হইলো না। আমি বুঝিলাম বোমা পিস্তল তাহাদের পাইয়া বসিয়াছে। স্বাধীনতা লাভের ইহাকেই তাহারা একমাত্র পথ মনে করে—অন্য পথে চলা তাহাদের কাছে নিছক কাপুরুষতা। কোন্ পথে চলিবো সে-সম্বন্ধে তখন আমার স্পষ্ট ধারণা না

থাকিলেও, বোমা ও পিস্তল আমার প্রাণে বেশী সাড়া জাগাইলো না। প্রাণের ভিতর একটা খটকা লাগিয়া রহিলো।

আবার বিয়ের প্রস্তাব

কিছুদিন পরের কথা। মেজদা বলিলেন—কতোগুলি কি বিশ্রী দাড়ি রেখেছিস্, আয় তোকে কামিয়ে দি। আমি কোনো আপত্তি করিলাম না। কামানো শেষ হইলে তিনি বলিলেন—ভবানীপুর আজ যেতে হবে, বিশেষ ভদ্রলোকের বাড়ী, সেখানে রাতে খাওয়ার নিমন্ত্রণ আছে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যাওয়া দরকার। কোথায়, কার বাড়ী—এ-সব প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া তিনি শুধু বলিলেন—গেলেই জানতে পারবে। সন্ধ্যার পর ভবানীপুর গিয়া দেখি এক ব্যারিষ্টারের বাড়ী। নূতন ব্যারিষ্টার, প্র্যাক্‌টিস্ এখনো খুব জমে নাই, তবে শীঘ্রই জমার সম্ভাবনা আছে। খুব ভদ্রলোক। বিশেষ আদর যত্ন সহকারে আমাদের খাওয়াইলেন।

মিকাডো ক্লাব

কিছুদিন পর ব্রজবল্লভের বিশেষ চেষ্টায় ওয়াই, এম, সি, এ ছাড়িয়া আমি মিকাডো ক্লাবে গেলাম। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আলোচনা ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিলো। বিবাহ না করিয়া, সারা জীবন সৎপথে থাকিয়া, দেশ সেবা করার ইচ্ছা হৃদয়ে জাগিয়া উঠিলো। হঠাৎ একদিন ব্যারিষ্টার বাবুর ছোট ভাই মেসে আসিয়া আমায় বলিলেন—বড়দা আসাম থেকে এসেছেন, আপনাকে একবার দেখতে চান, কাল গেলেই ভাল হয়। ব্যারিষ্টার বাবুর

বড়দা আসামের এক জমিদারের অধীনে বড় চাকরী করিতেন। তারপর দিন রবিবার। আমিও যাইতে রাজী হইলাম।

পরের দিন বিকাল ৪টাতে ব্যারিষ্টার বাবুর বড় ভাইয়ের কাছে উপস্থিত হইলাম। একটু কথাবার্ত্তার পরই তিনি আমার হাতে একখানা চিঠি দিলেন। খুলিয়াই দেখিলাম বাবার লেখা। পড়িয়া দেখিলাম, বাবা লিখিয়াছেন—মেয়ে আমাদের পছন্দ হয়েছে, এখন সুরেশের পছন্দ হইলেই হয়। সুরেশ কলিকাতা থাকে, এনে মেয়ে দেখাবেন। আকাশের বজ্র যেন একনিমেষে আমার মাথায় পড়িলো। সারা গা কাঁপিয়া উঠিলো। কপাল ঘামে ভরিয়া গেলো। কোন কথাই আমার মুখ দিয়া বাহির হইলো না। খানিক পর ব্যারিষ্টার বাবুর ছোট ভাই হাতে ধরিয়া একটি মেয়ে আমার সামনে আনিয়া দাঁড় করাইলেন। আমি মাথা নোওয়াইয়া রহিলাম। সেদিকে তাকাইলামও না, কথা কওয়া তো দূরের কথা। একটু পরে ছোট ভাই মেয়েটিকে লইয়া ফিরিয়া গেলেন। খুব সম্ভব অভদ্র বলিয়াই তারা আমায় ঠাওরাইলেন কিন্তু আমার অন্য উপায় ছিলো না। মেসে ফিরিয়া আসিয়াই ব্যারিষ্টার বাবুকে নিম্নরূপ একখানা পত্র লিখিলাম।

My dear Mr.—

I cannot induce myself to marry your sister now. Hoping to be excused for the troubles I gave you all.

Yours Sincerely,

SURESH CHANDRA BANERJEE.

ভাবিয়াছিলাম মিকাডো ক্লাবে আসিলে যুগলের সাথে মিশার সুযোগ খুবই জুটিবে কিন্তু কাজে হইলো উল্টো। আগে রোজ বিকালে তার ঘরে যাওয়ার, তার সাথে কথা বলার, সুযোগ বরং যেটুকু মিলিতো এখন তা-ও গেলো। বেশী কথা বলার অভ্যাস তার না থাকিলেও অন্যের তুলনায় আমার সাথে সে অনেক কম কথা বলিতো। মেসের সকলেরই ধারণা ছিলো সে খুব বড়লোক। তার ফিটফাট ভাবে থাকার ধরণ থেকে, সে যে বড়লোক না হইয়া গরীব ও হইতে পারে, কারো মনে এ-ধারণা হওয়া প্রায় অসম্ভব ছিলো। তবু কি জানি কেন, যতোটা ধনী তাকে সকলে মনে করে, ততোটা ধনী সে হয়তো নয়, এ-রূপ একটা ধারণা দিনের পর দিনই আমার মনে ক্রমশঃ অধিক ডালা মেলিতে-ছিলো।

তার অসুখ শুনিয়া একদিন বিকালে তার ঘরে ঢোকা মাত্রই সে হাঁসিয়া আমায় বলিলো—সুরেশ বাবু! আজ অনেকটা এনাটমী পড়েছি, পঁচাত্তর পাতার উপর। তার সে কথায় বেশী জোর না দিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—এখন আছেন কেমন, আজ খাওয়া দাওয়া হলো কি? সে তাড়াতাড়ি বলিলো—শরীর আছে একরকম, খাওয়া দাওয়ার একটা বন্দোবস্ত ক'রবো এখন। হয়তো পয়সার অভাবে এখনো খাওয়া হয় নাই, আচমকা এ-কথা মনে ওঠায় আমি বলিলাম—কিছু খাবার আনি তা হ'লে। সম্মতির ঈষৎ হাসির সাথে বিষাদের ছায়া মেশানো মুখে সে আমার পানে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলো। চাকরকে দিয়া খাবার আনাইয়া দু-জনে ভাগ করিয়া খাইলাম। যাহা এতোদিন অস্পষ্ট

ছিলো, আজ তা একেবারে পরিষ্কার হইলো। বুঝিলাম, পয়সার অভাবে বিকালে খাওয়া এর খুব কম দিনই জোটে। এর পর থেকে জলখাবার আমিই আনাইয়া তাহাকে দিতাম। যতোটা বুঝা যাইতো তৃপ্তির সাথেই সে তাহা খাইতো।

এর পর একদিন সন্ধ্যার সময় খুব বেশী বৃষ্টি হওয়ায় বেড়াইতে বাহির হওয়া অসম্ভব হইলো। আপন মনে দরজা-জানালা-ভেজানো নিজের অন্ধকার ঘরে বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতেছি, এমন সময় সে আসিয়া উপস্থিত হইলো। আমি তো একেবারে অবাক্। এর আগে সে কোনো দিন আমার ঘরে আসে নাই, আজ হঠাৎ আসিলো কেন? আমার বিছানার পাশে বসিয়া দু-একটা বাজে কথার পরই সে আমায় বলিলো—অন্যে বড়লোক মনে করলেও, আমি যে গরীব, এটা তো আপনি এতোদিনে ভালভাবেই বুঝেছেন। বৃত্তির টাকা-কটিতে আমার এখানকার খরচ-ই চলে না, বাড়ীতে বাপ মা আছেন, এ-থেকে বাঁচিয়ে তাদের খরচ-ও দিতে হয়। আপনার জানা-শুনা কোন লোকের বাড়ীতে একটা টিউশনি যোগাড় করে দিলে বড়ই উপকার হয়। উত্তরে আমি বলিলাম —আপনি থার্ড ইয়ারে পড়েন, ক্লাশের সবচেয়ে ভাল ছেলে, আপনার সময় এ-ভাবে নষ্ট করা উচিত হবে না। আপনি এল্-এ পাশ, টিউশনী করে কটাকা-ই বা জুটবে। আমি সাধারণ ছেলে, সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ি, সময়ের মূল্য আমার অনেক কম, বি, এ পাশ বলে টিউশনীতে কিছু বেশী মিলতেও পারে, টিউশনী আমারই করা উচিত, টাকার ভাবনা আপনি করবেন না। মাসে কতো

টাকা দরকার, দেখি যোগাড় হয় কি না? সে বলিলো—মাসে এখন আপনি আমার জন্য যা খরচ করছেন, তার উপর আরো ত্রিশ টাকা দরকার। বিছানায় চিৎ হইয়া শুইয়া খানিক চুপ করিয়া রহিলাম। যার একটু সেবার সুযোগ পাইলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করি, আজ সে নিজেই সেবা প্রার্থী হইয়া আমার দ্বারে উপস্থিত। এর চেয়ে বেশী শুভ মুহূর্ত্ত জীবনে আর কি হইতে পারে? আনন্দে-ভরা প্রাণের তলদেশ হইতে উৎস-বেগে বাহির হইলো—ভাববেন না আপনি এ-কটা টাকার জন্য, আমিই আপনাকে দেবো মাসে মাসে। একটু পরে সে সেখান হইতে চলিয়া গেলো।

ভিতরে প্রচণ্ড আবেগে সারা প্রাণে তোলপাড় সুরু হইলো। সেই তোলপাড় ভেদ করিয়া নির্ঝরের মতো স্নিগ্ধ সুরে একটি কথা বার বার প্রাণে ঝঙ্কৃত হইতে লাগিলো—এ-টাকা জুটবে, জুটবে, জুটবে। এ-যে তাঁর প্রথম সংগ্রামে আহ্বানের শঙ্খ-নিনাদ। পথে ডাকিয়া যিনি নামাইয়াছেন, পাথেয় যোগাড়ের ভার তার-ই। বিশ্বাসের মূলদেশ ধরিয়া আঁকড়াইয়া রহিলাম, পথের আলো তিনিই জ্বালিয়া ধরিলেন।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলা শ্যামবর্ণ এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক আমার ঘরে আসিয়া অতি বিনীত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—বি, এ পাশ কোনো ছেলে এখানে আছে? আমি তাহাকে বসিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—কেন শুনিতে পারি কি? হাতের পুরাণো ছাতিটি দেয়ালে ঠেস দিয়া রাখিয়া তিনি বসিলেন। পরে বলিলেন—আমার একটি ছেলে এবার আই, এস, সি দেবে,

তাকে বিজ্ঞান পড়ানোর জন্য। আমি বলিলাম—আমি নিজেই বি, এ পাশ, পড়াতেও পারি, সন্ধ্যায় এক ঘণ্টা পড়ানোর জন্য মাসে ত্রিশ টাকা দিতে হবে। তিনি তাতেই রাজী হইলেন এবং বাসার ঠিকানা দিয়া পরের দিন সন্ধ্যার সময় যাওয়ার জন্য বার বার অনুরোধ জানাইয়া বিদায় লইলেন। আমার ভগবানে বিশ্বাস ছিলো চিরকালই। রামকৃষ্ণ মিশনের সংস্পর্শে আসিয়া তা আরো বাড়িয়াছিলো। এই ঘটনায় তার অদৃশ্য হাত যেন জীবন্ত রূপে আমার চোখের সামনে অতি স্পষ্টভাবে ভাসিয়া উঠিলো। পরদিন থেকে আমি টিউশনী আরম্ভ করিলাম। মুগলের টাকার অভাব দূর হইলো।

এর কিছুদিন পরই মেজদার বি, এল পরীক্ষার ফল বাহির হইলো। সন্ধ্যায় ইউনিভার্সিটীতে লটকাইয়া দেওয়া পাশ ছাত্রদের তালিকায় নিজের নাম না দেখিয়া মেজদা পাগলের মতো কলিকাতার এ-রাস্তায় ও-রাস্তায় ছুটাছুটী করিতে লাগিলেন। আমি তাহাকে নানাপ্রকারে বুঝাইয়া শান্ত করিতে চেষ্টা করিলাম কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হইলো না। তার পিছনে কলিকাতার রাস্তায় ঘুরিতে ঘুরিতে সারারাত কাটিলো। পরদিন সকালে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—বলুন, কি হলে আপনি সন্তুষ্ট হন। প্রথম চুপ করিয়াই রহিলেন। শেষে অনেক কাকুতি মিনতি ও পীড়াপীড়ির পর বলিলেন—বিলাত গিয়ে ব্যারিষ্টার হ'তে পারলে আমি খুসী হই। একটু ভাবিয়া আমি বলিলাম—আচ্ছা, তাই হবে। তিনি বলিলেন—এতো টাকা জুটবে কোথা থেকে? আমি বলিলাম—ব্যারিষ্টার বাবুর বোনকে বিয়ে

কোরলে তো অনেক টাকা মিলতে পারে, দাদার ওকালতীও ভাল চলছে, তিনি নিশ্চয়ই কিছু দেবেন। এ প্রস্তাবে মেজদার অনাপত্তিকেই সম্মতি মনে করিয়া, আকাশ ভরা মেঘ ও মুষলধারে বৃষ্টি মাথায় করিয়া ব্যারিষ্টার বাবুর বকুল বাগানের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। ব্যাকুলতা স্পষ্টভাবে চোখে মুখে ফুটিয়া ওঠা আমায় ব্যারিষ্টার বাবুর ছোট ভাই খুব আদর যত্ন সহকারে বৈঠক খানায় নিয়া বসাইলেন। চা ডাকার ওজুহাতে ভিতরে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—ব্যারিষ্টার বাবু আপনার সাথে দেখা করতে আসছেন। ব্যারিষ্টার বাবু আসিয়াই হাসিমুখে বলিলেন —তখনতো বিয়ে করতে প্রস্তুত ছিলেনা, এখন আছো তো? আমি একটু মাত্র দ্বিধা না করিয়া বলিলাম—আছি। কিন্তু আমায় কিছু আগামো টাকা দিতে হবে। উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিয়াই তিনি আমার এ-প্রস্তাবে রাজী হইলেন। বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হইলো। 'মেয়ে দেখার কথা মনেও উঠিলো না—কারণ এই বিয়েতে আগ-পাছ চিন্তার কোন কথাই আমার মনে ওঠে নাই। এ ছিলো আমার বিয়ে নয়, পূজা—হৃদয়ের ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে এতোদিন পূজা করিয়া আসা গুরুর তৃপ্তির জন্য জীবনের শ্রেয় প্রেয় সব কিছুর নিঃশেষে বিসর্জ্জন।

পরদিন ভোরে দাদার মতের জন্য আমি চাঁদপুর রওনা হইলাম। দাদা নবীন মুখুজ্যের সাথে পরামর্শ করিয়া মাসে মাসে তার অংশের টাকা দিতে রাজী হইলেন। মেজদার জীবনের একটা পথ হইলো ভাবিয়া হাতে যেন আকাশ পাইলাম। আনন্দ-পূর্ণ হৃদয়ে মেসে ফিরিয়াই শুনি—গেজেটে মেজদার নাম

বাহির হইয়াছে, তিনি পরীক্ষায় পাশ করিয়াছেন। একটু পরে মেজদার নিজের মুখেই শুনিলাম তার বিলাত যাওয়ার মত বদলাইয়াছে। আমি ফাঁপরে পড়িলাম। তার মতটা বদলানো যতো সহজ, আমার বিয়েটা বদলানো কিন্তু ততো সহজ নয়। ভদ্রলোককে কথা দিয়া ফিরানো যে কতো কঠিন, তারপরও বাঁচিয়া থাকা যে আরো কতো শক্ত, ঠাকুরমা তো তা নিজেই অতি উজ্জ্বল ভাবে আমাদের দেখাইয়াছেন। আর সে ঠাকুরমা তো এখনো অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে আমাদের গৃহে বিরাজমান। না, কথা ফিরানো অসম্ভব। অনন্ত জীবন স্রোতে এ-জীবনটি তো একটি বুদ্‌বুদ্‌ মাত্র, চোখের নিমেষে যে কোন-ও মুহূর্ত্তে তাহা বিলীন হইতে পারে। এ-জীবনের জন্য এতো ভাবনা কিসের? প্রাণের ভিতর বড় একটা আদর্শ গড়িয়া উঠিয়াছিলো, যাক্‌ না সে-আদর্শ চুরমার হইয়া? সামনের সামান্য কর্ত্তব্যের বেলায় যদি পিছ পা হই, ভবিষ্যতের বড় বড় কর্ত্তব্য গুলি যে সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিব তারই বা নিশ্চয়তা কি?

বিয়ের দিন ঘনাইয়া আসিলো। মাঝে মাঝে তাদের বাড়ী যাতায়াতে, তাদের সকলের সাথেই ঘনিষ্ঠতা জমিয়া উঠিলো। ব্যারিষ্টার বাবুর বিয়েতে বরযাত্র ও গেলাম, বউ-ভাতের নিমন্ত্রণও বাদ পড়িলো না। সন্ধ্যা-শেষে এক-একদিন সে-বাড়ী গিয়া ফিরিতে রাত দশটা এগারটা বাজিতো। শেষ ট্রামের সময় পার হইয়া যাওয়ায় ভবানীপুর হইতে মির্জ্জাপুর পর্য্যন্ত হাঁটিয়াও আসিতে হইতো। তখন পর্য্যন্ত কলিকাতার রাস্তায় বাস

চলা সুরু হয় নাই। যুগল ও ব্রজবল্লভের কাছে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের কথা শোনাও চলিলো। তাদের কথা শুনিবামাত্র কি যেন কী এক গোপন টানে প্রাণ বড্ড বেশী সে-দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতো। একদিন যুগল ও আমি নৌকায় দক্ষিণেশ্বর যাইতে-ছিলাম। দূর হইতে মন্দিরের চূড়া চোখে পড়া মাত্র আমার প্রাণ শিহরিয়া উঠিলো। ভয়ে আড়ষ্ট কণ্ঠে যুগলকে বলিলাম—না ভাই, ওখানে যাওয়ার অধিকার আমার নাই, তুমি একাই যাও। আমার পথ এখন অন্য দিকে। আমার বিবাহ ঠিক হয়েছে। আমার কথা শুনিয়া যুগল অবাক্ হইলো। বলিলো—সে কি, কবে ঠিক হলো? এতোদিন তো আমায় বলো নাই। আমি বলিলাম—একথা আমার মুখ দিয়ে বেরোয় নাই, এ-যে তোমাদের শেলের মতো বিঁধবে। সে বলিলো—বিয়ে হলো বা, দক্ষিণেশ্বর যেতে আপত্তি কি? আমি বলিলাম—বিবাহিত লোকের জন্য রাম-কৃষ্ণের হৃদয়দ্বার যে একেবারে রুদ্ধ। রামকৃষ্ণের প্রাণ-শূন্য মড়া দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে কি করবো? দক্ষিণেশ্বর আর সে যাত্রায় যাওয়া হইলো না। উভয়েই নৌকায় ফিরিলাম।

বিয়ের সাত আট দিন মাত্র বাকী। ছাপানো নিমন্ত্রণ পত্র আত্মীয় স্বজনদের পাঠানো হইয়াছে। বিয়ের জন্য ভাড়া নেওয়া ভবানীপুরের বাড়ীতে দু-একজন আত্মীয় আসিতে-ও আরম্ভ করিয়াছে। কলিকাতার বন্ধু বান্ধবদের একদফা খাওয়ানো ইতিপূর্ব্বেই শেষ হইয়াছে। এমনি সময় আমার বাল্যবন্ধু উপেন মুখুজ্যে প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর কিছু পরে আর একটি বিবাহ করিয়া আমাদের মেসে আসিয়া হাজির হইলো। আমি ভারী বিরক্ত

হইয়া তাহাকে বলিলাম—তোদের আবার বিয়ে নাকি, এতো সাঙ্গা। সে আমায় বলিলো—আচ্ছা দেখা যাবে। আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম—কি আর দেখবে? এ-বিয়েই ঘটনাচক্রে না হ'লে আর বিয়ে করবো না। আমার কথা শুনিয়া সে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলো। মনে হয়তো ভাবিলো—এ-পাগলের প্রলাপ। এর পরদিনই বিয়ের সব বন্দোবস্ত করার জন্য কলিকাতা আসিয়া মেজদা উঠিলেন আমাদেরই মেসে। সারাটা দুপুর আমার কাটিলো বন্ধুদের বিয়েতে যাওয়ার নিমন্ত্রণ করার উত্তেজনায়। সন্ধ্যাবেলা ক্লান্ত দেহ লইয়া অন্ধকার-আচ্ছন্ন ঘরে ঢুকিতেই করুণ সুরে গাওয়া মেজদার গান আমার কাণে গেলো—

আমার এই তো হইলো শেষ,
এ-জীবনে আর হাসিব না ভবে,
কাঁদিতে হবে জীবন যতোদিন রবে
আমার দুঃখেরি পসরা পরিপূর্ণ হ'লো
কি করিলে পরমেশ।

গানের প্রত্যেকটি কথা তীক্ষ্ণ সূঁচের মতো আমার প্রাণে বিঁধিতে লাগিলো। আটকে আসা দম ঠেলিয়া বাহির হইতে চাহিলো শুধু এই কথাটি "আমার এইতো হইলো শেষ"। সারা শরীরের রক্ত হিম হইয়া জমাট বাঁধিয়া আমায় হাত পা যেন অবশ হইয়া আসিলো। সেখানে আর থাকা অসম্ভব হইল। তাড়াতাড়ি দৌড়িয়া সিঁড়ি বাহিয়া ছাদের উপর গেলাম। সেখানে অনন্ত আকাশ-ছাওয়া আঁধারের মাঝে উপুড় হয়ে-পড়া

আমার অন্তঃস্থল মথিত করিয়া বাহির হইলো মায়ের চরণে এই প্রার্থনা—আঁধারের দেবী তুমি, ঘন সংশয়াচ্ছন্ন এই সঙ্কট সময়ে নিজের আলো ধরে দেখিয়ে দাও কোন্ পথে আমায় যেতে হবে, দোটানায় পড়ে ছিন্ন ভিন্ন হওয়ার মহা ধ্বংস হ'তে আমায় উদ্ধার করো। এ-ধরণের প্রার্থনা চলিলো প্রায় রাত দশটা অবধি। কোন উত্তর পাইলাম না। নূতন আলো চোখের সামনে জ্বলিয়া উঠিলো না। সংশয়ের পর সংশয় ঘনাইয়া আসিয়া আগের আঁধার আরো জমাট করিয়া তুলিলো। এমনি সময় যুগল ব্যস্ত সমস্ত ভাবে বলিলো—এতোক্ষণ ধরে খুঁজেছি তোমায়, এখানে কি কচ্ছো, খাওয়ার যে তৈরী হয়েছে অনেক আগে। ইহা বলিয়া সে আমার পাশে আসিয়া বসিলো। গায়ে হাত দিয়া বলিলো—চল যাই খেতে। কোন কথাই আমি বলিলাম না। সজোরে বেরিয়ে আসা দীর্ঘশ্বাসটি চাপিয়া রাখিয়া তার পিছন পিছন উঠিয়া গেলাম নীচে খাওয়ার ঘরে।

সে রাত কোন প্রকারে পোহাইল। সময়তো কারো কেনা গোলাম নয়। সে চলে নিজের নিয়মে স্বাধীন গতিতে। বেলা হইলে, মেজদা গেলেন ভবানীপুরে বিয়ে সম্বন্ধে ব্যারিষ্টার বাবুর সাথে শেষ কথা বলিতে। বেলা তখন প্রায় বারোটা। বন্ধুদের সাথে বিয়ের আগের শেষ দেখা সারিয়া আসিতে কলেজে যাইতেছি—এমন সময় পথে কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে সবে মাত্র ট্রাম হইতে নামা মেজদার সাথে দেখা হইলো। তাহার মুখ সন্ধ্যা-আকাশের মতো গম্ভীর, রক্তবর্ণ। ভিতরের রাগের বেগ যেন দুর্দম শক্তিতে ঠেলা মারিতেছে মুখের চামের প্রত্যেক বিন্দুতে।

তিনি অতি গম্ভীর ভাবে আমায় বলিলেন—চলো মেসে, কথা আছে। আমি তাহার পিছন পিছন চলিলাম বধ্য ভূমিতে হেঁচড়ে-নেওয়া ছাগ শিশুটির মতো। মেসে পৌঁছিয়াই মেজদা বলিলেন—বিয়ে হবে না, সম্বন্ধ ভেঙ্গে গেছে। আমার বুকের ভিতরটা ধড়াস করিরা কাঁপিয়া উঠিলো। বিছানার উপর দেয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া আমি তাকে বলিলাম—কেন, কি হয়েছে? তিনি বলিলেন—সে সব কথা পড়ে হবে, এখন শুধু এ-টুকু জেনে রাখো, ঝগড়া হয়েছে, বিয়ে হবে না। জড়িয়ে-রাখা বিছানার উপর হেলান দিয়া আমি শুইয়া পড়িলাম। একটু পরে মেজদা গেলেন নীচে স্নান করিয়া খাওয়া দাওয়া সারিতে।

কি করি এখন—এ প্রশ্নটি শুধু বার বার আমার মনে হইলো। সাথে সাথে মনে পড়িলো তিনদিন আগেকার ব্যারিষ্টার বাবুর কথা—এ বিয়ে কেন্দ্র ক'রে হয়তো অনেক সংঘর্ষ বাঁধবে, ভাইটি আমার, তোমায় কিন্তু শক্ত হতে হবে। সেই পরিবারের ভাইটিই তো প্রায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। কিন্তু এদিকে মেজদার সম্মান, পরিবারের মুখের দিকেও তো তাকাইতে হইবে। জীবনের এ-দীর্ঘ পথ যাদের সাথে চলিয়া আসিলাম, সামান্য একটু গোলমাল হওয়াতেই তো তাদের সাথে এতোদিনের পাকানো শক্ত ডোর হৃদয়ের সমস্ত শক্তি দিয়া ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলা উচিত নয়। সংসার, সমাজ, দেশ তো এভাবে চলে না। কি করি, কোথায় যাই। মনে পড়িলো ছেলে বেলায় শোনা বিল্বমঙ্গলে রাখাল বেশী শ্রীকৃষ্ণের গান—সে আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধরে। এসো, এসো কে আছ জগতের নিয়ন্তা, সংশয়ীর সংশয়হন্তা,

মূঢ়ের জ্ঞানদাতা, এসো এসো। বাড়িয়ে দাও তোমার নিশ্চিত হাত—উন্মুক্ত কর তোমার শাশ্বত পথ। ধ্বংস হয়েছে, চুরমার হয়েছে আমার এতোদিনকার বই-পড়া জ্ঞানের অহঙ্কার।

অন্ধকারে দীপ শিখা সম হৃদয় মাঝে কে আমায় বলিলো—আলো-তো তুমি অনেকদিন আগেই পেয়েছিলে, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতাপকে হাস্তে হাস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতে দেখে তারই জন্য যাকে সে জীবনের প্রতি পলে ভালবেসেছে শৈশব হোতে। কামনার চোখে এতোকাল যাকে দেখে এসেছো, আজ তাকে পূজা করতে শেখ প্রেমের শতদল পদ দিয়ে, স্মৃতির পবিত্র মন্দিরে প্রতিষ্ঠা কর তার শাশ্বত প্রতিমা। দূর হইলো এক নিমেষে সব সন্দেহ। খাওয়া দাওয়া সারিয়া ঘরে ঢোকা মাত্রই মেজদাকে বলিলাম—আপনার কথাতেই আমি রাজী আছি। কিন্তু এ-জীবনে আমি আর বিয়ে করবো না। এরপর দাদা কোনো বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করলে আমার পক্ষ নিয়ে আপনার লড়তে হবে। মেজদার মুখের গম্ভীরতা অনেকটা হাল্কা হইলো। ঈষৎ হাসিয়া তিনি বলিলেন—তুমি এতো উতলা হচ্ছো কেন, সময়ে সবই সেরে যাবে। আমি আবেগের সাথে উঠিয়া বসিয়া বলিলাম—না, না, সারবে না, সারবে না। আমার বিয়েতো হয়ে গেছে। আপনাকে আমার কথায় রাজী হতে হবে, নইলে আপনাদের অমতেও আমি এ-বিয়ে করবো। বেগতিক দেখিয়া মেজদা আমার কথায় রাজী হইলেন।

পরদিন যুগলকে সব কথা খুলিয়া বলিলাম—কঠোর সাধনা এরপর আমায় করতে হবে। ভোগের পথ বন্ধ হলো বটে, কিন্তু

দেহের ক্ষুধাতো এখনো মেটে নাই। বাধা পেয়ে সে যে রুদ্ধ পথ ঝরণার মতো ক্রমশঃই অধিক বেড়ে ফুলে উঠ্‌বে। কামনার সে দুরন্ত বেগ রোধ করতে হোলে সংযমের বাঁধ এখন থেকেই পোক্ত করে গড়ে তুলতে হবে। মেডিক্যাল কলেজে আসার পর থেকে তুমিই আমার প্রধান সাথী, হৃদয়ের গোপন কথার রুদ্ধদ্বার সহজে খোলে একমাত্র তোমারই কাছে, অনিশ্চয়তার অতল সাগরে ভাসমান আমার এখনকার জীবন তরীর কর্ণধার হতে হবে তোমাকেই। যুগল সব কথাই হাসিয়া উড়াইয়া দিলো। কিন্তু সেই উড়াইয়া দেওয়ার মাঝেও আমি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলাম জগৎ জননীর প্রচ্ছন্ন বরাভয়-প্রদায়ী দক্ষিণ হস্ত।

কিছুদিন পরেই আসিলো যুগলের জন্মদিন। আমি দোকান থেকে ভাল একখানা বুদ্ধের ছবি কিনিয়া আনিয়া, যুগলের টেবিলের উপর রাখিয়া, ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে সারা সকাল ধরিয়া তাহা মালা ও ফুলে সাজাইলাম। দুপুরে খাওয়ার পর সেই ছবির সামনা-সামনি আমরা উভয়ে বসিয়া সন্ধ্যা অবধি বুদ্ধের জীবনী ও উপদেশ পাঠ করিলাম। কিরূপে ভোগ লালসা সংযত করিয়া কাম-মুক্ত বুদ্ধ হওয়া যায় সে সম্বন্ধে আলোচনার পর পবিত্র মনে এই সঙ্কল্প দুজনে মিলিয়া করিলাম—বুদ্ধই হতে হবে, বুদ্ধই হতে হবে। ইহাই হইলো জীবনের প্রথম দীক্ষা। আশ্রমের দেয়ালে টাঙ্গানো বুদ্ধের সেই ছবিখানার পিছনে লাল রংএর পেন্সিলে এখনো লেখা আছে—"Dedicated to Jugal on the occasion of his 22nd birth day.

কামনা শূন্য পথে চলার দীক্ষা তো লইলাম কিন্তু সে পথের

পরিধি তখনো আমার কাছে ছিলো অতি সঙ্কীর্ণ। তাকে বাড়ানোর জন্য প্রাণে ছটফটানি আরম্ভ হইলো। কলেজের পড়া বন্ধ করিয়া রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের গ্রন্থসাগরের মন্থন আরম্ভ করিলাম। উদ্দেশ্য সেই সঙ্কীর্ণ পথের উজ্জ্বলতা বাড়ানোর রত্ন উপরে তোলা। কিছু নূতন আলো লাভ হইলো বটে কিন্তু যা হইলো অতি সামান্য —দীর্ঘ পথে চলার জন্য মোটেই যথেষ্ট নয়। গীতা, উপনিষদ্ পড়া আরম্ভ করিলাম। তাদের অন্ধকার-আচ্ছন্ন গহ্বর থেকে আমার মতো আনাড়ীর আসল রত্ন খুঁজিয়া বাহির করা মুস্কিল। তাই যাইতে আরম্ভ করিলাম বিভিন্ন প্রদেশ হইতে কলিকাতায় আসা সন্ন্যাসীদের কাছে। তিব্বতী বাবার কাছে কিছু ধ্যান ধারণা শিখিলাম। কিন্তু তাও আমায় বেশী দূর নিতে পারিলো না। বেলুড়মঠের সন্ন্যাসীদের কাছে আনা গোনা বাড়িলো কিন্তু তাও পূর্ণ শান্তি মিলিলো না। এই সব দিয়ে প্রাণকে যত ঠেসেই ... ধরে না রাখি, কি জানি কোন্ অজানা রন্ধ্র দিয়ে নানারূপী কাম ... মাঝে মাঝে উঁকি ঝুঁকি মারে।

পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণ

এমনি অনিশ্চয়তার মাঝে হাবু-ডুবু খাইতেছি এমন ... র যুগলের অনুরোধ আসিলো তাকে লইয়া পূর্ব্ববঙ্গে বেড়াইতে যাওয়ার। অন্তর-সংগ্রামে ব্যস্ত মনের এই আহ্বানে সাড়া দেওয়ার প্রথম কোনো উৎসাহ না দেখা গেলেও শেষে কিন্তু যুগলের বিশেষ পীড়াপীড়িতে রাজী হইতে হইলো। প্রথমেই নড়িয়া যাওয়া ঠিক হইলো। দ্বিধা-সঙ্কোচে হৃদয় দুলিতে

লাগিলো। যুগল সোণার বেনে। আমাদের বাড়ীর পাশের সোণার বেনেদের সাথে আমাদের সামাজিক সম্বন্ধ, আলাচাল কাঁচা তেঁতুলের মতো না হইলেও, যে মোটেই প্রাণস্পর্শী ছিলো না, তাহার বহু প্রমাণ জ্ঞান হওয়া অবধি পাইয়াছি। তবু তাকে লইয়া যাইতে হইলো হাতে ধরিয়া মার কাছে যেমন করিয়া লইয়া যায় বড় ভাই প্রাণের ছোট ভাইটিকে। আগে থেকে চিঠি লেখার অবসর জোটে নাই। তাই আচমকা গিয়া বাড়ী উপস্থিত হইতে হইলো বৈশাখের এক বেলা-শেষে। বাড়ী পৌছিয়াই চুপি চুপি মাকে বলিলাম—এ-সোণার বেনে হলেও ব্যবহারে একে বুঝাতে হবে এ-যেন আমাদের বাড়ীর আপন ছেলে। মার দীর্ঘ দিনের সংস্কারে প্রথম একটু আঘাত লাগিলো বটে, কিন্তু তিনি তাড়াতাড়ি সারিয়া লইয়া যুগলকে বলিলেন—উঠানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন, এসো বাবা ঘরের ভিতর, তুমি যে আমারই ছেলে মাখনের মতো। যুগল তার স্বাভাবিক চাপা হাসি হাসিয়া ঘরে ঢুকিয়া মার পায়ের ধূলা লইলো। মা ও তাকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন বুকের ছেলেটির মতো। আমার প্রাণের বোঝা এক নিমেষে হাল্কা হইলো। রান্না ঘরে আলাদা ঠাঁই করা হইলেও বিজ্ঞানের উপদেশ উড়াইয়া দিয়া আমি তার সাথে কিন্তু খাইলাম এক-ই থালায়। ভিতরে বিপদের আশঙ্কা যেখানে বেশী, দ্বিধা সঙ্কোচে যেখানে প্রাণ ভরিয়া উঠে প্রতি মুহূর্ত্তে, বাহিরের ব্যবহারে সেখানে জোর দিতে হয় একটু অধিক। আমাদের একত্র খাইতে দেখিয়া মার প্রাণের ভয় স্পষ্টরূপে মুখে ফুটিয়া উঠিলো, কারণ বাবা টের পাইলে রক্ষার পথ যে খুবই সঙ্কীর্ণ, তা তার

জানা ছিলো ভালরূপেই। বাবা কিন্তু টের [illegible] কিছু, বলিলেন না। এ-ভাবেই জল-অচল লোক [illegible] হইলো আমাদের বাড়ীতে আমাদের পরিবারের ইতিহাসে [illegible] হয় সর্ব্ব প্রথম। যুক্তি তর্কদ্বারা যা কখনো সম্ভব হইতো কি না সন্দেহ, প্রেমের অমোঘ চাপে তা সম্পন্ন হইলো এক নিমেষে।

নড়িয়া থেকে চাঁদপুর গিয়ে উঠিলাম নবীন মুখুজ্যে মশায়ের বাসায়। উদার-হৃদয় মুখুজ্যে মশায়ের সোণার বেনে সহ্য হইলো অতি সহজে। কিন্তু মুস্কিল বাঁধিলো তার বাসার বাইরের লোকদের লইয়া। তাদের কাণাকাণি শুনিয়া মুখুজ্যে মশায় আমায় ডাকিয়া বলিলেন—এখানে তো চলে গেলো যাহোক্ এক রকম ক'রে, কিন্তু এরপর সোণার বেনে বলে চালানো মুস্কিল হবে। তাই এর পর থেকে একে যুগলকৃষ্ণ ঘোষ বলা ঠিক হইলো।

চাঁদপুর থেকে চাটগাঁ হইয়া গেলাম মহিষখালি দ্বীপের আদিনাথ তীর্থে। বঙ্গসাগর দিয়ে যাওয়ার সময় কাল বোশেখীর মেঘ বার বার ঘনিয়ে আসায় আমার প্রাণে দুরু দুরু সুরু হইলো; আমার জন্য নয়—কারণ সাঁতার কাটার অভ্যাস আমার এখনো লোপ পায় নাই—কিন্তু যুগলের জন্য, সে যে এ-বিষয়ে একেবারেই আনাড়ী, জলে ভাসা মাত্র ডুবে যায় পাষাণের মতো। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ লইয়া আমরা নামিলাম আদিনাথের ঘাটে ষ্টীমার থেকে শাম্পানে। তখনই রুদ্রবেগে ভীষণ ঝড় আসিলো। শাম্পানের সকলের ছাইয়ের মতো মলিন মুখের ব্যাকুলিত হরি-

আল্লা রবের সাথে ঝড়ের শোঁ শোঁ শব্দ মিশিয়া এক ভীষণ রাগিণীর সৃষ্টি হইলো। আমি তাড়াতাড়ি যুগলের কাছে গিয়া তাকে জড়াইয়া ধরিলাম। মনের এই আকুল প্রার্থনাটি উৎস বেগে উথলিয়া পড়িলো কোন এক অজানার চরণতলে—শক্তি দিও যেন এর বুকে বুক মিলিয়ে নির্ভয়ে ডুবে যেতে পারি এই অতলের তলের দিকে, আরো এক গভীর অতলের অনিশ্চিত পথের আকুল সন্ধানে। প্রাণের সে-প্রার্থনা সেই অজানার হৃদয় তন্ত্রীতে বেদনার করুণ-স্পর্শে নাচাইয়া তুলিয়াছিলো কি না জানিনা কিন্তু দেখিতে দেখিতে সেই পাগল ঝড়ের তাণ্ডব নৃত্য শান্ত হইয়া গেলো—রহিলো শুধু আমাদের সামনের পথ খানিক ঝাপসা-করা টিপটিপানী বৃষ্টি।

অচেনা বাড়ীতে অতিথি হওয়ার উপলক্ষ এর আগে কখনো হয় নাই। তাই সঙ্কোচ-জড়িত চরণে আমরা যাইতেছিলাম সন্ধ্যাছায়া-সমাচ্ছন্ন গ্রাম্য পথে সেখানকার জমিদার প্রসন্ন বাবুর কাছারির অভিমুখে—মুখে একথা আওড়াইতে আওড়াইতে—আমাদের আজ রাতে এখানে থাকতে ও খেতে দিতে হবে। ঠিক ছিল কাছারি বাড়ীর ফটক পার হইয়া প্রথম চোখে-পড়া লোকটিকে এ-কথাকটি আমি বলিব। কিন্তু ফটক পার হইতে না হইতেই চশমা-চোখে-আটা সুন্দর মুখ একটি ছেলে হাসিমুখে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমাদের পানে চাহিয়া বলিলো—আসুন, আসুন, চাটগাঁ থেকে এলেন বুঝি, ঝড় বাদলে নিশ্চয়ই নাস্তা-নাবুদ হ'তে হ'য়েছে। ছেলেটি প্রসন্ন বাবুর ছোট ছেলে। কলেজ ছুটি হওয়ায় তখন সেখানে ছিলো। কাজেই সেখানে

আমাদের আর কোন অসুবিধা হইলো না। বরং যে একটা দিন ছিলাম পরম আদরে যত্নেই কাটিলো।

পরের দিন দুপুরের ষ্টীমারে সেখান থেকে কক্সবাজার গিয়া অতিথি হইয়া উঠিলাম এক আফিং-এর দোকানে। পর-দিন ভোর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মগপুরুষ ও মেয়েদের দলে দলে আফিংএর মোড়ক কিনিতে দেখিয়া মনে হইলো—মোড়কগুলো যেন মাথা উঁচু করে হেঁকে সকলকে বলছে, মরণ পথের যাত্রী কে আছ কোথায় এসো আমাদের কাছে। ক্রমে ক্রমে ঘনিয়ে আসা সংসারের সুখ-দুখ-ভুলানো ঝিমানোর মাঝে আমরা তোমাদের নিয়ে যাবো সে-অন্ধকার রাজ্যে, যেখানে হাত-পার নড়চড়, প্রাণের স্পন্দন, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, সঙ্কল্পের উচ্চতা চিরতরে লুপ্ত হয়ে আসে।

সেখান থেকে আমরা গেলাম বঙ্গোপসাগরের প্রসিদ্ধ আলোকগৃহ দেখার জন্য কুতুবদিয়া। সেখানকার বাসিন্দা প্রায় সবই মুসলমান, হিন্দুদের মধ্যে মাত্র কয়েকজন খাসমহলের কেরাণী ও তাহাদের কর্ত্তা সার্কেল অফিসার। দরিদ্র কেরাণীদের ঘাড়ে না চাপিয়া, সার্কেল অফিসার সা ডেপুটী বাবুর আতিথ্য গ্রহণই বিধেয় মনে করিয়া র কাছে গিয়া হাজির হইলাম। কিন্তু তার চোখ-মুখের আমতা আমতা ভাব, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিচিত্র ভঙ্গী দেখিয় আমাদের আক্কেল গুড়ুম হইলো। আমরা যেন আকাশ হইতে পড়িলাম। এখন যাই কোথায় ভাবিতে ভাবিতে বাহিরে তাকানো মাত্র দেখিলাম—চির দুর্ভিক্ষের স্পষ্ট রেখা-রাজী মুখে ফুটিয়া-ওঠা একটি

রোগাটে বাবু হাতের ইসারায় আমাদের আহ্বান করিতেছেন। তার কাছে যাওয়া মাত্রই, তিনি আমাদের কাছারিতে লইয়া গিয়া পরম শ্রদ্ধার সাথে ডাল ভাতের বন্দোবস্ত করিলেন। সরকারী চাকরেদের উপর সেদিন থেকে স্বরু হওয়া আমার অন্তরের ঘৃণার ভাব দিনের পর দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে—কমার সুযোগ এ-জীবনে আর ঘটিলো না। আগে ভাবিতাম দেশে বড় বড় চাকরেদের দল ভারতীয় হইলেই ভারতের স্বাধীনতা মুঠোর মধ্যে আসিবে। কিন্তু এখন দেখিতেছি চাকরি মিলার সাথে সাথেই ভারতীয়েরা নিজেদের কপালের ভারতীয়-মার্কা মুছিয়া ফেলিয়া একেবারে হইয় পড়ে ঈঙ্গ-বঙ্গ ভারতীয় এক অদ্ভুত জগা-খিচুড়ী।

কুতুবদিয়া হইতে চাটগাঁ হইয়া আসিলাম চন্দ্রনাথে। সেখানে অতিথি হইয়া ওঠা গেলো থানার কাছে আমাদেরই এক গ্রাম্য আত্মীয়ের বাড়ীতে। চন্দ্রনাথ পাহাড়ের উপর গিয়া দেখি একটি তরুণ ব্রাহ্মণের মৃতদেহ পড়িয়া আছে মন্দিরের ভিতর ঠাকুরের এক পাশে। তাহার মুখে ফেনা, গা ও পা খালি, জীর্ণ ছাতাটি ও চার আনা পয়সা পড়িয়া রহিয়াছে তাহার দেহেরই এক ধারে। থানায় আসিয়া সংবাদ দিতে হইলো। ভাড়ানো নাম আর চালানো অসম্ভব বলিয়া যুগলের সত্যিকার উপাধি আঢ্য এবার লিখাইতে হইলো। ঘৃণা ও লজ্জায় আমাদের সঙ্কুচিত প্রাণ যেন মরিয়া গেলো। মনে হইলো ধরণী দ্বিধা হও, তোমার ফাটলে মাথা গুজিয়া এ-দারুণ লজ্জার হাত এড়াই। অনুতাপের তীব্র অনলে তপ্ত-প্রাণ আমার বার বার মনে হইলো সামান্য

অসুবিধা এড়ানোর জন্য এমন অপকর্ম্ম কেন করিলাম। হাতে হাতে ধরা পড়িয়া সেদিন শিখিলাম—চোরাই মাল লইয়া সংসার পথে বেশী দূর আগানো অসম্ভব। সত্য আপনাকে একদিন প্রকাশ করিবেই করিবে। সংসারে চলার পথ মাত্র একটি। তা আপাত-মধুর সহজ সরল ছল চাতুরীর পথ নয়। তা হইতেছে আঁধার-ঘেরা, এবড়ো-খেবড়ো, আঁকা-বাঁকা, কাঁটা-বিছানো, সংকীর্ণ সত্যের পথ। অসত্যের মুখোশ পুরাপুরি খসিয়া পড়ার আগেই আমরা সেখান হইতে চম্পট দিলাম পরের গাড়ীতে কলিকাতার দিকে।

শেষ বিয়ের সম্বন্ধ

সাত আট মাস পর অগ্রহায়ণ মাসে লেফাপায় পোড়া দাদার একখানা চিঠি আমার বিয়ের এক পাকা সম্বন্ধের খবর লইয়া চাঁদপুর হইতে আসিলো। চিঠিতে দাদা লিখিয়াছেন—

কল্যাণবরেষু,

আগামী ১৩ই অগ্রহায়ণ উমেশ বাবুর মেয়ের সাথে তোমার বিবাহ ঠিক করিয়া পাঁচশো টাকা বায়না লইয়াছি। কাপড় চোপড় ও অন্যান্য বাবদ তোমার কতো লাগিবে, পত্র পাঠ জানাইবে। ইতি

আশীর্ব্বাদক—
তোমার দাদা

পত্র পাইয়াই ঢাকায় মেজদাকে তার করিলাম যেন পরের দিন গোয়ালন্দ ষ্টিমারের নারায়ণগঞ্জ পৌছার সময় তিনি

নারায়ণগঞ্জ ষ্টেশনে উপস্থিত থাকেন। কারণ সেদিনের ষ্টীমারেই আমার সাথে তাঁহাকে চাঁদপুর যাইতে হইবে। সে রাত্রেই আমরা উভয়ে চাঁদপুর পৌঁছিলাম। আগে কথা ছিলো মেজদাই সব কথা বলিবেন। কিন্তু দাদার কাছে তিনি একটি কথাও বলিলেন না, চুপ করিয়া রহিলেন। ফলে আমাকেই সব কথা বলিতে হইলো। আমার কথা শুনিয়াই দাদা অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া বলিলেন—ভদ্রলোকের কাছে আমায় অপদস্থ কর্ত্তে চাও নাকি? বায়নার টাকা যখন নিয়েছি তখন এ-বিয়ে হবেই হবে। দাদা রাগিলে আর আস্তে কথা বলিতে পারিতেন না। তাঁর গলার আওয়াজ শুনিয়া চারি দিকের লোক সেখানে আসিয়া জড়ো হইলো। অতি ধীর কণ্ঠে আমি তাকে বলিলাম—বিয়ে করা আমার পক্ষে অসম্ভব, এতে যতো অসুবিধা হোক্ না কেন আপনাদের। চোখ মুখ আরো লাল করিয়া দাদা বলিলেন—তোমাদের উপর আমার এতো স্নেহের প্রতিদান বুঝি তোমরা দিতে চাও আমায় এম্‌নিভাবে অপদস্থ করে। আগন্তুকদের ঠাট্টা উপহাস ও টিট্‌কারিতে সে ঘরের হাওয়া ভরিয়া উঠিলো। কিন্তু আমার রাগ হইলো না একটুও। সঙ্কল্পের গাম্ভীর্য্যে প্রাণ যেখানে ঠেসে ভরা, রাগের ঢেউ খেলার ফাঁক সেখানে কোথায়? তাই আরো বিস্ময়ের সাথে আমি বলিলাম—আপনার অপমান আমার বুকে বাজবে আপনার চেয়ে বড় কম নয়, কিন্তু প্রতিকারের পথ যেখানে রুদ্ধ, সব অপমানই সেখানে স'তে হবে বীরের মতো নীরবে, অসম্ভবের সাথ লড়াই করে নিজেকেই অনর্থক হয়রাণ হ'তে হয়। চারি পাশের লোকদের

গোলমাল আরো বাড়িলো। তাহারা বলিলো—এমন বেহায়াও হয়েছে আজ কালকের ছেলেরা। গুরুজনদের উপর তাদের মান সম্ভ্রম নাই মোটেও। রামের মতো বড় ভাইয়ের সাথে এমনি ব্যবহার করছে এরা। আগের গরম গরম কথার পর দাদা এতোক্ষণ চুপ করিয়া আপন মনে ভাবিতেছিলেন। তার মুখের লালচে ভাব ক্রমশই বদলাইয়া স্নিগ্ধ ও শুভ্র হইতেছিলো। শেষে করুণ-নয়নে আমার পানে খানিকক্ষণ চাহিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া আবেগের সাথে বলিলেন—এ-সংসারে অন্ধকারে হাতড়াচ্ছে বেশীর ভাগ লোকই, দু-এক জন শুধু চলতে চায় হাতে মশাল নিয়ে। আমার কথার গোড়ায় যে নিছক সংসারী গরজ, আর তোমার কথার মূলে যে নির্জ্জলা সত্য, একথা আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। এরপর দাদার প্রাণটা বোধ হয় বেশ একটু ছল-ছলিয়ে উঠিলো। ভিজা গলায় তিনি বলিলেন—সত্যের পথ রুদ্ধ ক'রে আমি মহাপাতকের ভাগী হ'তে চাই না। আশীর্ব্বাদ করছি তোমার সঙ্কল্প যেন দৃঢ় হয়, শেষ পর্য্যন্ত যেন তুমি এপথে চলতে পার—ছোট ভাই হোলে আমিও তোমার পিছনে ছায়ার মতন চলতে চেষ্টা কোরতাম। ভক্তি-শ্রদ্ধা-ভরা প্রাণে আমার নত মাথা তার চরণে ঠেকাইয়া সে-রাত্রেই কলিকাতা রওনা হইলাম।

এর পরই আসিলো যুগলের নূতন জন্মদিন। বুদ্ধকে তখন আমি মনে করিতাম শুধু ত্যাগের শান্তমূর্ত্তি। কিন্তু আমার প্রাণ তো তখন শুধু শান্তি চাহিতেছিলো না। প্রাণের ভিতর কর্ম্ম

প্রবৃত্তি গুলিও মাথা নাড়িয়া ঠেলিয়া উঠিতেছিলো। তাই কর্ম্মের অবতার শিবাজীর ছবিই এবার যুগলের হাতে তুলিয়া দেওয়া ঠিক্ করিলাম। কিন্তু এখন বুঝিতে পারিয়াছি শান্তি দু-রকমের। একরকম শান্তির উৎপত্তি হৃদয়ের সুপ্তি থেকে। এ হচ্ছে শ্মশানের শান্তি—মৃত্যুরই সামিল। এর দ্বারা জগতের কোন মঙ্গল সাধন অসম্ভব। আর এক রকম শান্তি আসে ভাবের গম্ভীরতা থেকে। এরূপ শান্তি যার প্রাণে, সে সংসারে টলেনা প্রচণ্ড আঘাতেও। বাহিরের ঝঞ্ঝা এর গায় আঘাত করিয়া নিজেরা হয় ছত্রছন্ন কিন্তু এ থাকে অচল অটল অভ্রভেদী হিমালয়ের মতো। বুদ্ধের শান্তি যে শেষ-ধরণের তা আরো বহু পরে কর্ম্মক্ষেত্রে ঢুকিয়া আঘাতের পর আঘাত খাইয়া বুঝিতে পারিয়াছি। তাই বাজার থেকে কিনিয়া আনিলাম শৈলদুর্গ থেকে অনুচরদের সাথে অশ্ব-পৃষ্ঠে নামিয়া আসা ছত্রপতির সে-চির-পরিচিত ছবিখানি। ফুলের মালা ও তোড়ায় তাহা সাজাইয়া দুই বন্ধুতে মিলিয়া স্নান-শেষে তাহার সমুখে প্রণাম করিলাম। তারপর তাহার সেই তেজোদীপ্ত চেহারার দিকে চাহিয়া চাহিয়া সারা দুপুর পড়িলাম তার একখানা জীবনী। তার জীবনের আদর্শ ও কর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা চলিলো অনেক রাত অবধি। সর্ব্বশেষে আশীর্ব্বাদ মাগিলাম তার কাছে, দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করার শক্তি দিতে, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত।

পৈতা ছেঁড়া

নানা কারণে মিকাডো ক্লাবে আর থাকা সম্ভব হইলো না। কাজেই থার্ড ইয়ারের পরীক্ষার পর আমরা উভয়ে

মিলিয়া কোন একটা নূতন মেসে সীট্ খুঁজিতে লাগিলাম। জানাশোনা সকল মেসের বন্ধুরাই যুগল সোনার বেণে শুনিয়া নাক সিট্‌কাইলো। আমার ভারী রাগ হইলো। ভাবিলাম, এ অত্যাচারের অবসান করিতেই হইবে। তা সম্ভব দু-প্রকারে। এক—যুগলকে ব্রাহ্মণের সমান উঁচুস্থান ঠেলিয়া তুলিয়া—নইলে, এ-সম্ভব না হওয়া পর্য্যন্ত, তার স্থানে নামিয়া একত্র হইয়া সংগ্রাম চালাইয়া। প্রথম পথ বর্ত্তমানে রুদ্ধ দেখিয়া আমি গলার পৈতা গাছটি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া শেষের পথ বাছিয়া লইলাম। পদবীও বদলানোর চেষ্টা করিয়াছিলাম দু-একবার। কিন্তু নানারূপ অসুবিধা দেখিয়া সেটা শেষ অবধি আগের মতোই বজায় রাখিতে হইলো।

সামাজিক বিপ্লবের অগ্রগতি

পরীক্ষার পরের ছুটীতে এবার আমি বাড়ী গেলাম। দেশ সেবার ভাব প্রাণের মাঝে ক্রমশঃই অধিক জাগিয়া ওঠায় এবার গ্রামের ছেলে পিলেদের সাথে মিশিতে লাগিলাম। তখনকার ভাব ছিলো এই—গ্রামে স্কুল, লাইব্রেরী, ডাক্তারখানা, হাসপাতাল, পুকুর, রাস্তাঘাট ইত্যাদি করার আছে অনেক কিছু কিন্তু কোনটিতেই হাত দেওয়া যায় না টাকার অভাবে। দেশ গরীব হইলেও এ-কয়টা কাজের আন্দাজ টাকা নাই এ-কথাও সত্য নয়। পূজা শ্রাদ্ধ বিয়ে প্রভৃতিতে গায়ের সাধারণ লোকেরা পর্য্যন্ত অনর্থক অনেক টাকা খরচ করে। এসব ব্যাপারে এদের কিছু কিছু দানেও দেশ টাকায় ছাইয়া যাইতে পারে।

তাই গাঁয়ের ব্যবসায়ী শ্রেণীর ছেলেদের সাথে মিশিয়া এবার তাদের এসব কথা বলিতে লাগিলাম। তাদের উৎসাহ স্রোতও দিনের পর দিন বাড়িয়া শেষে হইয়া উঠিলো ভাদ্রের পদ্মার মতো। এম্‌নি সময় তাদের একদিন বলিলাম—শুধু মুখে ভাই ভাই বল্লেই চলবে না। কাজকর্ম্ম আচার ব্যবহারের মাঝেও সে ভাব ফুটিয়ে তোলা চাই। নইলে যে এসবই হয়ে পড়ে একেবারে ফাঁকি—রূপকথার রাজকুমার ও রাজকন্যার মতো। তারা সতেজে বলিলো—বলুন না কি করতে হবে। আমি বলিলাম—আজ রাতে খেতে হবে সকলে বসে এক সাথে। আমার কথা শুনিয়া তাহারা যেন আকাশ হইতে পড়িলো। তাহাদের মুখ হইলো চুণের মতো ফ্যাকাশে—চোখ ছানাবড়া। বলিলো তাহারা—সে কি কথা মাঙ্গল দা, এ করলে যে জাত খোয়াতে হবে বাপ দাদাদের, পাপ হবে আমাদের সকলের। আমি বলিলাম জাত কি কারো গায়ে লেখা আছে? ব্রাহ্মণের চিহ্ন টিকি আমরা রাখিনা কোন কালে, আর এই দ্যাখ—পৈতাটা ছিড়ে ফেলেছি গলা থেকে, এখন ভিড়ে গেছি একেবারে তোদের দলে। শুনিলো না তবু তারা আমার কথা। আমার অনেকদিনের বক্তৃতার ফলে বিবেকানন্দের উপর তাদের অগাধ ভক্তি জন্মিয়াছিলো। আমি তাই তাড়াতাড়ি বিবেকানন্দের পত্রাবলী খুলিয়া তাদের কাছে পড়িলাম—ভগবান বলি চান, বলি—জীবন বলি, তাদের জন্য যাদের জন্য তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হন, সেই অত্যাচারিত উৎপীড়িতদের জন্য। এরপর আমি বলিলাম—এই অত্যাচারিত

তোরাই—যাদের আমরা যুগ যুগ ধরে পায়ের নীচে দাবিয়ে রেখেছি—যাদের ভাই বলা আমাদের পক্ষে শুধু মুখের কথা, নিছক ভণ্ডামী—যাদের বুকে টেনে নিতে পারি না—যাদের সাথে ভাই বলেও খেতে পারি না, ধর্ম্ম গোল্লায় যাবে, উল্কাপাতে সমাজ পুড়ে ধ্বংস হবে, ধূমকেতুর আবির্ভাবে বিষম বিপর্য্যয় দেখা দিবে। এমনি ধরণের আরো অনেক কথা তাহাদের বলিলাম। কথাগুলি আমার মুখে তপ্ত খোলার খইএর মতো ফুটিতে লাগিলো। প্রতি কথার সাথে বার-হওয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেন তাদের এতো কালের সংস্কার পুড়িয়া ছাই করিয়া ফেলিলো। তাহারা হাসিয়া বলিলো আজই খাইবে আমার সাথে। সেদিন রাতে সকলে মিলিয়া আমার-ই এক তিলী বন্ধুর বাড়ীতে খাওয়ার বন্দোবস্ত করিলাম। কথাটা বনের আগুনের মতো সারাগ্রামে ছড়াইয়া পড়িলো। আমার এই আজগুবী কাণ্ড কারখানায় গ্রামের সকলে হাড়ে হাড়ে চটিলো। সকলে মিলিয়া খাইতে বসিয়াছি এমন সময় তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে ছেলেদের আত্মীয়েরা সেখানে ছুটিয়া আসিলো এবং কাণে ধরিয়া তাদের সকলকে উঠাইয়া লইয়া গেলো। উঠানের মাঝে কারো কারো পিঠে দু-চারটা কিল্ চড়ও পড়িলো।

পরের দিন বাজারে গিয়া দেখি সকলে চটিয়া একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া আছে। আমাকে দেখামাত্র যার মুখে যা আসে বলিতে লাগিলো—যেন আমার এই খাওয়ার অপরাধ গরুচুরির পাপও ছাড়াইয়া গিয়াছে। ওকালতী ছাড়িয়া বুড়ো বয়সে ধর্ম্ম চর্চ্চায় মন দিয়াছেন আমার এমন এক গ্রাম্য জ্যেঠামশায়কে

এ-সম্বন্ধে তার মত জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি উৎসাহের সহিত বলিলেন—ঠিক করেছো তুমি, এ-রূপ করাইতো চাই, নইলে যে দেশ উঠবে না। কথাবার্ত্তা অনেক হবে, তাতে তুমি একটুও ঘাবড়িয়ো না, এ-রূপ কথা-বার্ত্তায় তোমার-ই পথ খুলবে।

সেদিন বিকালে সমাজপতিরা আমাদের বাড়ী জড় হইয়া কি করা যায় এখন আমাকে লইয়া এ-সম্বন্ধে বাবার সাথে পরামর্শ সুরু করিলেন। পরামর্শের যতোটুকু আমার কাণে পৌঁছিলো, তাতে বুঝিলাম, তারা বাবাকে বলিতেছেন—শাসন না করলে আমি বেড়ে যাবো, শেষে তাদের সমাজ সামলানো দায় হবে। আমাকে ডাকিয়া তাহারা বলিলেন—এ-গ্রামের আদর্শ ছেলে তুমি, ব্রাহ্মণের গৌরব তোমার ক্ষুণ্ণ করা উচিত নয়। আমি তাদের বলিলাম—ব্রাহ্মণের গৌরব ক্ষুণ্ণ হবে না আমার দ্বারা প্রাণ থাকতে। তাহারা বলিলেন—এরূপ কথাইতো তোমার মুখে সাজে, কিন্তু কাল খেলে যে সকলের সাথে, ব্রাহ্মণের গৌরব তাতে রইলো কি করে। আমি বলিলাম—খাওয়া না খাওয়ার বিচারে কোনো কালেও ব্রাহ্মণের গৌরব বাড়ে নাই, সত্যযুগের ঋষিরা সকলের সাথেই খেতেন, তাদের মুখ উজ্জ্বল হয়েছিলো ত্যাগ, প্রেম ও সেবায়। তাহারা একটু রাগিয়া বলিলেন—অতো শতো আমরা বুঝি না, সমাজের লোক আমরা, সমাজের প্রথাই আমাদের মেনে চলতে হবে। আমি বলিলাম—এ-করেই সমাজ উচ্ছন্ন গেছে, একে বাঁচাতে হলে এখন এর ভেতর নূতন ভাব ঢোকাতে হবে। তাহারা আরো চটিয়া বলিলেন—তুমি রঘুনন্দন নও যে তোমার কথাই

মান্‌তে হবে। আমিও একটু রাগিয়া বলিলাম—চব্বিশ বছরের আগে বিয়ে করায় এ-গাঁয়ের সবার ব্রাহ্মণত্ব ঘুচে গেছে, কেবল একা আমিই বাকী। এরূপ অনেক কথা কাটাকাটির পর ঠিক হইলো গাঁয়ের প্রসিদ্ধ পাঠক গুরুনাথ বিদ্যারত্নের মতই এ-বিষয়ে সকলের শিরোধার্য্য হইবে।

গুরুনাথ পাঠকের উল্লেখ এর আগেই করা হইয়াছে। পূর্ব্বে তিনি কাশীতে কথকতা করিতেন। সেখানে তার খ্যাতিও ছিল যথেষ্ট। এখন বয়স বেশী ও শরীর অসুস্থ হওয়ায় তিনি দেশেই থাকেন। তিনি খুব ভাল কথক ছিলেন বটে কিন্তু উপনিষদ্ গীতা প্রভৃতি তাহার পড়া ছিল খুবই কম, আর এসব বইয়ের অনেক শ্লোকই ছিল তখন আমার একেবারে কণ্ঠস্থ। তিনি আমায় স্নেহ-ও করিতেন খুব। তাই আমি সহজেই তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম যে উপনিষদ্ ও বেদান্তের আমলে আমাদের দেশে জাতিভেদ ছিলো না, সকল শ্রেণীর লোকের মাঝেই নির্ব্বিবাদে খাওয়া দাওয়া বিবাহ চলিতো। এ-জন্যই ভীমের হিড়িম্বা রাক্ষসীর সাথে ও অর্জ্জুনের উলুপীর সাথে বিবাহ সমাজে আটকায় নাই। আরো গভীর তর্ক বনে ঢুকিলে বিপদের আশঙ্কা দেখিয়া পাঠক মশায় আমার কথাতেই সায় দিলেন। এ-রূপেই আমাদের গাঁয়ে সকলে এক সাথে খাওয়ার সূত্রপাত হয়।

যক্ষ্মার কবলে

কোন কোন বিষয়ে প্রধান কয়েকজন মেম্বারের সাথে মতের অমিল হওয়ায় নড়িয়া হইতে ফিরার পর আমি ও যুগল মিকাডো

ক্লাব ছাড়িয়া দেই। আমাদের সহপাঠী আশুতোষ দাসের ৫৩নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে একটি মেস ছিলো। আমরা-ও সেই মেসে জায়গা লই। সেখানে যাওয়ার পর ধ্যান ধারণা ও শাস্ত্র পাঠ অনেক বাড়ে। কোন কোন রাত কাটিতো প্রাণায়ামে। উপনিষদ্ পড়ার ঝোঁক খুব বেশী বাড়ায় কলেজের ক্লাশের ফাঁকে ফাঁকে, ট্রামে চলিতে চলিতেও, পকেট হইতে বাহির করিয়া উপনিষদ্ পড়িতাম। এর পর একদিন কাশিতে কাশিতে আচমকা গলা দিয়া রক্ত বাহির হইলো। ডাক্তারেরা যক্ষ্মা মনে করিয়া তখনই বিছানায় শুইতে উপদেশ দিলেন। বিছানায় শোয়ার পর-ও সারাদিন ঝলকে ঝলকে রক্ত পড়িতে পড়িতে বালতি ভরিয়া গেলো। সন্ধ্যার ঠিক আগে একবারে এতো রক্ত পড়িলো যে আমার আশঙ্কা হইলো সে রাতও বোধ হয় কাটিবে না। সন্ধ্যার আঁধারের সাথে সাথে আমার চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া আসিলো। যুগলকে ডাকিয়া বলিলাম—মরার আগে ঐ বুদ্ধ ও শিবাজীকে সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা কর মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত সংগ্রাম করবে দেশের স্বাধীনতার জন্য। গত দুই জন্ম-তারিখে যুগলকে উপহার-দেওয়া বুদ্ধ ও শিবাজীর ছবি আমার ঘরের দেয়ালে টাঙ্গানো ছিল। যুগল মধুর দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া অতি করুণ কণ্ঠে আমার প্রস্তাবে রাজী হইলো। আমি তাকে বুকে টানিয়া লইয়া বলিলাম—মরতে আর আমার কোন অশান্তি নাই। মরার আগে অন্ততঃ জেনে গেলাম আমার আদর্শ কাজে রূপ দিতে অন্ততঃ একজন শেষ রক্তবিন্দু পাত করবে।

দেওঘর

বিধাতার লিখন ছিল অন্যরূপ, তাই তার পরের দিন থেকেই শরীর সারিয়া উঠিলো। পূজার ছুটিতে হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য যুগল আমায় লইয়া গেলো দেওঘর। মেজদা-ও আমাদের সাথে ছিলেন। আমরা দেওঘর স্কুল-বোর্ডিং-এ থাকিতাম। কৃষ্ণনগর থেকে হেমন্ত সরকার-ও তার বড় ভাই প্রফুল্লকে লইয়া সেখানে হাজির হইলো। প্রফুল্লর শরীর শোধরাণো ছিল তাদের সেখানে যাওয়ার উদ্দেশ্য। হেমন্তের ভাসা-ভাসা ডাগর চোখ, গোলগাল মুখ ও নিটোল দেহ আমাদের সবাইকে তার পানে আকৃষ্ট করিলো। .তার সাথে ভাব-ও খুব তাড়াতাড়ি জমিয়া উঠিলো। দেশ-সেবার কথা-ও তার সাথে কখনো কখনো হইতো। একসাথে মিলিয়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বই পড়া-ও আরম্ভ হইলো।

দেওঘর হইতে তিন চার মাইল দূরে রিখিয়া নামক স্থানে বাঙ্গালী ভদ্রলোকদের একটি সেটেল্‌মেন্ট ছিলো। তা দেখিতে আমরা একদিন সেখানে গেলাম। কোন কারণে আমাদের সাথে হেমন্তের যাওয়া ঘটিয়া উঠিলো না। ফেরার পথে—বেলা তখন প্রায় এগারটা—আমরা বিশ্রামের জন্য বসিলাম পাহা ঘেরা এক প্রান্তরের মাঝে বট গাছের তলায়। মিঠে রোদের মাঝে একটু একটু ঠাণ্ডা হাওয়া বহিয়া আসায় যুগল ঘুমাইয়া পড়িলো, খুব সম্ভব আমার হাঁটুর উপর মাথা রাখিয়া। দূর পাহাড়ের নীল কানাৎ ঘেরা নির্ম্মল আকাশের চাঁদোয়ার নীচে বসা আমার মন অজ্ঞাতে উধাও হইয়া চলিলো অসীমের পানে।

কি জানি কেমন একটা ভাব হইলো—কতকটা স্বপ্নের মতো—আমার মনে হইলো আমি যেন বসিয়া আছি একটি বিরাট আশ্রমের চারিদিক খোলা একটি প্রকোষ্ঠে। সেখান হইতে আশ্রমের সমগ্র রূপটি আমার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিলো। নানারকম ফুল ও ফলের গাছের মধ্যবর্ত্তী ছোট ছোট কুটীরে সাধনায় রত আশ্রমবাসিদের তেজোদীপ্ত মুখ দেখিয়া মনে হইলো দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্যই যেন তাদের এ-সাধনা। স্বপ্ন ছুটে যাওয়ার সাথে সাথে দেশসেবক তৈরীর জন্য একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প আমার মনে জাগিলো। সাথে সাথে মনে হইলো—এ-আশ্রমের প্রথম পরিচালক ও শিক্ষকমণ্ডলী সংগ্রহের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগাই হইবে এখন হইতে আমার প্রধান সাধনা। একটু পরেই যুগলের ঘুম ভাঙ্গিলো। আমার স্বপ্ন ও সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া তার উৎসাহ-ও খুব বাড়িলো। অন্ধকার মাঝে আমরা দুজনেই যেন পথ-দেখানো আলোক-রেখার সন্ধান পাইলাম।

হেমন্ত সরকার

এমনি উৎসাহ-ভরা প্রাণে দেওঘর ছুটিয়া গিয়া হেমন্তকে আমরা ঐ-কথা বলিলাম। দু-একটি কথা বলাতেই সে বুঝিয়া ফেলিলো আমাদের অন্তরের যতোকিছু ভাব—এমনি একসুরে বাঁধা হইয়াছিল কয়েকদিনের প্রাণখোলা দ্বিধা-সঙ্কোচশূন্য মেলা-মেশায় আমাদের হৃদয়-বীণার তন্ত্রীগুলি। সে এর পর থেকে আরো জোরের সাথে আমাদের সকল মন্ত্রণায় যোগ দিতে

লাগিলো। রিখিয়াতেই প্রথম আশ্রম-প্রতিষ্ঠা করিয়া নাম দিতে হইবে রিখিয়া মঠ, দু-এক দিনের আলোচনার ফলে এ-ও ঠিক হইলো। পুণার ফারগুসান কলেজের কথা-ই সকলের আগে মনে পড়িলো। কিন্তু তার সাথে সরকারের সংযোগই একটু খটকা বাঁধাইলো। স্বাধীনতা লাভই আমাদের উদ্দেশ্য, সুতরাং সরকারের সাথে সম্পর্ক রাখা সম্ভব নয় কোন মতেই—এ পরামর্শ ঠিক হওয়ায় আমাদের নজর পড়িলো হরিদ্বারের গুরুকুলের পানে। কলিকাতায় আসিয়া আমি ও যুগল বন্ধুদের কাছে আমাদের প্রাণের কথা খুলিয়া কহিলাম। আরো বলিলাম—আধা-আধি কাজ করে কোন-ই লাভ হবে না, বাড়ী ঘর ছেড়ে পুরোপুরি কাজে নেমে পড়তে হবে প্রায় সন্ন্যাসীর মতো, বিয়ে করা তো দূরের কথা। আমাদের এ প্রস্তাবে দ্বিধা জড়িত কণ্ঠে হাঁ না অনেকেই করিলো কিন্তু বুক টান করিয়া হাঁ করিলো না কেহ-ই। হেমন্তও কৃষ্ণনগর গিয়া ছেলেদের মাঝে এ-ভাব প্রচার করিতে লাগিলো। সে কলেজিয়েট স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িতো, ক্লাশের প্রথম ছেলে ছিলো, ছাত্রদের উপর প্রতিপত্তি-ও তার ছিলো যথেষ্ট, কাজেই একটি ছোট খাট দল সেখানে সহজেই গড়িয়া উঠিলো। দলের উদ্দেশ্য ছিলো অতি সহজ সারাজীবন বিবাহ না করিয়া, যথাসম্ভব পবিত্র জীবন যাপন করিয়া, স্বাধীনতা লাভের জন্য সকলে মিলিয়া চেষ্টা করা। জগদ্ধাত্রী পূজার সময় হেমন্ত আমাদের কৃষ্ণনগর যাওয়ার নিমন্ত্রণ করিলো। আমরাও সেখানে গেলাম। অনেক ছেলের সাথে আলাপ হইলো। কিন্তু একজনের কথাই বিশেষ

উল্লেখযোগ্য। তার নাম হেমেন্দু সেন। হেমন্তদের বাসার পাশেই ছিলো তাদের বাসা। রোগা পানা ছোট খাট ছেলেটি, চোখে চশমা, বয়সে হেমন্তের চেয়ে দু-এক বছরের ছোট, পড়িতো-ও বোধ হয় দু-এক ক্লাশ নীচে। দু-এক মিনিটের দেখাতেই তার সাথে ভাব জমিলো। তাহার গান শুনিয়া একেবারে অবাক্ হইলাম। এমন মন-ভোলানো গান জীবনে খুব কমই শুনিয়াছি। গান গাইতে গাইতে চোখের জলে তার সারা বুক ভাসিয়া যাইতো। আমাদের অশ্রু সংবরণও কঠিন হইতো।

শিমুলতলা

সেবার বড়দিনের ছুটিতে আমি ও যুগল শিমুলতলা গেলাম। শরীর তখন অনেকটা ভাল হইলেও ভয় কিছু কিছু ছিলো। তাই দু-তিনমাস পর এক-এক বার পশ্চিমের কোনো স্বাস্থ্যকর স্থানে হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য যাইতে হইতো। শিমুলতলা যাওয়ার দু-চার দিন পরেই যুগলের বাড়ী থেকে তার মার কঠিন অসুখের সংবাদ বহিয়া এক চিঠি আসিলো। যুগল চিঠি পড়িয়া একটু ভাবিলো, পরে বলিলো—যাই কি করে, এখানেও তো এক কর্ত্তব্য নিয়েই এসেছি। আমি-ও তাকে দু-চার বার যাইতে বলিলাম। কিন্তু সে গোঁজের মতো অনড় হইয়া রহিলো। সেখানে প্রতিসন্ধ্যায় আমরা বড় বড় বাগান হইতে গোলাপ ফুল তুলিয়া আনিয়া বিছানায় ছড়াইয়া দিতাম। পরে রাত্রে তাহার উপর

দুজনে মুখোমুখি হইয়া শুইয়া থাকিতাম। এমনি আপনা-আপনি ভাবে দিনগুলি কাটিতো। এ-সময় আমাদের কাপড়, জামা, জুতার কোন পার্থক্য ছিলো না। টাকা পয়সাও থাকিতো একসাথে আমারই কাছে। বইএর সামনের পাতায় লেখা হইতো ব্যানার্জ্জি এণ্ড আঢ্য। এমনি ব্যাকুলতা ছিলো দুজনের সকল বিষয়ে এক হইয়া গড়িয়া ওঠার।

৩নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট্

ফোর্থ ইয়ারের শেষে গ্রীষ্মের ছুটিতে আমি ও যুগল যাই মধুপুর। সেখানে প্রায় একমাস থাকি। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়াই ৩নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে একটি নূতন মেস খুলি। শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের বাড়ীটি ছিলো একতলা, চারিদিকে দুর্গন্ধ নর্দ্দমাদ্বারা বেষ্টিত, কতকটা অন্ধকার ও স্যাঁৎ স্যাতে। সেই বাড়ীতে স্বাস্থ্য মোটেই টিকিতেছিলো না। তাই এই পরিবর্ত্তন। ৩নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের বাড়ীটি তেতলা—ইহার উত্তরে কলেজ স্কোয়ার, দক্ষিণে অনেকটা ফাঁকা। গত পূজায় দেওঘরে থাকার সময় নীলরতন ধর ও তার দাদা জীবন রতন ধর, জ্ঞান ঘোষ, জ্ঞান মুখার্জ্জী প্রভৃতির সাথে দেখা হয়। তারা সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী-সন্তান—পি, সি, রায়ের ছাত্র এবং তারই মতো অনেকটা সাদা-সিদে ভাবে জীবন যাপনে অভ্যস্ত। দেশ সেবার ভাব-ও তাদের ছিলো যথেষ্ট। তাদের সাথে সেখানে আমাদের কতকটা ভাব হয়। সেই ভাবের ফলেই জীবন রতন ধরের সাথে মিলিয়া

৩নং-এর এই মেসের প্রতিষ্ঠা। জীবন ধর তখন মেডিক্যাল কলেজে পড়িতো।

সম্বলপুর

পরের ছুটিতে হেমন্ত বেড়াইতে গেল কটকে, আমি ও যুগল সম্বলপুরে। হেমন্তদের স্কুলের আগের হেড্-মাষ্টার বেণীবাবুর কটক বদলী হইয়া যাওয়াই হেমন্তের সেখানে যাওয়ার প্রধান কারণ। বেণীবাবু হেমন্তকে ভালবাসিতেন। কটকে গিয়া তিনি সুভাষ বসুকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। দুজনের মাঝে মিলন ঘটানোর উদ্দেশ্যেই বেণীবাবু হেমন্তকে কটক যাইতে লিখিলেন। দলে লোক ভিড়ানোর জন্য হেমন্তের রক্ত তখন উতলা। তাই সে বেণীবাবুর নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়া গেলো কটকে।

এখন থেকে নানা জায়গায় নানারকম ছেলের সাথে আলাপ হইতে লাগিলো। ফলে নানাস্থানে ছোট ছোট দলও গড়িয়া উঠিলো। সকল জায়গার ও লোকের উল্লেখ এই গ্রন্থে অসম্ভব। শুধু যাদের সাথে পরে সম্পর্ক রহিয়াছে কিংবা যারা তখনকার কাজে খুব সহায় ছিলো, শুধু তাদের নামেরই প্রয়োজন মতো উল্লেখ এখানে করা হইবে।

গিরীশ ব্যানার্জ্জি

গিরিশ ব্যানার্জ্জি তখন কটক কলেজের সেকেণ্ড ইয়ারে পড়িতো। ছেলে খুব বুদ্ধিমান হইলেও রোগীর সেবা করিতে

করিতে ও ছেলেদের পিছনে ঘুরিতে ঘুরিতেই তার দিনের প্রায় সবগুলি ঘণ্টা কাটিতো। তাই বছরের পর বছর তার সেকেণ্ড ইয়ারের অভিজ্ঞতাই বাড়িলো কিন্তু পরীক্ষা পাশের সিঁড়ি বাহিয়া থার্ড ইয়ারে ওঠার সৌভাগ্য আর ঘটিলো না। সারা জীবনে অনেক লোক দেখিয়াছি কিন্তু গিরীশের মতো আর একটি প্রাণ দেখিব কিনা সন্দেহ। হাঁপানির ব্যামো তার প্রায় বারো মাসই লাগিয়া থাকিতো। কিন্তু প্রাণে যার আগুন, ব্যামো ট্যামো কি তার পথ আগলাইতে পারে। তাকে কেন্দ্র করিয়া কটকে যে কর্ম্মীদল গড়িয়া উঠিয়াছিলো সুভাষ বসু, নৃপেন বসু, অন্নদা চৌধুরী প্রভৃতি তাদের মধ্যে প্রধান। হেমন্ত আমাদের বাণী বহিয়া লইয়া গেলো কটকে এই ছেলেদের মাঝে। আজ কালকের ছেলেদের কাছে এ-বাণী হয়তো নিতান্তই সেকেলে ঠেকিবে কিন্তু তখন ছিলো এ খুবই নূতন। সারা জীবন অবিবাহিত থাকিয়া দেশ স্বাধীন করার সঙ্কল্প গ্রহণের কথা তখন শুনা যাইতো খুব কম ছেলেরই মুখে। তাই তাদের প্রাণে নূতন আগুন জ্বলিলো।

অরুণোদয় প্রামাণিক

আমাদের সম্বলপুর যাওয়ার কথা শুনিয়া কৃষ্ণনগর স্কুলের ছেলে অরুণোদয় প্রামাণিক-ও পূজার ছুটিতে সম্বলপুর গেলো। হেমন্তের কাছে সে-ও আমাদের কথা শুনিয়াছিলো। সেখানে তার জ্বর হওয়ায় আমি তার একটু আধটু সেবা করিতাম এবং এই সেবার মাঝেই তার সাথে আমাদের ভাব ঘনাইয়া উঠে। সে

থাকিতো সেখানকার স্কুল বোর্ডিংএ। তাই তার মারফৎ সেখানকার অনেক ছেলের সাথে আমাদের আলাপ হইলো। সম্বলপুরের কাছে ঝোপ জঙ্গলে ঘেরা একটি ছোট পাহাড় ছিলো। সেখানে প্রতি বিকালে মিলিয়া আমরা বিবেকানন্দের বই পড়িতাম। সাথে সাথে আমাদের উদ্দেশ্যের কথা-ও সকলকে খুলিয়া বলিতাম। দেশের হাওয়া তখন ছিলো একটু অন্য রকমের। তাই আমাদের একটু উপরের থাকের মানুষ মনে করিয়া এরা আমাদের কথা মানিয়া লইতো প্রায় বেদান্তের বাক্যের মতো। আমাদের কথা শুনিয়া উৎসাহে তাদের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিতো। তর্কের তারা কোন ধারই ধারিতো না। শুধু বলিতো—হাঁ, এমনি করেই সবার তৈরী হ'তে হবে।

কৃষ্ণনগরের হেমেন্দুর বাবা আবগারী বিভাগে কাজ করিতেন। কিছুদিন পরে তিনি বদলী হইয়া গয়ায় যান্। সেখানে অল্পকাল মধ্যে কয়েকটি ছেলে লইয়া হেমেন্দু একটি দল গড়িয়া তোলে। তাদের মধ্যে রাধিকার নামই একমাত্র উল্লেখ যোগ্য।

এখন থেকে এ-সব জায়গার ছেলেরা আমার কাছে চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিলো। এ-সব চিঠির উত্তরে দুটো জিনিষের উপরই আমি বেশী জোর দিতাম। প্রথম ব্রহ্মচর্য্য, দ্বিতীয় ধ্যান-ধারণা। সত্যিকার দেশ সেবা যে কতো কঠিন, এ-ধারণা তখন স্পষ্ট না থাকিলেও, সারা জীবন বিবাহ না করিয়া পবিত্র থাকিতে হইলে এ-দুটোর উপর যে বিশেষ জোর দেওয়া দরকার, সে-সম্বন্ধে আমাদের কারো কোন সন্দেহ ছিলো না! এ-পথে আমার চলা সুরু হইয়াছে মাত্র কয়েকদিন আগে। এ-সব বিষয়ে আমার

অভিজ্ঞতা তখনো খুব কম, অথচ দায়ে পড়িয়া বলিতে ও লিখিতে হইতো বড় বড় কথা। যাদের কাছে চিঠি লিখিতে হইতো, তাদের বয়স আমার চেয়ে অনেকেরই কম হইলেও, তাদের অধিকাংশই ছিলো বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিমান কৃতী সন্তান। আমার উপদেশের উপর এদের ভবিষ্যৎ জীবনের অনেক খানি নির্ভর করে, এ-দায়িত্ববোধই আমায় সর্ব্বদা আমার লেখার বিষয় সম্বন্ধে সাবধান করিতো। তখনো আমি মার ধ্যান করিতাম। রামকৃষ্ণ কথামৃত পড়িয়া মার উপর বিশ্বাস ক্রমশঃই অধিক গভীর হইতেছিলো। চিঠি লেখার আগে একান্তে বসিয়া চোখ বুজিয়া মাকে বলিতাম—দেখ্, এরা সব ভালো ছেলে, আমার উপর এদের এতো বিশ্বাস, বেফাঁস কথা আমার মুখ দিয়ে বের করিসনে কিন্তু, তুই যা বল্‌বি তাই লিখবো, তোর কথা না শুনে একটি অক্ষরও লিখবো না। অনেক সময় দিনের পর দিন এ-ভাবেই কাটিতো। কোনো চিঠিই লেখা হইতো না। তারপর প্রাণের মাঝে কোনো বাণী শুনিলে, চিঠিতে তাই লিখিয়া দিতাম।

যুগলের মনুষ্যত্ব

সে-বছর এপ্রিলে যুগল শেষ এম্-বি পাশ করে। বরাবরের ভালো ছেলে সে, তার ফল ভালই হইলো। তখনকার প্রিন্সিপ্যাল কর্ণেল ডিয়ার তাকে মেডিক্যাল কলেজের জুনিয়ার হাউস্ ফিজিসিয়ানের চাকরি দিলেন। চাকরি পাওয়ার সময় যুগল কার্সিয়াং-এ ছিলো। কার্সিয়াং হইতে ফিরিয়া আসিয়া সে প্রিন্সিপ্যালের সাথে দেখা করিতে যায়। প্রিন্সিপ্যাল তাকে

লিখিয়া পাঠান, রোগী থাকিলে সে তখনই দেখা করিতে পারে, নইলে পরের দিন যেন সে সকালে হাসপাতালে দেখা করে। স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত সে, বিদেশী প্রিন্সিপ্যালের এতোটুকু তাচ্ছিল্য বরদাস্ত করিতে না পারিয়া, রাগ ও অভিমানের ঝোঁকে চাক্‌রিতে ইস্তফা দিয়া হাসিতে হাসিতে মেসে আমার কাছে আসিয়া হাজির হইলো। তাহার কথা শুনিয়া আমি যেন আকাশ হইতে পড়িলাম। যুগল এম, বি পাশ করিয়া কলিকাতায় ভাল প্র্যাক্‌টিস্ জমাইয়া আমাদের সঙ্কল্পিত প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে অর্থ সাহায্য করিবে—আমার এতোদিনের এ-স্বপ্ন এক নিমেষে ভাঙ্গিয়া চুরমার হইলো। সাথে সাথে ভবিষ্যতে কি ভাবে কাজ করা সম্ভব হইবে, সে-কথাও মনে উপস্থিত হইতে লাগিলো। সে-সব ভাবী সমস্যার চিন্তা চাপা দিয়া আমি তাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—সে এখন কি করিতে চায়, তার বাড়ীর খরচইবা চলিবে কিরূপে? কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে চারু বোস্ প্রভৃতি কয়েকজন ডাক্তার মিলিয়া কলিকাতায় একটি ভালো ল্যাবরেটারী করার চেষ্টায় ছিলো। তাদের সে-কাজে সে-ও যোগ দিবে, এ-কথা সে আমায় বলিলো। আরো বলিলো—দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় ছেলেদের পরীক্ষা পাশ করা যতো সহজ, মান সম্মান বজায় রাখিয়া চাকরি করা ততো সহজ নয়, একথা-ও সে বাড়ী গিয়া মাকে বলিবে। ডাক্তারী করিয়া পয়সা কামানো সম্ভব না হইলে, সে বরং রাস্তার মুটে হইবে, তবুও বিদেশীর চরণতলে মাথা নোয়াইয়া সেলাম ঠুকিয়া চাক্‌রি বজায় রাখিতে পারিবে না। তার এ-সব কথা শুনিয়া আনন্দে আমার প্রাণ

নাচিয়া উঠিলো। মনে হইলো আমাদের এতোদিনের মেলামেশা ছাইয়ের ঢিবিতে জল ঢালার সমান হয় নাই। এ-সব আলোচনা চলিতেছিলো, এমনি সময় একজন ডাক্তার আসিয়া আমাদের খবর দিলো, দৌলতপুর কলেজে বোটানীর প্রোফেসারের পদ খালি হইয়াছে, যুগল চাহিলে এখনই তাহা পাইতে পারে। সেদিনই যুগলের সে-চাকরি ঠিক্‌ হইলো, মাইনে মাসে একশো টাকা।

সুভাষ বসু

কটক হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষার পর কলিকাতা পৌছিয়াই সুভাষ ৩নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের মেসে আসিলো। হেমন্তের সাথে তার আলাপ হওয়ার পর হইতেই আমার সাথে তার রীতিমতো পত্র লেখালেখি চলিতেছিলো। তাই কয়েকদিনের উৎসুক প্রতীক্ষার পর হঠাৎ তাঁকে দেখিয়া প্রাণ আনন্দে ভরিলো। সে যে কালে বড় হইবে, এ-কথা প্রথম দেখার সময় হইতেই আমার মঁনে জাগিয়াছিলো। এ-কথা আমি অন্যান্য সকলকে বহুবার বলিয়াছি-ও। তাকে ৩নং-এ আমার ঘরে আসিতে দেখিলে পাশে-বসা সাথীদের অনেক সময় বলিতাম—Look the lion comes—এমনি তেজালো তখন তার চোখ মুখের ভাব ছিলো। ৩নং-এ আসার পর হইতেই বাড়ীর কথা সুভাষ ভুলিতে লাগিলো। অনেক সময়ই সে পড়িয়া থাকিতো আমার কাছে। বলিয়া কহিয়াও বাড়ী পাঠানো মুস্কিল হইতো। তখন তার ধর্ম্মের ভাবই ছিলো প্রধান, কর্ম্মের ভাব গৌণ। কর্ম্মের দিকে

মাথা ঘামাইতেই চাহিতো না। আমাদের ক্লাশের আশুতোষ দাস আমার পাশের ঘরেই থাকিতো। আশু সুভাষকে একদিন কি জানি কি কাজের কথা বলিতেছিলো। আশুর কথা শুনিয়া কাঁদ কাঁদ মুখে সুভাষ আসিয়া আমায় বলিলো—সুরেশদা, আমায় নাকি কাজ করতে হবে। আমি তাকে সান্ত্বনার সুরে তাড়াতাড়ি বলিলাম—না, না, কে বল্লে তোমায় কাজ করতে হবে—ভগবান লাভেই তোমার সারাজীবন কাটবে। আমার কথা শুনিয়া সে ভারী খুসী হইলো—তার কাঁদ কাঁদ ভাব দূর হইলো—এমনি সহজ সরল ছিলো তখন তার প্রাণ।

মুর্শিদাবাদ ভ্রমণ

কুচবিহারের গুরুদাস এর মধ্যে এম,এ পাশ করিয়া নড়াইল কলেজের প্রোফেসার হইয়াছে। বাংলার অতীত কীর্ত্তি দেখার জন্য আমাদের কয়েকটি সাথীর মুর্শিদাবাদ যাওয়া ঠিক হইলো। আমি, যুগল, গুরুদাস ও সুভাষ কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া কৃষ্ণনগর গেলাম। সেখান থেকে হেমন্তকে সাথে লইয়া নবদ্বীপ গিয়া যুগলদের এক ঠাকুর বাড়ীতে উঠিলাম। যুগলদের আগের অবস্থা খুব ভাল ছিলো। এই ঠাকুর বাড়ীটি সে-সময়ের প্রতিষ্ঠিত। ব্যবসায় ফেল্ হওয়ায় হালে তাদের অবস্থা খারাপ হইলে-ও আগের বরাদ্দ হইতেই ঠাকুর বাড়ীর খরচ চলিতেছে। নাদুস-নুদুস বাবাজী মশায়ের সেবা দাসী তিনটিকে দেখিয়াই আমার মেজাজ তাতিয়া উঠিলো। অনেক কষ্টে বহুক্ষণ মনের আগুন কোনরকমে চাপিয়া চুপিয়া রাখিলাম বটে, কিন্তু খাওয়ার

সময় তরুণী সেবাদাসীটিকে কাছে আসিতে দেখিয়া নিজেকে আর সামলাইতে পারিলাম না। রাগিয়া তার মুখের উপরই বলিলাম—ধর্ম্মের নামে বাড়ী ঘর ছেড়ে এসে এখানে বুঝি বেশ্যাগিরি করা হচ্ছে। বাবাজী কাছেই দাঁড়ানো ছিলেন। আমার কথা শোনা মাত্র তিনি একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। ফলে আহার শেষেই তল্পী তল্পা গুটাইয়া সেখান হইতে বিদায় লইতে হইলো। সন্ধ্যার পর নৌকায় খড়ে নদী বাহিয়া কৃষ্ণনগর ফিরিতে আমাদের বেশ বেগ পাইতে হইয়াছিলো। মাঝিটি একটু আনাড়ি হওয়ায় আমাকেই শেষে ধরিতে হইলো হাল আর যুগল, সুভাষ ও হেমন্তদের টানিতে হইলো গুণ। আগের অভ্যাস থাকায় আমার কোনো কষ্ট-ই হয় নাই। কিন্তু গলদ-ঘর্ম্ম হইতে হইয়াছিল সুভাষকেই সবচেয়ে বেশী। বড়-লোকের ছেলে, সোণার চাঁদের মতো চেহারা, ছোটকাল অবধি আদর আহ্লাদের মাঝে লালিত-পালিত, দুঃখের আঁচড় গায়ে লাগে নাই যে কখনো।

হরিপদ চট্টোপাধ্যায়

পথে অমূল্য উকীল আসিয়া আমাদের সাথে জুটিলো। অমূল্য আমাদের সাথেই পড়িতো। আমাদের দলে ভিড়ানোর জন্য অনেক টানাটানিও করিয়াছিলাম, খানিকটা ঝুঁকিয়াও ছিলো—কিন্তু পূরাপূরি নয়। এরপর আমরা পলাশী ও বহরমপুর হইয়া মুর্শিদাবাদ যাই। সেখানেই প্রথম হরিপদের সাথে দেখা। হরিপদ কৃষ্ণনগরের ভূতপূর্ব্ব সরকারী উকীলের ছেলে। তার

পিতার মৃত্যুর পর সে তার জ্যেঠামশায়ের বাসায় থাকিয়া মুর্শিদাবাদ স্কুলে সেকেণ্ড ক্লাশে পড়িতো। সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকিলেও আমাদের কথা হেমন্তর কাছে সে অনেক শুনিয়াছে। আমাদের কাছে পাইয়া তার আনন্দ প্রাণে যেন আর ধরে না—চোখমুখে ছলছলিয়ে উঠিলো। অথচ—তার বয়স কাঁচা, থাকে পরের বাসায়। তাই কোথায় রাখিয়া আমাদের সকল রকম সুখ সুবিধার সুবন্দোবস্ত করিবে তা লইয়া তার মনের চঞ্চলতা-ও সে-আনন্দের মাঝে স্পষ্ট ফুটিয়া বাহির হইতেছিলো। তার চঞ্চল ভাবে এধার-ওধার ঘোরা-ফেরা দেখিয়া আমার ভারী দুঃখ হইলো। বলিলাম—কেন এতো ছুটাছুটি কোরছো, আমাদের জন্য এতো ব্যস্ত হওয়ার কোনো দরকার নাই, গাছের তলায় বসে গল্প করতে করতেই সারা রাত কেটে যাবে। কিন্তু দেখিতে দেখিতে আকাশ ভাঙ্গিয়া মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হওয়ায় আমাদের সে-সুখস্বপ্ন দূর হইলো। বাধ্য হইয়াই আমাদের আশ্রয় লইতে হইলো মোক্তার লাইব্রেরীর ছোট একটি কামরায় ঝড় বাদলে-ও হরিপদের চঞ্চল চিত্ত শান্ত হইলো না। ঝড়বৃষ্টি মাথায় করিয়াই সে আমাদের খাওয়ার বন্দোবস্ত করিতে বাজারে গেলো। আমরা কতো বারণ করিলাম, কিন্তু আমাদের কথায় সে কান-ও দিলো না। তারপর দিন আমাদের মুর্শিদাবাদের পুরা কীর্ত্তিসমূহ দেখিতে কাটিলো। সেখান থেকে আমরা যাই রাণী ভবানীর কালীবাড়ী দেখিতে বরাহনগরে। প্রত্যেক ঐতিহাসিক জায়গায় বসিয়া আমরা নিখিলনাথ রায়ের মুর্শিদাবাদের কাহিনী পড়িতাম। জগৎ শেঠের ষড়যন্ত্রের ইতিহাস এবং সিরাজদ্দৌলা

রাণী ভবানীর মেয়ের উপর অত্যাচারের চেষ্টার কথা পড়িয়া শুধু মনে হইতো কেন এদের এ-দুর্মতি হইলো—নইলে বাংলার ইতিহাস আজ হয়তো অন্য অক্ষরে লেখা হইতো।

১৯১৩-এর জুন-জুলাই

কলেজ খোলার দিন নিকটবর্ত্তী। শৈলেন ঘোষ—যে এখন আমেরিকার যুক্তরাজ্যে আছে এবং যাকে ভারতে আসিতে দেওয়া হইতেছে না—একদিন আসিয়া আমার বলিলো—কাল সকালে বিধু আসবে—সে প্রেসিডেন্সী কলেজে ' ড়বে ও হিন্দু হোষ্টেলে থাকবে, হোষ্টেলে যাওয়ার আগ পর্য্যন্ত তাকে ৩নং এ-ই রাখতে হবে। শৈলেন ঘোষ তখন খুব সম্ভব প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িতো। তার এক দাদা কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। কৃষ্ণনগরের কাজ কর্ম্ম সম্বন্ধে হেমন্তের সাথে তার কিছু যোগাযোগ ছিল। কাজকর্ম্ম লইয়া আমার সাথে-ও তার মাঝে মাঝে আলাপ হইতো। পরদিন সকাল প্রায় আটটায়, একা মেসে বসিয়া আছি, এমন সময় বিধু আসিয়া উপস্থিত হইলো। কালো রোগা-পানা চেহারা, মুখে ঈষৎ হাসি, গায় একটি আধ-ময়লা সার্ট এবং হাতে একখানা কাপড়।, তাহাকে দেখিয়াই আমার মুখ হইতে আপনা-আপনি বাহির হইয়া আসিলো—আয়। এই এক কথায়ই সে মুহূর্ত্ত-মাঝে আমার আপন হইয়া গেলো। বিধুর কথা হইতে বুঝিলাম সে কটক হইতে আই, এস্, সি পাশ করিয়াছে, বি, এস্, সি পড়িবে। এরপর শশাঙ্ক, যোগেন, নৃপেন প্রভৃতি আরো অনেক ছেলে

কটক হইতে আসিলো। এরা সকলেই বিধুর সহপাঠী। শশাঙ্কের বাবা কটকে ওকালতি করিতেন। যোগেনের বাড়ী ফরিদপুর। স্বাস্থ্য ভাল নয় বলিয়া সে কটকে পড়িতো। শশাঙ্ক বিনা দ্বিধা সঙ্কোচেই আমার কাছে আসিলো এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমার সাথে যতোটা সম্ভব মিশিয়া গেলো। কিন্তু যোগেন এতো সহজে আসিলো না। বিধু, শশাঙ্ক আসিতে বলিলে বলিতো—কেন যাইবো তার কাছে ? বলিতো বটে, কিন্তু মন প্রবোধ মানিতো না। এরা ৩নং-এ আসিলে পর সে কলেজ স্কোয়ারের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে দাঁড়াইয়া আমার ঘরের পানে চাহিয়া থাকিতো। আর আমার কাছে আসার জন্য তার প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিতো। শেষে সে আসিলো। শুধু আসিলো নয়, আমাদের দলের সমস্ত কাজের ঝুঁকিই স্বেচ্ছায় মাথা পাতিয়া লইলো। ক্রমশঃ সে হিন্দু হোষ্টেল ছাড়িয়া তিননং-এ-ই থাকিতে লাগিলো। নৃপেন স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলো। হেমন্ত এণ্ট্রান্স পাশের পর কৃষ্ণনগর কলেজেই পড়িতে লাগিলো। নড়াইলের জ্যোতির্ম্ময় ঘোষও প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হইয়া হিন্দু হোষ্টেলে থাকা ঠিক করিলো। শুভাষ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় দ্বিতীয় হইলো। প্রথম হইলো প্রমথ সরকার। সেও কিছুদিন পর ৩নং-এর দলে আসিয়া ভিড়িলো। এদের সকলের প্রাণপণ চেষ্টায় বিভিন্ন কলেজের অন্যান্য ছেলেরাও দল বাঁধিয়া ৩নং-এ আসিতে লাগিলো। এমনিভাবে ৩নংকে কেন্দ্র করিয়া ছাত্র সমাজে একটি প্রকাণ্ড দল গড়িয়া উঠিলো। আমার বিশ্বাস

আঠারো উনিশ জন লোক ছোট বড় জখমে ভুগিতেছিলো। তাদের চিকিৎসার ভার পড়িলো আমাদের উপর। তারকেশ্বরের মোহন্তের দোতলা এক বাহিরের ঘরে হাসপাতাল করিয়া ইহাদের রাখার বন্দোবস্ত হইলো। মোটা ভুড়িওয়ালা, নেশায় ঢুলু ঢুলু মহান্ত মহারাজের মুখে বন্যায় ঘাস নষ্ট হওয়ায় দুধের অভাবে তার ছেলে পিলেদের বড্ড কষ্ট হইতেছে শুনিয়া আমার পিলে চমকিয়া উঠিলো। সংসারের গূঢ় রহস্যে তখনো অনভিজ্ঞ আমার কাছে মোহান্তের বিয়ে ও ছেলে পিলে হওয়ার কথা ঠেকিলো একটা নূতন আবিষ্কারের মতো।

একটানা রোগীসেবা ক্রমশঃ অপছন্দ হইয়া আসায়, আমি একদিন মেট্রোপলিটন কলেজের একদল ছেলের সাথে রওনা হইলাম আবার গাঁয়ের দিকে। এই দলের সাথে তাদের কলেজের একজন প্রফেসারও ছিলেন। পথে তিনি আমায় বরণ করিলেন, জানিনা কেন, দলপতির পদে। সকালে তারকেশ্বর হইতে রওনা হইয়া আমরা দুপুরে পৌঁছিলাম গন্তব্য স্থানের মাঝ-পথে এক মুসলমান পল্লীতে। ক্ষুধার চিন্‌-চিনে জ্বালা পেটে লইয়া আমি ও ধীরেন গুপ্ত নামে মেডিক্যাল কলেজের আর একটি ছেলে যাইতেছিলাম কাছেরই এক ঘাট-বাঁধানো পুকুরে নাইতে। পথে একখানা খড়ো ঘর থেকে পেঁয়াজের আমেজ-দেওয়া খিচুড়ির মিষ্টি গন্ধ আমার নাকে আসিলো। মনে বড় লোভ হইলো, সোণালী রংএর সেই খিচুড়ির এক গ্রাসও যদি মুখে দেওয়া যাইতো। স্নান-শেষে ফেরার পথে আমায় দেখিয়া সেই ঘরের বারান্দা থেকে যোগেন চীৎকার করিয়া

বলিয়া উঠিলো—কি সুরেশদা, কোত্থেকে এলে, খিচুড়ি খাবে নাকি—বলিয়াই ছুটিয়া আসিয়া জড়াইয়া ধরিয়া আমায় সেই ঘরে লইয়া গেলো। পিছনে পিছনে ধীরেনও চলিলো।

খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া আবার সেখান হইতে রওনা হওয়া গেলো। আমার বিশেষ অনুরোধে যোগেনকে ও আমার সাথে যাইতে হইলো। আমি, যোগেন ও দলের আর সকলে রওনা হইলাম হাঁটা-পথে। চাউলের বস্তা-বোঝাই নৌকায় ধীরেন নদী বাহিয়া চলিলো। সন্ধ্যার অনেক পরে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়া দেখি দালান-ওয়ালা এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে আমাদের খাওয়া-দাওয়ার সব বন্দোবস্ত প্রস্তুত। দশটা অবধি ধীরেনের জন্য অপেক্ষা করিয়া আমরা খাওয়া সারিলাম। আকাশে কালো মেঘ ক্রমশঃই বেশী ঘনাইয়েছে দেখিয়া মনটা একটু চঞ্চল হওয়ায় আমি ও যোগেন গেলাম ধীরেনের খোঁজে নদীর ধারে। রাত দুপুর, তবু ধীরেনের কোনো পাত্তা নাই। মেঘে আকাশ একেবারে কালো হইয়া গেলো। দু-এক ফোঁটা বৃষ্টি-ও পড়িতে লাগিলো। মনে ভারী চিন্তা হইলো—বেবাক চাল ভিজিয়া বুঝি মাটী হইয়া যায়। একটু পরেই ধীরেন আসিলো। আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম—যাও ধীরেন, তাড়াতাড়ি চারটা খেয়ে এসো। সে ঈষৎ হাসিয়া বলিলো—কাজ না সেরে কিসের খাওয়া? সেই তরল আধারের অস্পষ্টতায় ঝাঁকড়া চুলের নীচে তার নিটোল শুভ্র মুখখানিতে ফুটে-ওঠা কর্ত্তব্যের সুমোহন রূপ সেই নিঝুম রাতের নিস্তব্ধতার মাঝে আমায় অভিভূত করিলো। আর কোন কথা না বলিয়া আমরা চাউলের বস্তাগুলি খানিক দূরে একটা

আটচালায় বহিয়া নিতে শুরু করিলাম। দু-মনী চাউলের বস্তাগুলি লইয়া আমাদের টানা হ্যাঁচড়া করিতে দেখিয়া বাবরীওয়ালা জনৈক সন্ন্যাসী ছুটিয়া আসিয়া হাসিমুখে বলিলো—এ কি আপনাদের কাজ, দিন চাপিয়ে আমার ঘাড়ে। সে অতি সহজে দুমনী বস্তাগুলি একাই বহিয়া নিলো। আমরা কোনো মতে একমনীগুলি নিলাম। চাল নেওয়া শেষ হইলে, চিন্তার বোঝা বুক থেকে নামিয়ে যাওয়ায়, অনেকটা হাল্কা প্রাণে আমরা গিয়া বসিলাম সামনের ছোট একটা পুকুরের বাঁধা-ঘাটের জল-ছোঁয়া নীচের ধাপে। গুণ্ গুণ্ গান প্রথম থেকেই সন্ন্যাসীর মুখে চলিতেছিলো। এখন তা একেবারে প্রাণ-খোলা উদাও সুরে বাহির হইলো। আকাশের মেঘ অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে। মিঠে জ্যোৎস্নায় তখন সারা আকাশ ছাওয়া। পূব গগনে প্রভাত-তারাটি আমাদের চোখের সামনে দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছিলো। দখিনে মিষ্টি হাওয়া গায়ের উপর স্নেহশীতল হাতখানি বুলাইয়া ধীরে ধীরে বহিতেছিলো। আর এ-সবের সাথে সুর মিলাইয়া গাওয়া সন্ন্যাসী ঠাকুরের বৈষ্ণব পদাবলী শুনিয়া আমার মনে হইতেছিলো—সংসারে সবই যেন একই সুরে গাঁথা, সকলে মিলিয়া যেন একটি মহা ঐক্যতানের সৃষ্টি করিয়াছে।

ভোর হওয়ার সাথেই চাউল বিলী সুরু হইলো। নানাকাজে ব্যস্ত আমার পাশে দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর সারাদিন শুধু বৈষ্ণব গান গাহিলেন। অনাহার ও অস্নাত অবস্থায়ই সে দিন কাটিলো। কিন্তু সে-জন্য একটু-ও কষ্ট হইলো না। সারাদিন ধরিয়া মন যেন নাচিতেছিলো সে-গানের তালে তালে।

সাঁঝের আধার চারিদিকে নামিয়া আসার সাথে সাথে দিনের কাজের বোঝা ঘাড় হইতে নামার পর আমরা গেলাম আগে থেকে পাকের বন্দোবস্ত করিয়া রাখা এক মুসলমানের বাড়ীতে। সেখানে পৌঁছা মাত্রই কি জানি কেমন একটা ভাব হইলো। মনে হইতে লাগিলো আমার হাল্কা দেহ বুঝি এরোপ্লেনের মতো এখনই আকাশে উড়িয়া যাইবে। সহজভাবে চলা অসম্ভব হওয়ায় আমি প্রায় ছুটে ছুটে লাফিয়ে লাফিয়ে চলিতে লাগিলাম। শরীরে এতো শক্তি অনুভব হইলো যে জলে-ভরা বড় বড় কলসীগুলি-ও অনায়াসে ঘাটপার হইতে হাতে তুলিয়া লইয়া আসিলাম। তার পর এমনি একটি অবস্থা হইলো যে—মনে হইলো পুকুরের জল, গাছের পাতা, বাড়ীর উঠান, চারিপাশের লোক সবই যেন নাচিতেছে—আকাশের তারার হাসির মাঝে, বনে মিটমিট্ করে জলা জোনাকী পোকার আলোয়, যেন সে নৃত্য রূপ পাইয়াছে। আমার ভাবের ছোঁয়াচ বন্ধুদের রক্তে-ও খানিক লাগায় তাদের মনের ভাব-ও কতকটা এরূপ হইয়াছিলো। এমনি ভাবে কাটিলো সারারাত। তারপর দিন রওনা হওয়ার সময়, সে গাঁয়ের একটি মুসলমান কলিকাতা আসিতে চাওয়ায়, তাকে-ও সাথে করিয়া লইয়া আসিলাম। একবার মনে-ও হইলো না তাকে নিয়া রাখিব কোথায়। এমনি পাগলামীর ভাব তখন চাপিয়াছিলো আমার ঘাড়ে। কলিকাতায় তাকে আমার ঘরে রাখিলাম। রাতে সে আমার সাথে আমার বিছানায় শুইতো, মনে একটুও ঘৃণাবোধ হইতো না। চৌদ্দ পনেরো দিন থাকার পর সে বাড়ী চলিয়া যায়।

এই বন্যার পর হইতে আমাদের দল আরো ভারী হইয়া উঠিলো। কাজের চাপও পড়িলো আমার উপর খুব বেশী। ভোর থেকে মাঝ রাততক্ একটুও ফুরসুৎ মিলিতো না। সারা সকাল কাটিতো নূতন ছেলেদের সাথে আলাপে—দুপুর, কোন সাধু সন্ন্যাসীর সাথে দেখা করিতে। এ-সাধুদের অভাব কলিকাতায় তখন ছিলো না—এখনো বোধ হয় নাই। এ-সময় সোহংস্বামী কলিকাতায় আসিয়া অনেক দিন ছিলেন। সারা দুপুর তার কাছে বসিয়া উপনিষদ ও বেদান্তের কঠিন তত্ত্বসমূহের ব্যাখ্যা শুনিতাম। তিনি আমায় স্নেহ করিতেন। তাই ঘণ্টার পর ঘণ্টা এ-সব সম্বন্ধে আমার সাথে আলাপ করিতে একটুও ক্লান্তি বোধ করিতেন না। আমাদের গ্রামবাসী পালোয়ান শ্যামাকান্ত বাবুই সন্ন্যাসী হইয়া সোহংস্বামী হন। বিকালে সব ছেলে আসিয়া আমার ঘর ভরিয়া ফেলিতো। এতো ছেলে আসিতে লাগিলো যে শেষে ঠাসাঠাসি করিয়া বসিয়াও ঘরে লোক ধরিতো না। কঠ, কেন, ঈশ প্রভৃতি উপনিষদই এদের কাছে ব্যাখ্যা করা হইতো। তা-ছাড়া নিজের মনে উপস্থিত মত আসা অনেক কথাও এদের বলিতাম। কোথা হইতে যে তখন এতো কথা আসিতো এখন ভাবিয়া অবাক্ হই, কারণ কোনো উপদেশ এখন সহজে মুখ দিয়া বাহির হয় না। কলেজের পর প্রায়ই যাইতাম বিভিন্ন মেসে ও হোষ্টেলে দেখিতে কে কেন ক-দিন ধরিয়া আসে না, কারো কোনো অসুখ হইয়াছে নাকি, হইলে সে কেমন আছে? হিন্দু হোষ্টেলেই ছিল সবচেয়ে বড় আড্ডা। আমাদের দলের বেশীর ভাগ লোকই থাকিতো

সেখানে। অনেক রাত সেখানেই থাকিতাম। তখন ঘুম হইতো খুব কম রাতই। বেশীর ভাগ রাতই বিভিন্ন ছেলের সাথে আলাপে কাটিতো।

এ-সময় যোগেন আমাদের সাথেই থাকিতো এবং তার সাথে ভাব খুব জমিয়া উঠিলো। সে বংশগত বৈষ্ণব, প্রাণটিও ছিলো তার বৈষ্ণবের মতো সরস ও কোমল। সে-ই প্রথম আমায় চৈতন্য চরিতামৃত পড়ায়। চৈতন্য চরিতামৃতের নিগূঢ় ভাবগুলি সহজ সরল ও কার্য্যকরী ভাবে বুঝানোর তার অসীম ক্ষমতা ছিলো। খাওয়া দাওয়ার পর অনেক রাত্রে সে আমায় চৈতন্য চরিতামৃত পড়িয়া শুনাইতো এবং চৈতন্যদেব সম্বন্ধে অনেক কথা বলিতো। রামদাস বাবাজীর তখন বাংলা ও উড়িষ্যার নানাস্থানে খুব প্রতিপত্তি। কটক থাকা কালে যোগেন রামদাস বাবাজীর দলে অনেক দিন ঘোরা ফেরা করিয়াছিলো এবং রামদাস বাবাজীর সাথে তার খুব ভাবও ছিলো। রামদাস বাবাজী প্রায়ই কলিকাতা আসিতেন। যোগেন মাঝে মাঝে আমাকে তার কাছে লইয়া যাইতো। এ-সব বাবাজীদের কথাও সে আমায় অনেক সময় বলিতো। বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে আলাপ করিতে করিতে নিজেদের অন্তরের কথাও ফুটিয়া উঠিতো এবং এরূপ ভাব বিনিময়ে অনেক রাত কাটিয়া যাইতো।

ধীরেশ চক্রবর্ত্তী

ধীরেশ চক্রবর্ত্তীর সাথেও এ সময় ভাব ঘনাইয়া ওঠে। তার সাথে আমার প্রথম দেখা বছর দেড়েক আগে কলেজ স্কোয়ারে।

দেওঘর থেকে ফিরার পর, প্রায় প্রতি বিকালেই কলেজ স্কোয়ারের রাস্তার এক পাশে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বেড়াইতে আসা ছেলেদের দেখিতাম। কোনো ছেলেকে দেখিয়া পছন্দ হইলেই নানারকমে তার সাথে মিশিতে ও ভাব করিতে চেষ্টা করিতাম। ধীরেশের সাথেও প্রথম এ-ভাবে আলাপ হয়। তখন সে অন্য-দলের ছেলে ছিলো, কাজেই আমার ঘনিষ্ঠতা পছন্দ করিলো না। কিছু দিন পর ফরিদপুরের ষড়যন্ত্র মামলায় পূর্ণদাস প্রভৃতির সাথে সে অনেক দিন ফরিদপুর জেলে আটক থাকে। মুক্তি পাওয়ার পরই সে আমার সাথে দেখা করিতে আসে এবং এবার ভাব দিনের পর দিন জমাট হইয়া উটে। যোগেনের সাথে রাত তিনটা চারটা অবধি আলাপে কাটানোর পর, বাদ বাকী রাতটুকু কাটিতো ধীরেশের সাথে কলেজ স্কোয়ারে বেড়ানোয়। এ-ভাবে দিনের পর দিন বিনা ঘুমেই কাটিতো। কখনো কখনো দুপুরে ঘণ্টাখানেক ঘুমাইতাম, কোন কোন দিন সে-সুযোগ-ও জুটিতো না। শরীরের উপর দিয়া তখন এতো অত্যাচার গিয়াছে, তিন বছর আগে কঠিন যক্ষ রোগেও ভুগিয়াছি, তবুও একদিনের জন্য শরীর অসুস্থ হয় না। কিরূপে সম্ভব হইয়াছিলো তাই ভাবি।

চৈতন্য চরিতামৃত পড়ার সাথে সাথে বৈষ্ণবদের আচার অনুষ্ঠানও আমাদের মাঝে অনেক পরিমাণে ঢোকে। প্রায় রবিবারই সাথীদের সাথে দক্ষিণেশ্বর বেড়াইতে যাইতাম। সেখানে খিচুড়ি পাক হইতো। এবং সেই খিচুড়িই লম্বা কলাপাতায় ঢালিয়া সকলে মিলিয়া দুপাশে বসিয়া খাইতাম। এক সাথে

খাওয়ায় ব্যামো হইতে পারে এ-কথা তখন ঘুণাক্ষরেও মনে আসে নাই। বরং এতে বন্ধুদের মাঝে যে সৌহার্দ্দ্য ও প্রীতি-রস বাড়ে তাতেই প্রাণ আনন্দ ও উৎসাহে ভরিয়া থাকিতো। কীর্ত্তনের জোরও তখন কম ছিলো না। কৃষ্ণনগর কলেজের প্রোফেসার হেম সরকারের সাথে এ[illegible]র খুব ভাব হয়। তিনি প্রায়ই ৩নং-এ আসিতেন। জন্মা[illegible] উপলক্ষে একবার সকলের রোখ হইলো নবদ্বীপ যাওয়ার। দল বাঁধিয়া কৃষ্ণনগর পর্য্যন্ত যাওয়া হইলো। ঘটনা চক্রে নবদ্বীপ যাওয়া সম্ভব হইলো না। সকলে মিলিয়া [illegible] বাবুর বাসার সামনে নদীর পাড়ে কীর্ত্তন করিয়া সারা [illegible]ত কাটানো গেলো। হুগলী কলেজের তখনকার প্রিন্সিপালও অনেকটা বৈষ্ণব ছিলেন। একবার সকলে মিলিয়া তার বাসায় গিয়া তিন দিন পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করা হয়। হেম বাবুও সাথে ছিলেন। আর ছিলেন আগ্রার স্বামী প্রেমানন্দ। ইনি সন্ন্যাসী হইলেও বৈষ্ণব ছিলেন। এ-সব কীর্ত্তনে তার খুব উৎসাহও ছিলো। তিন নম্বরেও শেষে মাঝে মাঝে কীর্ত্তন হইতো। কিন্তু খুব বেশী জমিয়া উঠার আগেই এ-কীর্ত্তন বন্ধ করিতে হইলো। তিন নম্বরে কীর্ত্তন করিতে করিতে হঠাৎ একজনের ফিট হওয়ায় আমার মুখ দিয়া বাহির হইলো—এ-স্নায়ু-দুর্ব্বলতা, দেশে কীর্ত্তন না হওয়াই ভালো। এর পরও হয়তো দু-একদিন সেখানে কীর্ত্তন হইয়াছে কিন্তু তাতে আর আগের প্রাণ ছিলো না।

প্রফুল্ল ঘোষ

একদিন বিকালে কে কি করিবে এ-সম্বন্ধে আলোচনা

প্রসঙ্গে আমি বলিলাম আমাদের সঙ্কল্পিত মঠ গড়িয়া তুলিতে হইলে একজন ভাল কেমিষ্টেরও প্রয়োজন। ভূপেশ বলিলো সে একজন আনিয়া দিবে। কিছু দিনের পরের কথা। বিকালের আড্ডা খুব জমিয়া উঠিয়াছে, এমনি সময় কালোপানা বেঁটে একটী ছেলে ঘরে ঢুকিয়াই আমার কানে কানে বলিলো—ঢাকা হতে এসেছি, আমার নাম প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ, নিরালা একটু কথা বল্‌তে চাই আপনার সাথে, কখন সময় হবে? একটু পরেই সে ভাবিয়া আবার বলিলো—আজরাতে এখানেই খাবো, থাক্‌বো—রাত তিনটায় আপনাকে ডেকে তুলে ছাদের উপর গিয়ে কথা বলবো। রাত তিনটার সময় সে আমায় বলিলো—আমি আগে অনুশীলন সমিতির লোক ছিলাম, ভায়লেন্সের গন্ধ গায়ে এখনও একটু আধটু আছে, আপনার আপত্তি না থাক্‌লে আপনার দলে যোগ দিতে রাজী আছি। প্রফুল্লকে ডাকিয়া আনার মূলে যে ভূপেশ তা সহজেই বুঝা গেলো। প্রফুল্লের কথায় আমি রাজী হইলাম। সে ঢাকা গিয়াই সেখানকার ছেলেদের লইয়া একটি দল গড়িতে আরম্ভ করিলো।

পশ্চিম ভ্রমণ

সেবার পূজার ছুটিতে গুরুদাস, যুগল ও আমি বাহির হইলাম পশ্চিম দেশ ভ্রমণে। আমার গায়ে ছিলো গেরুয়া রঙ্গের জামা, পা খালি। তখন আমাদের সকলের মধ্যে প্রবল-হয়ে-উঠা সন্ন্যাস-ভাবের বাইরে কতক রূপ দেবার

চেষ্টায়-ই এ-পোষাক পরিধান। গয়া ও শশারাম হইয়া প্রথম পৌঁছা গেলো কাশীতে। তার পরও কাশী অনেকবার দেখিয়াছি। কিন্তু সেবার ভরা গাঙ্গে কাশীর যে তরুণ রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছিলো, আর সব বার তার সাক্ষাৎ না পাওয়ায় মনে বড়ই ব্যথা বাজিতো। কাশী থেকে এলাহাবাদ হইয়া মানিকপুর ষ্টেষনে নামিয়া গেলাম চিত্রকূট। মানিকপুর ষ্টেষন থেকে অল্প দূরে একটা মারাঠাদুর্গের ভগ্নাবাশয আমার প্রাণে আমাদের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার করুণ সুর জাগাইয়া তুলিলো। দেশরক্ষার ভার যাদের পরের কাঁধে, তাদের অবস্থা যে কি অপমানের, স্বাধীন দেশের লোকদের দেশ রক্ষার জন্য যুদ্ধে প্রাণ দিতে দেখিলেই তা পুরোপুরি মালুম হয়। সেখান থেকে চিত্রকূট পর্য্যন্ত ছয় মাইল পথ হাঁটিয়া চলা ছিলো বড়ই আনন্দের। সমুখে সূর্য্যদেব পশ্চিম গগন রাঙ্গারঙ্গে রাঙ্গাইয়া অস্তাচলের দিকে বিদায় লইতেছিলেন। আর আমরা তিন বন্ধু, পথে সাক্ষাৎ মেলা চিত্রকূটের বার বছরের একটি সুন্দর ছেলের সাথে, সেই অপরূপ মহিমা দেখিতে দেখিতে সে দিকে আগাইতেছিলাম। সেই সুকুমার ছেলেটির হাসিমাখা কথার তালে তালে চলিতে চলিতে, আমরা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম যে, সামনের ঐ আলোর আহ্বান সত্যিকার আলোর রাজ্যের আহ্বান নয়—অন্ধকারে লইয়া যাওয়ার প্রাণভুলানো মুখের রাঙ্গা ভেল্কি মাত্র। দেখিতে দেখিতে ঘনিয়ে আসা সান্ধ্য ছায়ার সাথে আমাদের মনে হইলো রাত কাটানোর আস্তানার কথা। ছেলেটি আমাদের কথা শুনিয়া হাসিয়া

বলিলো—তার জন্য আর চিন্তা কি? আমাদের ঘর যে পাহাড়ের ঠিক নীচে নদীর এ-পাড়ে। কিছুদূর থেকে চিত্রকূটের মন্দিরগুলি দেখা গেলো কালো পাহাড়ের গায়ে ঝোলানো সাদা মেখলার মতো, এমনি ভাবে তিনশো যাটটি মন্দির চিত্রকূট পাহাড়ের মাঝামাঝি সাজানো। বাড়ীর কাছে পৌছিয়াই ছলেটি তার বাপমাকে সংবাদ দেওয়ার জন্য পরম উৎসাহে ভিতরে ছুটিয়া গেলো। কিন্তু তার সে উৎসাহ বাপমার ভৎর্সনায় অতি শীঘ্রই ঠাণ্ডা হইলো। তবু সে কোন রকমে আমাদের সে-রাত্রি তাদের বাড়ীতে থাকার বন্দোবস্ত করিয়া দিলো।

চিত্রকূট হইতে ঝাঁসি গিয়া অতিথি হই জনৈক বাঙ্গালী সরকারী উকিলের বাড়ী। উকিলবাবুর প্রথমকার আদর অভ্যর্থনার উৎসাহের উত্তাপ অনেক পরিমাণে কমে আমার গলায় পৈতা না দেখিয়া। জাতিভেদ না মানাই পৈতাত্যাগের কারণ শুনিয়া তার মুখের বেজার ভাব আরও স্পষ্ট হইলো। তিনিও ছিলেন জাতিতে ব্রাহ্মণ। সেখান থেকে গোয়ালিয়র হইয়া আমরা আগ্রা গিয়া উঠি সেখানকার প্রসিদ্ধ ডাক্তার রায় বাহাদুর বাগচীর বাড়ী। গোয়ালিয়রে আমরা ছিলাম সেখানকার পটারি ওয়ার্কসে কাজ করে জাপান প্রত্যাগত জনৈক তরুণ বাঙ্গালীর বাড়ীতে। ফরসা হওয়ার আগেই তার বাসা থেকে খালি পায়ে ষ্টেশনে হাঁটিয়া আসার সময় চোখা একটি পাথরে পায়ের তলা অনেকটা কাটিয়া যায়। তারপর পায়ে চলা অসম্ভব হওয়ায় গাড়ী করিয়া গোয়ালিয়র ষ্টেশন অবধি এবং আগ্রা ষ্টেশন হইতে ডাক্তার বাবুর বাড়ী পর্য্যন্ত যাইতে হইলো। কোনরূপ

জানাশোনা আগ্রার বাগচীদের সাথে আগে ছিলো না। স্বামী প্রেমানন্দের কাছে এদের নাম শুনিয়া বলা কওয়া নাই আসিয়া উঠিয়াছিলাম। কিন্তু অসুবিধা হইলো না একটুও। ডাক্তার বাবু তখন প্র্যাক্‌টিসে বাহির হইয়াছিলেন। চাকরের মারফতে বাড়ীর মেয়েদের অভ্যর্থনার বহরেই কৃতজ্ঞতায় আমাদের মাথা নুইয়া পড়িলো। কিন্তু ডাক্তার বাবু বাসায় পৌঁছিয়াই কড়া হুকুম দিলেন পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তার বাসা ছাড়িয়া আমাদের যাইতে হইবে। আমার পা কাটার ওজুহাতে আর এক রাত থাকার কাকুতি মিনতিও ডাক্তার বাবুর প্রাণে এতোটুকো করুণার রেখা আঁকিতে পারিলনা। তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন—কোনো ওজর আপত্তি আমি শুনবোনা, আপনাদের এখনি যেতে হবে। অগত্যা ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে গিয়া আমরা আড্ডা গাড়িলাম। রাতের কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় খোলা প্ল্যাটফর্ম্মের উপর আমাদের কাঁপিতে দেখিয়া ষ্টেশনের জনৈক পাঞ্জাবী কর্ম্মচারী একটি পাশের কামরা আমাদের দেখাইয়া দিলেন। রায় বাহাদুরের এরূপ ব্যবহারের কথা সহরে ছড়াইয়া পড়ায় স্থানীয় কোনো স্কুলের জনৈক বাঙ্গালী মাষ্টার পরদিন সকালে এক রকম জোর করিয়াই আমাদের তার বাসায় লইয়া গেলেন। এরপর মথুরা, বৃন্দাবন ও দিল্লী হইয়া কলিকাতা ফিরিলাম।

টাইফয়েড্ জ্বর

কলিকাতা ফেরার কিছু পরেই আমার টাইফয়েড্ জ্বর হয়। জ্বর হওয়ার দিন বিকালে সাথীদের কেউ কেউ বলিলো—ইচ্ছা

ক'রেইতো আপনি এ-জ্বর এনেছেন। আপনার ইচ্ছা হ'লে মুহূর্ত্ত মাঝেই তো এ-জ্বর সেরে যেতে পারে। তাদের এ-কথা শুনিয়া আমার বুক কাঁপিয়া উঠিলো। মনে হইলো এ-ভাব লইয়া কোনো বড় সঙ্ঘ গড়িয়া তোলা অসম্ভব। মানুষ আমাকে দেবতা ভাবিতে আরম্ভ করিলে, যে-দিন দেখিবে মানুষের দুর্ব্বলতাই আমাতে বেশী, দেবতার দৈব শক্তি মোটেই নাই, সে-দিন এদের চমক ভাঙ্গার সাথে সাথে আমাদের এ-সঙ্ঘ কর্পূরের মতো এক নিমেষে উবিয়া যাইবে। তাই এদের খুলিয়া বলিলাম—আমি দেবতা কি অবতার নই, একজন সাধারণ মানুষ; মানুষের সব দুর্ব্বলতাই আমার মাঝে উঁকি ঝুঁকি মারছে, দোষেগুণে মানুষের মতোই আমার ভালবাসবে, তবেই তোমাদের এ-ভালবাসা স্থায়ী হবে। তাদের অনেকেই হয়তো আমার এ-কথা বিনয় মনে করিয়া উড়াইয়া দিয়াছে। ফলে তাদের অনেকেই আমার কর্ম্ম জীবনের সাথী হইতে পারে নাই। দেবত্বের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় মানুষরূপী আমায় দেখিয়া অবজ্ঞায় পায়ে ঠেলিয়া চলিয়া গিয়াছে।

পশ্চিমের ভ্রমণ শেষ করিয়া কলিকাতায় আসার পর হইতেই আমাদের ভিতরে সন্ন্যাস ভাব প্রবল হইয়া ওঠে। ঠিক্ হয়, কলেজের পড়া শেষ হওয়ার সাথে সাথেই আমরা সকলে গেরুয়া পরিয়া পাকা সন্ন্যাসী বনিয়া কাজে লাগিয়া যাইব। তখন হইতে সন্ন্যাসীর চিহ্ন স্বরূপ অনেকে কাপড়ের নীচে গেরুয়া লেংটীও পরিতে আরম্ভ করে। পরবর্ত্তী বড়দিনের ছুটীতে সন্ন্যাসী জীবন যাপন করার উদ্দেশ্যে শান্তিপুরে একটি বাড়ীও

ঠিক করা হয়। সকলের কাপড়ে গেরুয়া রং দেওয়া হইলো—আমারও। আঠারো উনিশ জন যাইবে ঠিক হইলো। রওনা হওয়ার আগের দিন নবীন মুখুজ্যের কঠিন অসুখের সংবাদ পাওয়ায় আমার আর যাওয়া হইলো না। যারা গেলো তাদের সকলের নাম মনে নাই। এ-ক-জন গিয়াছিলো বলিয়া মনে পড়ে—(১) গুরুদাস (২) যুগল (৩) প্রফুল্ল (৪) যোগেন সাহা (৫) বিধুরায় (৬) শশাঙ্ক মুখার্জ্জি (৭) প্রমথ সরকার (৮) সুভাষ বসু (৯) হেমন্ত সরকার (১০) অরবিন্দ মুখার্জ্জি।

এরা শান্তিপুরে সন্ন্যাসী জীবনের সমস্ত রকম কৃচ্ছ্রতাই অভ্যাস করে। শেষরাত্রে উঠিয়া গঙ্গার ঠাণ্ডা জলে আকণ্ঠ গা ডুবাইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটায়-ও।

এই সাধু সঙ্গের অপূর্ব্ব সুযোগ হইতে বঞ্চিত হতভাগ্য আমাকে যাইতে হইলো আমাদের পরম আত্মীয় নবীন মুখুজ্যে মশায়কে চিরতরে এ-সংসার হইতে বিদায় দিতে। চাঁদপুর পৌঁছিয়াই দেখি তার অবস্থা অতি শোচনীয়—হুঁস্ নাই, সর্ব্বক্ষণ বিড় বিড় করিয়া প্রলাপ বকেন। সকলের প্রাণপণ চেষ্টায়ও তিনি আমায় চিনিতে পারিলেন না। তারই পাশে বসা ভবেশকে দেখিলাম উঠন্ত সূর্য্যের কিরণে ঈষৎ-শীর্ণ শিশির-ধোয়া শরতের কমলটির মতো। পরপারের যাত্রীর পানে আকুল নয়নে চাওয়া তার তখনকার সেই সুকুমার মুখখানি আমার চিত্তে এখনো জ্বল জ্বল করিতেছে। ভবেশ মুখুজ্যে মশায়ের দ্বিতীয় ছেলে। ভবেশের কথা মনে হইলে এখনো তার তখনকার সেই সুন্দর মুর্ত্তিটি স্মৃতি পটে অঙ্কিত হইয়া উঠে। আমার

কাছে সেটিই তার সত্যিকার মূর্ত্তি—আর সব মায়া মাত্র। সে-সব আমার কল্পনায় কখনো স্থান পায় না। সেই প্রথম দেখা হইতে তার সাথে স্থাপিত প্রীতির সম্বন্ধ অবস্থার নানা বিপর্য্যয়ের মাঝেও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। সাতদিন পরে শীতের এক ছায়া-ঘেরা সন্ধ্যায় মুখুজ্যে মশায়ের জীবন প্রদীপ নিবার আভাষ সর্ব্বাঙ্গে নানারূপে ফুটিয়া উঠিলো। উপস্থিত সকলের মত লইয়া, আমি তার বড় সাধের রোজ-রোজ-পড়া গীতা খানা খুলিয়া প্রথম তিন অধ্যায় পড়িলাম। মৃত্যুর সেই তাণ্ডবলীলার মাঝে গীতার ছন্দে ছন্দে আমার প্রাণ নব-নব-আনন্দে নাচিয়া উঠিলো। ভুলিয়াই গেলাম চারিপাশে উঁকি-মারা যমদূতদের কথা। হয়তো সারা গীতা খানি-ই একটানে পড়িয়া ফেলিতাম, যদি তার শেষ দীর্ঘশ্বাস ঘরের রুদ্ধ বায়ুর সাথে মিশিয়া গীতা পাঠ শ্রবণে মুগ্ধ সকলের চিত্ত অতো শীঘ্র দুঃখ-চঞ্চল না করিয়া তুলিতো।

চাঁদপুর থেকে বিদায়ের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে ভবেশ আমায় জিজ্ঞাসা করিলো—কি করতে হবে? আমি বলিলাম—ব্রহ্মচর্য্য পালন। জিজ্ঞাসু সরল নয়ন দুটি আমার মুখের উপর একান্ত ভাবে রাখিয়া সে আবার জিজ্ঞাসা করিলো—ব্রহ্মচর্য্য পালন করতে হয় কি করে? শ্যামাকান্ত বাবুর সেই পুরাণো কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিলাম—কৃপণের ধনের মতো দেহকে ভালবেসে। ইহা হইলো ১৯১৪-এর ডিসেম্বর মাসের কথা। তখন আমার কাছে ব্রহ্মচার্য্য পালন একটি কথার কথা ছিলো না। তখন সত্যিই খাওয়া দাওয়ার অভাব থেকেও ভগবানের অভাব আমায়

অধিক পাগল করিতো। আর আমি মর্ম্মে মর্ম্মে জানিতাম, ব্রহ্মচার্য্য ছাড়া, প্রাণ জুঁইয়ের মতো শুভ্র না হইলে, ভগবানের পবিত্র চরণের কাছে ঘেঁসা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তার পর, জীবনের উপর দিয়া দীর্ঘ ষোল বছর বহিয়া গিয়াছে। সংসারের আবর্ত্তে পড়িয়া নিজেই সেই অমূল্য উপদেশ ভুলিয়া বিপথে চলিয়াছি। আজ জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে অসুস্থ অবস্থায় বিছানায় শুইয়া, আমি একদিকে কাণের গোড়ায় ভগবানের আহ্বান—অন্য দিকে হৃদয়-কন্দরে মৃত্যুদেবের পদধ্বনি—শুনিতেছি। বার বার শুধু মনে হইতেছে, এ পাপ-পোড়া পরাণ লইয়া ভগবানের কাছে যাইবো কোন্ সাহসে, কি জবাব দিব আমার অনুষ্ঠিত অসংখ্য অন্যায়ের। যারা ভগবানে বিশ্বাস করে না, এ-সমস্তের তোয়াক্কা তাদের করিতে হয় কমই। কিন্তু আমার কথা তো সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। শৈশব হইতে সাধু সন্ন্যাসী, কথক কীর্ত্তণীয়া, অভিনেতা অভিনেত্রী কত রূপেইতো তিনি আমার কাছে আসিয়া তার নাম-মহিমা শুনাইয়াছেন। বিশ্বাস হইয়াছে তাদের সে-সব কথায়। তার হাতের স্পর্শ অনুভব করিয়াছি এ-ধরণের অসংখ্য উপলক্ষে। তবু যে শেষ পর্য্যন্ত পাপ পঙ্কে এতো হাবু ডুবু খাইলাম, এ-সবের মাঝ থেকে পবিত্র পদ্ম-বৃন্তটির মতো বাহির হইয়া আসিতে পারিলাম না, তার কোন পরিষ্কার জবাবইতো আজ আমার কাছে নাই।

চাঁদপুর থেকে কলিকাতা আসিয়া দেখি শান্তিপুরের দল ফিরিয়াছে। দেখিয়া মনে হইলো প্রত্যেকে যেন এক-একটি অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ—সন্ন্যাসী হওয়ার জলন্ত প্রতিজ্ঞা সকলের চোখে মুখে।

সন্ন্যাস সম্বন্ধে নিত্য নূতন উপদেশ দিয়া আমিও তাদের সে-আগুণে ইন্ধন যোগাইলাম। সে-সময় তিন নম্বরে নানা দলের নেতাদেরও শুভ আগমন ঘটিতো। বিপ্লবী দলের তখনকার প্রায় সব নেতার সাথেই আমার আন্তরিক সদ্‌ভাব ছিলো। আমাদের মত বিভিন্ন হইলেও, আর সেই বিভিন্নতা ভালরূপে জানা থাকিলেও, আমাদের মাঝে আন্তরিক শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সক্রিয় সহানুভূতির ভাব বজায় ছিলো। তাদেরই দু-তিন জন একদিন বলিলো—সন্ন্যাস সন্ন্যাস ক'রে দেশটা উচ্ছন্নে গেলো, রসাতলের পথে আর এদের এগিয়ে নিবেন না এ-সব কথা বলে। আমি তাদের সে-কথা তখনো কাণে তুলি নাই—এখনো বিশ্বাস করি না। আমি মনে মনে বুঝি সত্যিকার সন্ন্যাসীর প্রয়োজন এখনো এদেশে অনন্ত। কিন্তু এ-সব সন্ন্যাসীর প্রতি কাজ-কর্ম্ম ও কথা-বার্ত্তায় ত্যাগ ও দেশ সেবার পবিত্র শিখা ঝক্‌মক্ করিয়া জ্বলা চাই। পেটকেওয়াস্তে সন্ন্যাসীর দলই দেশের সর্ব্বনাশ করিলো—ত্যাগী সন্ন্যাসীর দল নয়। দেশের সেবায় সর্ব্বক্ষণ আত্মনিয়োগে প্রস্তুত ব্যক্তিরই একমাত্র সন্ন্যাসে অধিকার। দেশ তাদের দুমুঠো খেতে দিবে, দুটো ফাঁকা ধর্ম্মের কথা শোনার জন্য নয়, তাদের সেবার ভিতর দিয়ে সত্যিকার ধর্ম্মপথে চলিতে শিখার উদ্দেশ্যে। এ-রূপ সর্ব্বসাময়িক দেশসেবীদের জন্যই আগে ছিলো গেরুয়ার ইউনিফরমের ব্যবস্থা। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর ১৯২১-এর আন্দোলন থেকে, দেশ সেবকদের খদ্দর পরার প্রথা প্রচলিত হওয়ায়, গেরুয়া অনেকটা নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। মহাত্মার ভাব-মেশানো খদ্দরে অনেকটা বৈরাগ্যের ভাব জড়ানো।

তাই খদ্দর-পরা স্বেচ্ছাসেবক দেখিলেই দেশের মাথা ভক্তি ও শ্রদ্ধায় অনেকটা নুইয়া পড়ে।

যুগলের বিলাত যাত্রা

এর পরই আসিলো যুগলের বিলাত যাওয়ার পালা। হেম সরকারের কাছ থেকে একশো টাকা লইয়া কিছু দিন আগেই বিলাতের টিকিটের বায়না দেওয়া হইয়াছে। এপ্রিল মাসে জাহাজ ছাড়ার তারিখ-ও ঠিক হইলো। যুগলের মন অনেকটা দৌলতপুরের কাজ কর্ম্মে বসিয়া গিয়াছিলো। বিলাত যাওয়ার ভাবনা তখন তার মাথায় বড় একটা আসিতো না। বিলাত গিয়ে কি হবে—এ-কথা-ও সে আমায় দু-চারবার বলিয়াছিলো। কিন্তু আমার মন বুঝ মানিলো না। ভাবিলাম বিলাত থেকে বিধান-রায়ের মতো এম, আর, সি, পি ; এফ, আর, সি, এস, পাশ করিয়া আসিলে যুগলের আয়ের হাজার হাজার টাকা দিয়া অনায়াসেই মঠ-প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে। টাকা উপার্জ্জনের কথা শুনিয়া শিউরে উঠে যুগল অনেক সময় আমায় বলিতো—সুরেশ, আমায় একটা money manufacturing machine কোরো না। নির্দ্দয় আমি, অন্ধ আমি, তার প্রাণের অন্তরতল মথিত করিয়া বাহির হইয়া আসা সে কথা কয়টি যে কতো দুঃখ, কতো বেদনা মিশানো, তা তখন বুঝিতেও পারি নাই। আজ তার প্রত্যেকটি কথা বুকে তপ্ত শলার মতো বিঁধিতেছে।

আমার শেষ এম, বি পরীক্ষার দিনও ঘনাইয়া আসিলো। কিন্তু কে ভাবে তখন পরীক্ষার কথা। গেলো দু-বছর বইয়ের

পাতা না উল্টাইয়া যেমনি কটিয়াছে,পরীক্ষার দু-মাস আগের দিন গুলিও ঠিক তেমনি কাটিলো। তখন পরীক্ষার পড়ার জন্য ঝোঁক ছিলোনা বলিয়া আজও মনে দুঃখ নাই—কারণ এ-বিশ্বাস আমার এখনো আছে, তখনকার কাজগুলি সবখানি প্রাণ ঢালিয়া এ-ভাবে না করিলে আজ অভয় আশ্রমের মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়ানো সম্ভব হইতো না। বিলাত যাওয়ার সাতদিন আগে যুগল আমার উপদেশ অনুসারে দৌলতপুরের চাকরি ছাড়িয়া কলিকাতা আসিলো। মাঝারী ধরণের একটা দেশী দোকানে কাপড় চোপড়ের ফরমাসও দেওয়া গেলো। কিন্তু টাকা ছিলো না তখন পর্য্যন্ত হাতে একটিও। রওনা হওয়ার তিন দিন আগে যুগলকে বলিলাম—তুমি তো বেশ নিশ্চিন্তে বসে আছ কিন্তু টাকা জুটবে কোত্থেকে? সে বলিলো—তুমিই তো ভাবছো, একটি বিষয় নিয়ে সকলে ভেবে কি হবে? এমনি বিশ্বাস ছিলো তার চিরদিন আমার উপর। কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য্যের কথা এই—তিন দিনের মধ্যেই প্রায় পনেরোশো টাকা জুটিয়া গেলো। যাদের কাছ থেকে টাকা পাওয়ার আশাও মনে হইতো পাগলের কল্পনা, এরূপ লোকও তিন নম্বরে আসিয়া সাধিয়া টাকা দিয়া গিয়াছে। ভালো ছেলে বলিয়া যুগলের মেডিক্যাল কলেজে খুব খ্যাতি ছিলো. তার নামেই টাকা আসিয়াছে, আমার তো তখন বাজারে ক্রেডিট্ শূণ্য, তাই আমি শুধু উপলক্ষ মাত্র। যুগলের বিলাত যাওয়ার দিন, চারিদিক থেকে দলের ছেলেরা কলিকাতায় আসিয়া জুটিলো। হৈ চৈ ও যাতায়াতিতেই সারা দিন কটিলো। সকলের মনেই

তখন বিশ্বাস ছিলো—যুগলের এই বিলাত যাত্রা আমাদের ভাবী কর্ম্ম জীবনের প্রথম দেখিতে পাওয়া অরুণ রেখা। তাই সকলের মনই সে দিন আশা, উৎসাহ ও আনন্দে ভরা ছিলো।

চারিদিক ঘোর করিয়া মুষল ধারে বৃষ্টি আসার সাথে সাথেই ঘড়ি ইঙ্গিত করিলো—হাওড়া রওনা হওয়ার সময় হইয়াছে। সকলকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়া টেবিলের উপর রাখা বুদ্ধের ছবির সামনে যুগল ও আমি খানিক বসিলাম। তারপর যুগলের হাতে দু-টুকরা গেরুয়া দিয়া বলিলাম—প্রলোভনের দেশে যাচ্ছো, এ-দুখণ্ড গেরুয়াই যেন ব্রতধারী তোমার উদ্দেশ্য সাধন-অন্তে অনড় চিত্তে দেশে ফেরার সহায় হয়। গাড়ী ছাড়ার মিনিট পাঁচেক আগে তাকে বলিলাম—তিনশো টাকা মোটে তোমার সাথে রইলো, এরপর টাকা পাঠানোর কি হবে বিধাতাই জানেন—না খেয়ে সেখানে মরতেও হতে পারে, মুষড়িও না কিন্তু—শুধু মনে রেখো আমেরিকায় গিয়ে বিবেকানন্দের প্রথম-সহা দুঃখ কষ্টের কথা। যুগল মুখ চাপিয়া শুধু একটু হাসিলো। কথা না বলিলেও তার স্বচ্ছ চোখে ফুটিয়া উঠিলো তার অন্তরের ভাব—তুমি একটুও ভেব না, জীবন ভোর তোমার কথাই কাজে পরিণত করার চেষ্টা হবে আমা দ্বারা।

গাড়ী ছাড়িয়া দিলো। বহুদূরে চলিয়া যাওয়া গাড়ীর অস্পষ্ট শব্দের সাথে আমার হৃদয়ে ঝঙ্কৃত হইলো তার বিদায় কালের শেষ কথা কয়টির অতিমিষ্টি রেশটুকু। আর সকলে ট্রামে চড়িয়া তিন নম্বরে চলিয়া গেলো কিন্তু আমার

পক্ষে অতো দ্রুত চলা সম্ভব হইলো না—পা যেন মাটিতে আটকাইয়া যাইতে লাগিলো। না খেয়ে ম'... —এ-কথাটি মুখে বলা যতো সহজ, কাজে পরিণত হইতে ... কিন্তু ততোখানি কঠিন। কার কাছে গিয়া কিরূপে টাকা পাইবো এই চিন্তার বিষম ভারে পেষা আমার সমস্ত শরীর মন রাস্তার সাথে মিলিয়া যাওয়ার উপক্রম হইলো। অতি বিষণ্ণ মনে, বাদল রাতের শেষে কলিকাতার সকল জিনিষের ধীরে চলার মতো, আমিও অতি মন্থর গতিতে মেসে ফিরিয়া আসিলাম। খাওয়া হইলো না, গলায় যেন সব ভাত আটকাইয়া আসিলো। দু-একবার মনে হইলো বামণের চাঁদে হাত দেওয়ার মতো এই অসাধ্য সাধনের ভার কেন মাথা পাতিয়া লইলাম। সারারাত শুইয়া শুধু আওড়াইলাম কার কার কাছে ভোর হইতে না হইতে কাল ছুটিতে হইবে টাকার তল্লাসে। প্রথমেই গেলাম আমাদের একজন পুরাণো দরদী ডাক্তার বন্ধুর কাছে। সব কথা শুনিয়া, ঘোলাটে চোখ পাকাইয়া, তিনি আমায় বলিলেন—পাগল হয়েছো তুমি, বিলাত পাঠানো কি ছেলে খেলা। এতোদিন চেষ্টা ক'রে আমি নিজে বিলাত যেতে পারলাম না, আর তোমার মতো একটি পাগল ছেলে জোটাবে মাসের পর মাস বিলাতের খরচের টাকা? মুখ খানা ছোট করিয়া সেখান হইতে বিদায় হইলাম। পা আর আগাইতে চায় না, তবু চলিতেই হইবে। শেষে মনে হইলো কবির সে-কথা—তোমারি লাগিয়া কলঙ্কের বোঝা বহিতে আমার সুখ। প্রাণ ভোলানো এ-কথা কয়টি আওড়াইতে আওড়াইতে গালি গালাজের সমস্ত ঝড়

এর পর হাসি-মুখে মাথায় বহিয়াছি। গায়ে দু-একটা আঁচড় লাগিলেও হৃদয়কে এ-সব কখনো স্পর্শ করিতে পারে নাই। সে রহিয়াছে এ-সবের উপর, একেবারে আত্মভোলা, গানের পদটি দিনরাত গুঞ্জনে মত্ত। চোখরাঙ্গানি অনেক দেখিতে হইয়াছে। এ-সবের মাঝে টাকাও জুটিয়াছে, ভাবী জীবনের কর্ম্মপথের অস্পষ্ট আভাষও আমার অন্তরে পৌঁছিয়াছে।

যুগলের বিলাত যাওয়ার সময় আমার শেষ এম, বি পরীক্ষা চলিতেছিলো। প্রস্তুত ছিলাম না মোটেই, তবু পরীক্ষা দিলাম সবগুলি বিষয়ে। পরীক্ষা সাগরও প্রায় তরিয়াছিলাম কিন্তু আটকাইলো এক জায়গায় এবং এরই জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘানি ঠেলিতে হইলে আরো ছ-মাস।

পরীক্ষা শেষ হইতে না হইতেই রওনা হইলাম কটক, গিরীশের সাধুসঙ্গ উপভোগের জন্য। আমার সাথে প্রফুল্ল এবং গুরুদাসও ছিলো। জ্যোতির্ম্ময় প্রভৃতিও পরে গিয়া হাজির হইলো। অন্নদা চৌধুরীর সাথে সেবারই সে-খানে প্রথম সাক্ষাৎ। অন্নদা তখন কলেজে পড়িতো—সাথে সাথে গিরীশের সোডা লেমনেডের কল এবং সরবতের দোকানও চালাইতো। অন্নদার রক্তে ব্যবসা-বুদ্ধি চলিয়া আসিয়াছে সাতপুরুষ বাহিয়া। ওর দাদার তখন কটকে কাপড়ের কারবার খুবই বড় ছিলো। আমাদের সকলের খাওয়ানোতেই ছিলো গিরীশের আনন্দ। থালা ভরা রসগোল্লা, সন্দেশ অন্নদা আমাদের জন্য বাজার থেকে বহিয়া আনিতো কিন্তু গিরীশের আদেশে তা থেকে তার মুখে যাইতো না একটিও। গিরীশের প্রাণ মায়ের মতো

কোমল হইলেও শিষ্যদের শিখানো ব্যাপারে সে ছিলো দ্রোণাচার্য্যের মতো অতি কঠোর। কটকের দারুণ গ্রীষ্মের ক্লান্ত সন্ধ্যাবেলা অন্নদার সরবতের দোকানে গিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধন্না দিয়া বসিয়া থাকিলেও বিনা পয়সায় আমাদের এক গ্লাস সরবৎ পাওয়া সম্ভব হইতো না। এমনি নিয়মের কঠিন গাঁথুনীতে অন্নদা নিজেকে বাঁধিয়া তুলিয়াছে ছোটকাল থেকে। আশ্রমের খদ্দর বিভাগের কর্ম্ম কর্ত্তারূপেও তার এ-কঠোরতার পরিচয় পাওয়া যায় প্রতিপদে। এতোটা কঠোর হইতে পারিয়াছিলো বলিয়াই এতো কম মূলধনে এতো বড় খদ্দর বিভাগ গড়িয়া তোলা সম্ভব হইয়াছে। তার সংযমের পরিচয় পাওয়া যায় শুধু ব্যবসা ক্ষেত্রেই নয়। প্রতিদিনও সে নিজেকে চালায় নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে, এতোটুকু ব্যত্যয় তাতে হওয়া সুকঠিন। আমি নিজেও তাকে মনে করি আমার কর্ম্ম পথের প্রহরী, একটু নড়চড় দেখিলেই তার সতর্কবাণীর সুতীক্ষ্ণ কষাঘাতে সে আমায় ঠিক রাখে। আগে একটু একটু বিরক্ত বোধ হইতো, এ-সব কষাঘাতের তীব্রতার দিকেই তখন লক্ষ্য ছিলো, এ-সবের মাধূর্য্য উপভোগের ক্ষমতা তখনো লাভ হয় নাই। কিন্তু এখন ঠেকিয়া শিখিয়া বুঝিয়াছি আমার দুর্ব্বল চিত্তকে অনেক মলিন মুহূর্ত্তে ঠিক রাখিয়াছে আমার সেই পরম বন্ধুই।

বারিপদা

কয়েকদিন কটকে কাটানোর পর আমরা গেলাম বারিপদা গিরীশদের বাড়ীতে। মায়ের মতন করিয়া বন্ধুদের খাওয়ানোর

গিরীশের ক্ষমতা ছিলো অতুলনীয়। বারিপদা থেকে আমরা সকলে মিলিয়া একদিন গেলাম ছ-সাত মাইল দূরের একটা পাহাড়ে দু-একদিন থাকার জন্য। পাহাড়ের নীচে বড় একটা ঝরণার ধারে একখানা ছোট বাংলা আমাদের থাকার জন্য পূর্ব্ব হইতেই ঠিক করা হইয়াছিলো। একদিন সকাল ন-টা কি দশটার সময় আমরা পাহাড় বাহিয়া উপরে উঠিলাম। সকল কাজেই দক্ষ গিরীশ পাহাড় বেয়ে উঠিতে লাগিলো লাফিয়ে লাফিয়ে ঠিক বানরের মতো। পাহাড় চড়ায় এমন আর একটি ওস্তাদ আজ পর্য্যন্ত আমার চোখে পড়ে নাই। পাহাড়ে উঠিতে না উঠিতেই ঝড় ঝড় করিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিলো। গিরীশের হাঁফানির ব্যামো ছিলো। এজন্য প্রায় রাতই তাহাকে জাগিয়া বসিয়া থাকিতে হইতো। আমি তাকে অনুনয় বিনয় করিয়া বার বার বলিলাম বৃষ্টিতে না ভিজিয়া নীচে নামিতে কিন্তু সে আমার কথায় খেয়াল না করিয়া আরো জোরে উপরে উঠিতে লাগিলো। আমি রাগে মুখ ভার করিয়া নীচে নামিয়া আসিয়া অভিমানে ফুলিতে ফুলিতে বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। ঘণ্টা খাণেক বাদে, জলে সারা গা ভিজা, হাত পা কাদায় মাখা সে প্রায় কাঁপিতে কাঁপিতে নীচে নামিয়া আসিলো। নানা কথায় আমায় শান্ত করিতে সচেষ্ট তাকে ভিজা গলায় বলিলাম—সব অপরাধ ক্ষমা করতে পারি যদি তোমার পা আমায় ধুয়ে দিতে দাও। সে হাসিমুখে রাজী হইলো। এক গাড়ু জল ও গামছা লইয়া তাহার পা তুলিয়া কোলের কাছে আনা মাত্র আমার প্রাণের

আনন্দ উচ্ছ্বসিত অশ্রু-রূপে দরদর ধারে তার পায়ে পড়িতে লাগিলো। তার পর গামছা দিয়া তার পা মুছিয়া ছোট ছেলেটির মতো তাকে বিছানায় শোওয়াইয়া দিলাম। গিরীশ হয়তো এখন অনেকটা বদলাইয়া অন্যরূপ হইয়াছে কিন্তু তখন তার সেবার ভাবে ভরা সরল প্রাণ এমনি অভিভূত করিতো আমাকে। জীবনের নিত্য নূতন অভিজ্ঞতার সিঁড়ি বাহিয়া মানুষ জীবন সৌধের ক্রমশঃ অধিক উপরে ওঠে বটে, কিন্তু আগেকার এসব মধুর স্মৃতি পরজীবনের শুষ্ক মুহূর্ত্তগুলিকে সরস করিয়া তোলে।

বারিপদা থেকে ফেরার পথে প্রফুল্ল আমার ছোট পুঁটুলিটি মাথায় করিয়া আসিতেছিলো সকলের পিছনে। পুঁটুলি বহার মধ্যে কিছুই নাই কিন্তু এর পিছনের ভাবটি চারিদিকের আবেষ্টনকে একটি নূতন রূপ দিয়া আমার স্মৃতিপটে অমর অক্ষরে আঁকিয়া রাখিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্ব প্রথম ছাত্রের উজ্জ্বলতার মাঝে, গভর্ণমেন্টের বড় চাকুরি ত্যাগের পবিত্র মহিমায়, রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রাণঢালা সেবার উন্মত্ততার মাঝেও তাকে দেখার সুযোগ আমার ঘটিয়াছে। কিন্তু সেই পুঁটুলি বাহকরূপে তার ভিতরের সমস্তখানি মাধুর্য্য চোখে মুখে উছলে পড়া যেই মহনীয়রূপে তখন তাকে আমি দেখিয়াছিলাম, তেমনি রূপে আর কখনো দেখি নাই। মানুষ বড় হয় সেবায়। সেই সেবায় ছোট বড় বিচার নাই। সেবকদের সম্মিলিত সেবায়ই সমাজ অঙ্গ সুন্দর ও সম্পূর্ণ হইয়া উঠে। এখানে ব্যক্তি বিশেষের সেবার পরিমাণ মাপার চেষ্টা বৃথা। এরূপ

চেষ্টাই সমস্ত রূপটিকে বিকৃত করিয়া তোলে। যেই আকাশ, আলো ও পাখীর গানের মিলনে পৃথিবীর সকালবেলার নিটোল রূপটি রচিত হয়, তাদের মাঝে ছোট বড় কে ?

জামসেদপুর

বারিপদা থেকে আমি ও গুরুদাস গেলাম জামসেদপুর, আর সকলে বোধহয় ফিরিলো কলিকাতায়। জামসেদপুরের প্রকাণ্ড প্রতিষ্ঠানের পিছনের ভারতীয় মস্তিষ্কের উদ্ভাবনী শক্তি ও সংগঠন কৌশল আমার প্রাণের আনন্দ তন্ত্রীকে নব রাগে নাচাইয়া তুলিল বটে, কিন্তু সাথে সাথে চার পাশের গ্রামের পুরুষ ও মেয়েদের মদ্যপান ও অন্যান্য নৈতিক অবনতির কাহিনী ও আমার প্রাণে অনেকখানি বেসুরে বাজিলো। মনে হইলো বর্ত্তমান সভ্যতার অপরিহার্য্য এই সব কল কারখানা সমগ্র জাতিটাকে শেষে কোন্ পাতকের গভীর পঙ্কিলে ঘোরপাক খাওয়াইবে, তার হিসাব নিকাশের সময় আসিয়াছে। লয়েড্ জর্জ্জের কিছুদিন আগে ইংলণ্ডের কলকারখানার বিরুদ্ধে লেখা প্রবন্ধটি তখনও আমার মনে উঁকিঝুঁকি মারিতেছিলো। কিন্তু এ-সবের হাত হইতে পরিত্রাণের কোন পথ তখন পর্য্যন্ত আমার মাথায় খেলে নাই।

জামসেদপুর থেকে কলিকাতায় ফিরিয়াই শুনিলাম পরীক্ষায় ফেল হইয়াছি। পাশের আশা ছিলো না, তাই ফেলের সংবাদ আমায় বেশী কাবু করিতে পারিলো না। সামনের পরীক্ষায় পাশ করার দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া তখন থেকেই পড়িতে সুরু করিলাম।

যুগলের টাকার খোঁজে মাঝে মাঝে বাহির হওয়া ছাড়া আর সব কাজ প্রায় বাদ পড়িলো। তিন নম্বরে পড়া অসম্ভব, তাই আর একটি মেসে আড্ডা লইলাম। শুধু বিকালে তিন নম্বরে আসিয়া সমাগত ছেলেদের প্রাণের কথা কিছু কিছু বলিতাম। আগে দিন রাত গীতা উপনিষদ পড়ায় ও এসব সম্বন্ধে আলোচনায় রত থাকায় প্রাণের মাঝে অবিরাম যে আধ্যাত্মিকতার স্রোত বহিতো, নূতন খোরাকের অভাবে তা অনেকটা শুকাইয়া আসিলো। বিকালে নিরালা খানিকক্ষণ বসিয়া মাকে বলিতাম —আয়োজন তো কিছুই নাই, তুই যা বলাবি তাই বোল্‌বো, দেখিস্‌ মুখ যেন থাকে। যুগলও ইংলণ্ডে পৌঁছার তিন মাসের মধ্যেই প্রাইমারী এফ, আর, সি, এস পাশ করিলো। পরীক্ষার ফীস্‌ বাবদ ফল আসার এক সপ্তাহ মধ্যেই কেবল করিয়া প্রায় ছয় শ টাকা পাঠাইতে হয়। তারপর, শেষ এফ, আর, সি, এস পরীক্ষার জন্য সে এল, আর সি, পি ; এম, আর, সি, এস-ও পাশ করে। এ-পরীক্ষার ঠিক পরেই তাহার হাঁপানীর ব্যামো সুরু হওয়ায় আমাদের অনেকটা হয়রাণ হইতে হয়। বেশী দিন বিলাত থাকা সম্ভব না-ও হইতে পারে, এ আশঙ্কায় স প্রায় বিনা আয়াসেই এম, আর, সি, পি-ও পাশ করিয়া রাখিলো। ছ-মাস পর এম, বি পাশ করিয়া আমিও বিশ্ববিদ্যালয়ের হাত হইতে রেহাই পাইলাম। পরীক্ষা দিয়াই আমি প্রথম যাই নড়াইল।

পঞ্চম অধ্যায়

দেবেন সেন

নড়াইলে গুরুদাসের সহকর্ম্মীদের সাথে দু-চারদিন বেশ আনন্দে কাটাইয়া গেলাম দৌলতপুর। যুগলের বিলাত যাওয়ার পর অমূল্য উকিল বোটানীর প্রোফেসার হইয়া দৌলতপুর যায়। দেবেন সেনের সাথে সেখানেই প্রথম দেখা হয়। সে তখন দৌলতপুর কলেজের ফার্ষ্ট কি সেকেণ্ড ইয়ারে পড়িতো। তার ছোটক'রে ছাঁটা কোঁকড়ানো চুলের নীচেকার নিবিড় স্নিগ্ধ চাহনী মাখা হাসি-হাসি গোলগাল মুখখানা এক মুহূর্ত্তেই আমাকে তার পানে টানিলো। তার সাথে পাকা সম্বন্ধ স্থাপনের প্রথম চেষ্টা প্রচণ্ড বাধা পায় তার স্পষ্ট প্রত্যাখানে। গিরীশ-ও আমার সাথে ছিলো। সে-ও অনেক চেষ্টা করিলো। অন্য দলের সাথে তার পূর্ব্বে স্থাপিত সম্বন্ধই আমাদের সাথে মিলনের অন্তরায় হইলো। সহজে নিরাশ হওয়ার ধাত আমার নয়। তাই সকল প্রকার অসম্ভবের মাঝেও আশায় বুক বাঁধিলাম। সে-খান হইতে গেলাম চাঁদপুর।

নরেন মুখার্জ্জি (কালু)

নরেন ওরফে কালু নবীন মুখুজ্যের বৈমাত্রেয় ভাই আমার দাদার শ্বশুর রজনী মুখুজ্যের ছেলে। রজনী মুখুজ্যের বাসা

নবীন মুখুজ্যের বাসার লাগাও পশ্চিমে। রজনী মুখুজ্যে সঙ্গতি-সম্পন্ন লোক, তেজারতিই তার প্রধান ব্যবসা। কালু চাঁদপুর থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া হিন্দু হোষ্টেলে থাকিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িতো। হিন্দু হোষ্টেলে আমার আনা-গোনা আরম্ভ হওয়ার পর হইতেই আমি তাকে দলে ভিড়ানোর চেষ্টায় ছিলাম। কিন্তু সে কিছুতেই বাগ মানিতো না। চর্ম্ম-রোগের চিকিৎসার জন্য সে তখন চাঁদপুর ছিলো। চাঁদপুরে তার সাথে প্রথম সাক্ষাতের পরই বুঝিলাম, তার আমার সম্বন্ধে আগেকার শক্ত ভাব আর নাই। আগে পথে ঘাটে দেখা হইলেই সে আমার পাশ কাটিয়া যাইতে চাহিতো। এবার সে ঘুরিয়া ফিরিয়া আমারই কাছে আসিতে লাগিলো। তার মনের পরিবর্ত্তনের কথাও সে আমায় একদিন খুলিয়া বলিলো। তার কথা শুনিয়া বুঝিলাম, ভগবান লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা তার প্রাণে জাগিয়াছে, সে-পথে আগানোর জন্য কিছু সাহায্য সে আমার কাছে চায়। উৎসাহ বাক্যে তার উদ্দীপ্ত প্রাণ আরো উষকাইয়া তুলিয়া সাধ্য মতো সাহায্য তাহাকে করিতে লাগিলাম। এই সূত্র ধরিয়া দুজনের প্রাণ দিনের পর দিন নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলো। ভবেশও এ-সব সাধনার সাথী হইলো। ভবেশের মারফতে চাঁদপুর স্কুলের প্রথম তিন শ্রেণীর ভাল ছেলেদের আমার কাছে ডাকাইলাম। আসিলোও তারা, ভাব-ও হইলো দু-চার জনের সাথে। এদের মধ্যে জ্ঞানদা সাহার নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারণ, আমার বর্ত্তমান কর্ম্মজীবনের সাথেও তার পরোক্ষ সম্পর্ক আছে।

এই প্রিয়দর্শন ছেলেটি ছিলো তখন চাঁদপুরের ছাত্রদের অনেকটা নেতৃস্থানীয়। তার আমার কাছে আসার পর থেকেই অপর একটি দলের নেতারা—আমি তাদের ছেলে ভাঙ্গিয়ে নিচ্ছি মনে করিয়া—আমার উপর হাড়ে হাড়ে চটে। জ্ঞানকে তারা নানারূপ ভয়ও দেখায়। তাদের সে-সব চেষ্টা বিফল হওয়ায় তারা হেড্‌মাষ্টারের কাছে নালিশ-ও করে। বলে—আমি চাঁদপুরের ছেলেদের ধর্ম্ম উপদেশের ছুতায় বিপ্লবের পথে নিচ্ছি। হেডমাষ্টারের শাসানী ও কারসাজীতে জ্ঞানদাদের অনেকেরই আমার কাছে আসা বন্ধ হইলো এবং পরদিন থেকে আমার পিছনে দুটি গোয়েন্দাও লাগি[illegible]। ফলে আমায় চাঁদপুর ছাড়িয়া কলিকাতা ফিরিতে হইলো।

বিপ্লবীদের সভায়

তখন জার্ম্মেণীর সাথে যুদ্ধে ইংলণ্ড ইউরোপে বিব্রত থাকায়, ভারতের বিপ্লবীদের স্বাধীনতা-সংগ্রাম চালানোর অপূর্ব্ব সুযোগ উপস্থিত হইলো। এই সুযোগের সুবিধা নেওয়ার চেষ্টাও তারা করিয়াছিলো কম নয়। সকল দল মিলিয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিলো। জার্ম্মাণীর সাথে তলে তলে কথাও চলিলো। সকল দলের একটি সম্মিলিত সভায় যোগ দেওয়ার আকস্মিক আহ্বান আমার কাছে একদিন আসিয়া উপস্থিত হইলো। গিয়া দেখি বাংলার প্রায় সকল জেলার লোকই সেখানে হাজির হইয়াছে। স্বাধীনতা লাভের চেষ্টায় আমার ষোল আনা সমর্থন থাকিলেও, তাদের পথ সম্বন্ধে আমার

সন্দেহের কথা খুলিয়া বলিলাম। তারা আমায় ছেলে সংগ্রহের ভার লইতে বলিলো। তাদের সে-মতে সায় দিতে না পারায়, আমাকে সেখান থেকে সন্ধ্যার ঠিক প্রাক্কালে বিদায় লইতে হইলো। গিয়াছিলাম ভোরে। দুপুরে খাওয়া দাওয়াও হইয়াছিলো সেখানে। কথা কাটাকাটি চলিয়াছিলো সারাদিন ধরিয়া। আমার বাল্যবন্ধু কুলচন্দ্রও সে সভায় উপস্থিত ছিলো। পরদিন ভোরে কুল আমায় বলিলো—তোমার কথায় তরুণদের রক্ত অনেক খানি গরম হয়ে উঠেছে, তারা তোমায় এ-সংসার হতে সরানোর জল্পনা কল্পনা কচ্ছে। তুমি কিছুদিন বরং আর কোথা থেকে ঘুরে এসো। ইতিমধ্যে এদের রক্ত ঠাণ্ডা হবে।

হরিদ্বারের কুম্ভমেলা

মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার লেখা "প্রয়াগে কুম্ভ মেলা" পড়িয়া এবারকার হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় সমবেত সাধুদের দেখার ইচ্ছা মনে বহুদিন ধরিয়াই চলিতেছিলো। কুলচন্দ্রের কথা শুনিয়া সে-ইচ্ছা আরো প্রবল হইয়া উঠিলো। দু-চার দিন পরেই কটক ও পুরুলিয়া হইয়া হরিদ্বার রওনা হইলাম। পুরুলিয়ায় জার্ম্মাণ মিশনারীদের কুষ্ঠাশ্রম দেখিয়া অবাক্ হইতে হইলো। ভাবিলাম—সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া আমাদের দেশে আসিয়া এরা এতো বড় বড় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতেছে, আর আমাদের দেশের দুর্গত ভাইদের জন্য আমরা কি করিতেছি। পরাধীনতাই আমাদের একমাত্র ব্যাধি নয়।

প্রেম ও সেবার ভাব ধারাই যেন আমাদের প্রাণে দিনের পর দিন শুকাইয়া যাইতেছে। বারিপদায় খৃষ্টান মিশনারীদের কুষ্ঠাশ্রম দেখিয়াও এমনি ধরণের ভাবই আমার প্রাণে জাগিয়াছিলো। বারিপদার কুষ্ঠাশ্রমের সামনের ফটকের মাথায় লেখা— তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক হে ভগবান, আমার নয়—বাইবেলের এই ভাবটির অনেক খানি অনুভূতি না হইলে, কুঠেদের জড়াইয়া ধরিয়া জীবনভোর সেবা করা অসম্ভব। এ-রূপ সেবায় এই রোগের কবলে এদের অনেককে পড়িতে-ও হইয়াছে। এ-ভাবে রোগাক্রান্ত জনৈক মিশনারীর কথা—এতোদিনে সেবা সার্থক হোল, কারণ আমি নিজেও এখন এদের সাথী—আমার প্রাণে চিরদিনই জ্বল্ জ্বল্ করিয়া জলিবে।

হরিদ্বারের পথে মোগলসরাই ষ্টেশনে ইন্দু সরকারের সাথে দেখা হইলো। ইন্দু ফরিদপুরের জমিদার ঈশান বাবুর ছেলে। সে আমারই সাথে তিন নম্বরে থাকিতো এবং আমার ভাবের ছোঁয়াচও তার প্রাণে কতকটা লাগিয়াছিলো। তার দেওয়া একটি ফুটি ও প্রণাম লইয়া বেলা প্রায় দশটার সময় অতি তাড়াতাড়ি হরিদ্বারের গাড়ীতে উঠিলাম। কারণ, যাত্রীর ভিড়ের ঠেলায় হরিদ্বারের গাড়ীতে জায়গা পাওয়ার আশা ক্রমশঃই অন্ধকার পক্ষের চতুর্দ্দশীর চাঁদের মতো ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিলো। না-নাওয়া না-খাওয়া অবস্থায় সেখান থেকে রওনা হইয়া ভোর চারটায় হরিদ্বার গিয়া নামিলাম। এই আঠারো ঘণ্টা ঠায় বসিয়া কাটাইতে হইয়াছে, প্রস্রাব করার জন্য পর্য্যন্ত উঠিতে সাহস হয় নাই, পাছে জায়গা খোওয়া যায়। হাতের ফুটিটা

হাতেই রহিলো, জল অভাবে খাওয়ার স্থযোগ হইলো না। হরিদ্বারে থাকার জায়গা লইয়া গাড়ীতেই একটি দল পাকানো গেলো। ষ্টেশনে নামিয়া একটা জায়গা যোগাড়ের জন্য তারা এধার ওধার ছুটাছুটি করিতে লাগিলো। কিন্তু কোন স্থবিধাই হইলো না। তাদের এ-ভাবে ছুটাছুটি করিতে দেখিয়া আমার ভারী বিরক্তি ধরিলো। আমি ষ্টেশনের সামনের খোলা মাঠেই কণ্ কণে শীতের মাঝে ঘাসের উপর শুইয়া পড়িলাম। আমার সম্বলের মধ্যে ছিলো পকেটে কয়েক আনা পয়সা, গায়ে একটি টুইলের সার্ট ও একখানা পুরাণো ছাই রংএর আলোয়ান, পায় একজোড়া আধা-ছেঁড়া চটিজুতা এবং হাতে পরিবার দু-খানা কাপড় ও ইন্দুর ভক্তির দান সে ফুটিটি। ঘুম ভাঙ্গার পর দেখি মাঠের কিনারের গাছের ডগায় ভিজে পাতাগুলি অরুণ কিরণে চিক্‌মিক্ করিতেছে—আমার চারিপাশে বহু কাবুলী শোওয়া। তাদের গায়ের গন্ধে শরীর ঘিন্ ঘিন্ করায়, ফুটিটি হাতে লইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া, সেখান থেকে কনখলের পথে রওনা হইলাম। খানিক আগাইয়াই দেখি পাশের একবাড়ীর গায়ে লেখা—বাঙ্গালীদের ধর্ম্মশালা। আশায় প্রাণ আনন্দলহরী নাচিয়া উঠিলো। তাড়াতাড়ি সামনের দাওয়ায় বসিলাম। একটু পরেই সমুখের দুয়ার দিয়া চাকর গোছের একজন লোক বাহির হইয়া আসিলো। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ধর্ম্ম-শালায় থাকার কোন জায়গা আছে কি না। সে বলিলো—হাওড়ার কোনো বড় উকীল ডবল টাকা দিয়ে সব বাড়ীটা দখল করেছেন, এখন আর কোন জায়গা নাই। কোন সহৃদয় ব্যক্তির

দেওয়া টাকায় তৈরী এই ধর্ম্মশালাটির ধাপ্পাবাজ মোহন্তের হাতে পড়িয়া এই অধোগতি—একথা ভাবিতে ভাবিতে বিরক্ত হৃদয়ে সেখানে হইতে রওনা হইলাম। শরীরের অত্যধিক ক্লান্তি হেতু ঝুটিটি ভারী বোধ হওয়ায়, সেটিকে সেই দাওয়ায়ই রাখিয়া যাইতে হইলো।

কনখল রামকৃষ্ণ মিশন।

একটু পরেই রাস্তার পাশে সাইন্ বোর্ড দেখিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলাম। ঢুকিয়া দেখি গুরুদাস ইতিপূর্ব্বেই সে-খানে আসিয়া হাজির হইয়াছে। সে বুদ্ধিমান লোক, উদ্বোধন আফিস হইতে পরিচয় পত্র আনিয়াছে। তাই তার সেখানে সহজেই আশ্রয় মিলিয়াছে। মিশনের অধ্যক্ষ কল্যাণানন্দ স্বামীর চরণধুলি নেওয়া মাত্রই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—সাথে কোন চিঠি আছে কিনা। না—উত্তর পাইয়া বলিলেন—একটা জায়গা শীঘ্র করে খুঁজে নিন্, নইলে শেষে ভিড়ের ঠেলায় টেকাই দায় হবে। দ্বিতীয় কথা বলা নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া আমি ও গুরুদাস চট্ করিয়া সেখান হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম—উদ্দেশ্য, যতো শীঘ্র সম্ভব কোথাও কিছু খাওয়া, ক্ষুধায় যে পেট চোঁ চোঁ করিতেছিল। মিনিট পাঁচেক জোরে চলার পরই পিছনে শুনিতে পাইলাম—থামুন, থামুন, স্বামীজী আপনাদের ডাকছেন। মুখ ফিরাইয়াই দেখি, সামনে হাত তুলিয়া আমাদের থামিতে ইঙ্গিত করিতে করিতে, গেরুয়া পাগড়ী মাথায় জনৈক তরুণ সন্ন্যাসী ঊর্দ্ধশ্বাসে আমাদের পানে

ছুটিয়াছেন। কাছে আসিয়াই তিনি বলিলেন—চলুন, স্বামীজী আপনাদের যেতে বলেছেন। আমি বলিলাম—দেখা তো করে এসেছি, তবে আর কেন? না, না, তা হবে না—বলিয়াই তিনি আমাদের হাত ধরিয়া টানিতে লাগিলেন। অগত্যা যাইতেই হইলো। স্বামীজীর কাছে যাওয়া মাত্রই তিনি হাত বাড়াইয়া চেয়ার দেখাইয়া বলিলেন—আসুন, আসুন, বসুন, পরিচয়টা-ও-তো দিতে হয়। যে পোষাক পরে এসেছেন, চেনাও যে দায়! আমি তো একেবারে অবাক্। তিনি আবার বলিলেন—চা-টা'র অভ্যাস আছে কি? হাঁসিয়া হাঁ বলা মাত্রই তিনি চেঁচাইয়া বলিলেন—হরেণ, এক পেয়ালা চা নিয়ে এসো, সাথে কিছু খাবারও এনো। হরেণ মিশনেরই জনৈক ব্রহ্মচারী —কম্পাউণ্ডারী করে। খাওয়া সুরু করিতে না করিতেই তিনি বলিতে লাগিলেন—পাঁচ হাজার টাকা খরচ করে কুম্ভ-মেলার জন্য কলেরা ওয়ার্ড তৈরী করা হয়েছে, যুক্ত প্রদেশের স্যানিটারী কমিশনার একটু পরেই দেখতে আসবেন, দেরাদুন থেকে ডাঃ মৈত্রের আসার কথা ছিলো, তিনি এখনো এসে না পড়ায় বড়ই মুস্কিলে পড়েছি। পাশ করা ডাক্তার না দেখাতে পারলে স্যানিটারী কমিশনার হয়তো এখানে রোগী রাখতেই দেবেন না, আপনি দয়া করে এ-ভার নিলে বড়ই উপকার হয়। আমি বলিলাম—সাধু দেখতেই আমার হরিদ্বারে আসা—সে-বিষয়ে কোন অসুবিধা না হ'লে অবসর সময়ে হাঁসপাতালের কাজ করতে প্রস্তুত আছি। তাতেই তিনি হাসিয়া রাজী হইলেন। একটু পরেই কমিশনার সাহেব

আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাকে দেখা মাত্রই স্বামীজী আমাকে সাথে করিয়া তার কাছে গেলেন—গিয়া মাটিতে প্রায় মাথা ঠেকাইয়া অভিবাদন জানাইলেন। আমি তো মনে মনে চটিয়াই অস্থির—এদের এ-কেমন কাণ্ড, সরকারের গোলাম না হয়েও কেন এদের এতো দাস-মনোভাব। সামান্য কথাবার্ত্তার পর আমার উপর হাঁসপাতালের ভার দিয়া কমিশনার সাহেব সেখান হইতে বিদায় হইলেন।

মিশনে অবস্থান

সেখান থেকে ফেরার পরই স্বামীজী আমার থাকার জন্য আলাদা একখানা ঘর ঠিক্ করিয়া দিলেন। এ-ঘর খানিতে স্বামী তুরীয়ানন্দ বহুদিন বাস করিয়াছেন জানিয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধায় আমার সারা প্রাণ ভরিয়া উঠিলো। সেই ঘরের প্রতি প্রান্ত হইতে শুচিতার শুভ্র তরঙ্গ আসিয়া আমার প্রাণে পবিত্রতার ভাব জাগাইয়া তুলিলো। এমনি ধারা প্রাণে পাশের একখানা চৌকীতে বসিতে না বসিতেই, আর একজন সন্ন্যাসী ঘরে ঢুকিয়া অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া বলিলেন—বড় বেহায়া আজকালকের ছেলের দল, তোমার একটু লজ্জাও হলো না স্বামী তুরীয়ানন্দের চৌকীতে বস্‌তে। আমি ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া চৌকী ছাড়িয়া উঠিতে না উঠিতেই স্বামীজী বাহির হইয়া গেলেন। দিশেহারা হইয়া কি করিব ভাবিতেছি, এমন সময় স্বামী কল্যাণানন্দ ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—এখানকার কর্ত্তা আমি, কেউ কিছু বল্লে বলবেন, এ স্বামী কল্যাণানন্দের হুকুম। আশ্বস্ত হইয়া চৌকীর উপর বিছানা পাতিলাম।

সাধু দর্শন

বিকালে গুরুদাসের সাথে সাধু দেখার জন্য বাহির হইয়া প্রথমেই গেলাম বাবা গম্ভীরানাথের আখড়ায়। বহুদিন থেকেই গম্ভীরানাথের কথা শুনিয়া আসিতেছি। তার সম্বন্ধে তখন আমার স্মৃতি নানারূপ সম্ভব অসম্ভব গল্প গুজবে আচ্ছন্ন। তার ঘরে ঢুকিয়াই দেখি শুভ্র শ্মশ্রুগুম্ফযুক্ত মাঝারি গড়নের, ফর্সা রংএর জনৈক সাধু চোক বুজিয়া বসিয়া আছেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম ইনিই প্রসিদ্ধ সাধু বাবা গম্ভীরানাথ। তার ডান পাশে কালো রংএর একজন বলিষ্ঠ বাঙ্গালী যুবক। যুবকটির সামনে খান বারো কল্‌কে ও গাঁজা সাজার যাবতীয় সরঞ্জাম। বাবাজীর বাম পাশে সার বাঁধিয়া বসা বিভিন্ন বয়সের ও বর্ণের জনাদশেক সাধু। তাদের কারো চোখ আধ-মেলা জবার মতো লাল—কারো একেবারে বন্ধ। বাঙ্গালী যুবকটির ক্ষিপ্র হস্তে সাজানো গাঁজার কল্‌কেগুলি মিনিটে মিনিটে বাবাজীর সেবা পাওয়ার পর বাঁয়ে বসা সাধুদের হাতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সাধুদের নাক মুখ হইতে বহির্গত ধোঁয়ায় সারা ঘরটি ভরা। দম আটকাইয়া আসে। এরূপ স্বামীজীর সাথে কোন কথা বলার প্রবৃত্তি আমাদের হইলো না। কথাবলার মতো অবস্থা স্বামীজীর-ও ছিলো কিনা সন্দেহ। স্বর্গলাভের মোহে মুগ্ধ শিক্ষিত বাঙ্গালীর মস্তিষ্কের অপব্যবহারের কথা ভাবিতে ভাবিতে বিষণ্ণ মনে আমি ও গুরুদাস সেখান থেকে বাহির হইয়া আসিলাম। সাথ সাথে সাধু দেখার সখও অনেকটা মিটিলো।

সাধু-সঙ্গ

এর পর থেকে হাঁসপাতালের কাজেই বেশী মন দিলাম। একদিন সকালে আউট ডোরে বসিয়া রোগী দেখিতেছি, এমন সময় কালো রংএর রোগাপানা জনৈক বৃদ্ধ সাধু হাসিতে হাসিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কুম্ভমেলা উপলক্ষে গঙ্গার পাড় ও খানিকটা মাঝ পর্য্যন্ত লোহার কাঁটা-ওয়ালা তার দ্বারা ঘেরা হইয়াছিলো। উদ্দেশ্য বোধ হয় ভীড়ের চাপে কেউ যেন নদীতে না পড়িতে পারে। স্নান করিতে নামার সময় সেই তারের কাঁটা সাধুর পায় লাগায় অনেকখানি কাটিয়া যায়। হাঁ করা ঘা হইতে তখনো কোঁটা কোঁটা তাজা রক্ত ঝরিতেছিলো। আমি একটু বিস্মিতভাবে তার পানে চাহিয়া বলিলাম—হাসার কি হয়েছে? সাধু মাদ্রাজী, বহুদিন হইতে হরিদ্বারে আছেন বটে, কিন্তু হিন্দী অল্প স্বল্প বুঝিলেও বলিতে মোটেই পারেন না। তাই হাসিয়া সংস্কৃতে বলিলেন—ইত্যেব প্রকৃতেলীলা। আমি তাকে হাঁসপাতালে থাকিতে বলিলাম। কিন্তু তিনি রাজী হইলেন না—ওষুধ ও পটি লাগাইয়া চলিয়া গেলেন। তাহার যাওয়ার একটু পরেই স্বামী কল্যাণানন্দ আসিয়া বলিলেন—সাধু দেখার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু সত্যিকার সাধু যে আপনার দোর ছোঁতেই ফিরে গেলো। আমিতো অবাক্। তারপর স্বামীজি বলিতে লাগিলেন—এ-সাধুটি বহু দিন ধরে হরিদ্বারে আছেন, নদীর তীরের একটি গুহায় থাকেন, কারো কাছ থেকে কখনো কিছু চান না, অযাচিত ভাবে যখন যা মিলে তা খেয়েই সাধন ভজনে দিন কাটান।

তারপর দিন সাধু আবার আসিলেন। পা ফুলিয়া ঢোল হওয়ায় সেদিন আর তাহার গুহায় ফিরিয়া যাওয়া সম্ভব হইলো না, হাঁসপাতালেই রহিলেন। আমার একটু পরের অস্ত্রোপচার তার মুখ থেকে হাসি ছাড়া আর কিছুই বাহির করিতে পারিলো না। এখন থেকে হাতের কাছে পাইয়া একে দিন রাত সেবা করিতে লাগিলাম। তিন চার দিনের সেবার পর পরিচয় খানিকটা জমিয়া আসিলো। তখন আমি তাকে একখানা বই পড়াইতে অনুরোধ করিলাম। তিনি বলিলেন—ছাত্র পড়ানো আমার রীতি-বিরুদ্ধ, তবে তুমি আমার সেবা কচ্ছ, এ-জন্য আমিও তোমার সেবা করে প্রতিদান দেবো। গীতা পড়ানো ঠিক হইলো। একদিন রাতে গীতা পাঠের শেষে বাহিরে আসিয়া দেখি আমার জুতা জোড়া কোথায় যেন চলিয়া গিয়াছে। অনেক খোঁজার পরও না পাওয়ায় বিষণ্ণ মনে খালি পায় ঘরে ফিরিতে হইলো। পরদিন প্রাতে গিয়া দেখি জুতা জোড়া তার ঘরের কোণে পড়িয়া আছে। বুঝিতে একটুও দেরী হইলো না—তিনিই খুঁজিয়া জুতা জোড়া বাহির করিয়া সেখানে রাখিয়াছেন। কেন এ-রূপ করিলেন জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—তোমার মনে দুঃখ হইয়েছিলো কি না তাই। ভাবটা এ-ভাবেই জমিতে লাগিলো। শেষে গীতার সাথে সাথে সাংখ্য পড়ান-ও সুরু হইলো। একদিন দুপুরে সাংখ্য পড়িতে পড়িতে আমার ক্লান্ত দেহ ঘুমে অভিভূত হইয়া তার বিছানার উপর এলাইয়া পড়িলো। জাগিয়া দেখি তিনি আমায় বাতাস করিতেছেন। রাগিয়া কারণ

জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—গা দিয়ে ঘাম বেরুচ্ছিলো যে!

তার সাথে আমার কথা বার্ত্তা চলিতো ভাঙ্গা সংস্কৃতে—তিনি অবশ্যই শুদ্ধ সংস্কৃত বলিতেন। ক্রমশঃ জানিতে পারিলাম তিনি নয় বৎসর বয়সে সন্ন্যাসী হইয়াছেন, কখনো বিয়ে করেন নাই। এখন তার বয়স বাহাত্তর। কামভাব তার হৃদয়ে কখনো জাগে কিনা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—দেহ থাকা অবধি একটু না একটু কামভাব থাকবেই। তখন একথাটা কেমন কেমন ঠেকিয়াছিলো। কিন্তু এর পর মহাত্মা গান্ধীর সাথে আলাপ করিয়া বুঝিয়াছি এই সাধুর কথাই ভড়ংশূন্য নির্ম্মল সত্য। একদিন তাহাকে ভাগবত পাঠ করিতে বলিলাম। তখন ভাব খুব জমিয়া উঠায় আমার কোনো কথাতেই তিনি না বলিতেন না। তিনি বলিলেন—ভাগবত পড়তে হবে রাত বারোটার পর, ভাগবত সকলের জন্য নয়, একমাত্র পবিত্র হৃদয়েরই এতে অধিকার। রাত বারোটার পর নিরালা কক্ষে ভাগবত পড়া সুরু হইতে না হইতেই, তার চুলগুলো খাড়া হইয়া উঠিলো, সারা-গা পুলকে ভরিয়া গেলো, এমনি মত্ত হইয়া উঠিলেন যে আমি একেবারে অবাক। দশম স্কন্ধ পড়া হইতেছিলো। শ্রীকৃষ্ণের প্রেম লীলায় তা ভরা। সেই প্রেমকে কাম বলিয়া ব্যাখ্যাও অনেকে করিয়াছেন। কিন্তু সে অধ্যায় পড়ার সময় সেই বুড়া সাধুর যে সব ভাব দেখিয়াছি, তাহা হইতে আমার উপলব্ধি হইয়াছে, অনধিকারীর হাতে পড়িয়াই ভাগবতের বর্ত্তমান এ-দুর্গতি।

গান্ধীজীর সাথে দ্বিতীয় সাক্ষাৎ

এমনি আনন্দ-উথল দিনগুলিকে আরো উজ্জ্বল করিয়া আচম্কা একদিন মহাত্মা গান্ধী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহাত্মাজীর সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ শান্তি-নিকেতনে শেষবারের এম্ বি, পরীক্ষার দু-চারদিন পর। তাঁর সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যেই আমি কলিকাতা হইতে বোলপুর গিয়াছিলাম। শান্তিনিকেতনের পক্ষ হইতে মহাত্মাজীকে দেওয়া বৈদিক ধরণের অভিনন্দন আমার চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলো, বিদেশী সভ্যতার স্রোতে ভাসিয়া আমরা আমাদের চিরন্তনী ভাবধারা হইতে কতোদূরে সরিয়া পড়িয়াছি। একদিন মহাত্মাজীর সাথে চার ঘণ্টা ধরিয়া আমার আলাপ হইলো। স্বদেশ সেবক তৈরীর উদ্দেশ্যে আমরা একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনার চেষ্টায় আছি, চিরজীবন অবিবাহিত থাকিয়া দেশ সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত কয়েকটি ছেলে-ও জুটিয়াছে —এ-সব কথা তাঁকে আমি খুলিয়া বলিলাম। তিনি আমার সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া সুখী হইয়া বলিলেন—অবিবাহিত থাকার সঙ্কল্প সম্বন্ধে শিথিলতা করোনা কখনো, এতটুকু সঙ্কল্প পালনের শক্তিও যাদের নাই, তাদের থেকে বড়ো কাজের আশা মরিচিকা মাত্র। এরপর ব্রহ্মচর্য্য, হিন্দিশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও অনেক কথা তার সাথে হইলো। হরিদ্বারে দেখিয়াই তিনি আমায় চিনিতে পারিলেন। বলিলেন—তুমি আবার এখানে এসে জুটলে কোত্থেকে। আগাগোড়া সব কথা

শুনিয়া তিনি বলিলেন—এদের ভাবে এরা ভালো কাজ করছে বটে, কিন্তু এদের সাথে তোমার কোনো মিল নাই।

চন্দ্রশেখর কালী

সেবার কুম্ভ মেলা উপলক্ষে কলেরার প্রকোপ খুব বেশী হওয়ায় আমাদের হাঁসপাতালের বিছানা ক-টি হু হু করিয়া ভরিয়া গেলো। কলেরা হাঁসপাতাল আধা-আধি দু-ভাগে বিভক্ত ছিলো। এক ভাগের ভার ছিলো আমার উপর। অন্য ভাগ দেখিতেন কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালী মহাশয়। নূতন কোনো রোগী আসা মাত্র তিনি ভালোরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন, পরে অপেক্ষাকৃত ভালো রোগীটিকে রাখিতেন নিজের ওয়ার্ডে, আর যে সব রোগীকে তিনি তার চিকিৎসার বাইরে মনে করিতেন তাদের পাঠাইতেন আমার কাছে। বলিতেন—স্যালাইন ইন্‌জেকসনই এদের বাঁচার একমাত্র ভরসা। চিকিৎসা শেষে দেখা গেলো মরা-বাঁচার হার উভয়েরই সমান—যদিও হোমিওপ্যাথিকের কৃতিত্ব নির্ভর করিতেছে সোজা কেস্‌গুলির উপর—যে সব কেস্ আমার মতে বিনা ওষুধে শুধু শুশ্রূষা দ্বারাই আরোগ্য হইতে পারিতো।

গুরুকুল বিদ্যাপীঠ

কিছুদিন পর হেমেন্দু কনখলে আসিয়া উপস্থিত হইলো। তাকে লইয়া আমি গুরুকুল বিদ্যাপীঠ দেখিতে যাই। গুরুকুলের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা মুন্সীরাম (পরে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ) তখন

সেখানেই ছিলেন। তাঁর সাথেও আমার সঙ্কল্পিত প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে দীর্ঘ আলাপ হইলো। এ-সম্বন্ধে তিনি আমায় দুটি উপদেশ দিলেন। এক—আর্থিক আনুকূল্যের জন্য এ-ধরণের প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়া উচিত কাশীর মতো হিন্দুদের কোনো প্রধান তীর্থস্থানে। দ্বিতীয়—আত্মমর্যাদা বজায় রাখিতে হইলে এ-ধরণের প্রতিষ্ঠানের সরকারী সাহায্য নেওয়া উচিত নয় কখনো। মহাত্মাজীও তখন গুরুকুলে ছিলেন। গুরুকুল ও শান্তিনিকেতনে পার্থক্য কি, আমার এই প্রশ্নের উত্তরে মহাত্মাজী বলিলেন—শান্তিনিকেতনে আর্ট আছে গুরুকুলে আর্ট নাই, যেখানে আর্ট সেখানেই জীবন। আর্ট ও অনার্টের পার্থক্য তখন বুঝিতাম কম-ই। কাজেই মহাত্মাজীর এই সুন্দর কথা কয়টির মানে তখন অনেকটা আবছাই রহিয়া গেলো। গুরু-কুলে দু-দিন ছিলাম। এ-দুদিনে প্রত্যেকটি বিভাগ ঘুরিয়া ফিরিয়া ভালো করিয়া দেখিলাম। মহাত্মা মুন্সীরামের তেজো-গম্ভীর মূর্তি আমার খুবই ভালো লাগিয়াছিলো। সরকারের সাথে এদের কোনো সম্পর্ক নাই, দেশের লোকের কাছ থেকে চাঁদা নিয়াই এদের চলে, সরকার সাহায্য দিতে চাহিলেও এরা নেয় না—তার মুখ হইতে এ-সব কথা শুনিয়া আমি প্রাণে নূতন আলো পাইলাম। প্রাতে ও বিকালে পার্শিয়ান হুইলে তোলা কুয়ার জলে নাওয়া পীতবসন পরা ব্রহ্মচারীদের সাড়ি বাঁধিয়া যাইতে দেখিয়া আমার প্রাণ উৎসাহে উদ্বেল হইয়া উঠিতো। কিন্তু এদের যজ্ঞ প্রভৃতি অনুষ্ঠান আমি জাতির অগ্রগতির পরিপন্থীই মনে করিতাম।

আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। সারা পৃথিবী জোছ্‌নায় ভরা। রাত প্রায় নয়টা। এমন সময় আমি ও হেমেন্দু বেড়াইতে গেলাম গুরুকুলের পাশ-দিয়া প্রবাহিত গঙ্গার মধ্যবর্ত্তী ছোট ছোট গাছে ঘেরা ক্ষুদ্র একটি দ্বীপে। দ্বীপটির উপর কালো রঙের ছোট বড় অনেক পাথর বিচ্ছিন্ন ভাবে পড়িয়া ছিলো। তাদেরই একটির উপর দু-জনে পাশাপাশি বসিয়া চাঁদের পানে চাহিয়া রহিলাম। হেমেন্দু গান ধরিলো। প্রাণের ভক্তি উৎস হইতে উচ্ছ্বসিত সে গান আমায় মুগ্ধ করিলো। হেমেন্দুর অশ্রুসিক্ত মুখের উপর চাঁদের কিরণ-খেলার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সে-গানের আনন্দের সাথে মিশিয়া আমায় এক অজানা স্বপ্নরাজ্যে লইয়া গেলো। হেমন্দু যে আমার কর্ম্ম জীবনের সাথী হইবে না, একথা আমার স্বপ্নেও মনে হয় নাই। সে এখন পাটনায় একজন বড় ডাক্তার। আজো অবিবাহিত। আমার অতীত আশা ও তাহার বর্ত্তমান জীবনের মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়? এ-দুটির মধ্যে কোনটি সত্য, না উভয়টিই সত্য। শুধু তার নয়—তরুণ বয়সের অনেক বন্ধুর জীবনেই এরূপ পরিবর্ত্তন দেখিয়াছি। কারো সম্বন্ধে আমার কোনো অভিযোগ নাই। আমার এ-জীবন প্রবাহের সাথে তাদের প্রবাহ কিছুদিনের জন্য মিশাইয়া দিয়া আমায় পুষ্ট করিয়া তারা আবার তাদের নিজ পথে চলিয়া গিয়াছে, এ-জন্য আমি তাদের কাছে চির কৃতজ্ঞ। আমি নিজেও কতো পুরাতন ধারা ছাড়িয়া নূতন ধারার সাথে মিশিয়াছি। এ-রূপ যুগের পর যুগ, ধারার পর ধারা বহিয়া, নিজে অনুপ্রাণিত হইয়া, পরকে অনুপ্রাণিত করিয়াই তো চলিতে হইবে জীবনের অসীম অনন্ত পথে।

গুরুকুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমরা দু-জনে গেলাম হৃষীকেশ ও লছ্‌মনঝোলায়। হৃষীকেশে এক জোছ্‌না-রাতে আমরা দু-জনে আশ্রয় লইলাম কুলকুল-করে বহিয়া-চলা সুরধনীর বালুতটে। আমাদের উভয় পাশে অসংখ্য সন্ন্যাসী। একটু দূরে স্ত্রী পুত্র ছেলে মেয়ে সহ গৃহস্থের দল। হেমেন্দুর কাছে কিছু টাকা ছিলো। সকলেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। আমার আর ঘুম আসে না। বার বারই মনে হইলো—এতোগুলো টাকা লইয়া দায়িত্ব হীন সন্ন্যাসীদের মাঝে শুইয়া আছি, কিযে হয় বলা যায় না। খানিক পরে হেমেন্দুকে ডাকিয়া বলিলাম —চল্ যাই বরং শুইগে সংসারীদের মাঝে, তারা স্ত্রীপুত্র নিয়ে বাস করে, অনেকটা নিরাপদ। কথাটা সামন্য বটে কিন্তু এখনো ভুলিতে পারি নাই। শুধু মনে হয় সংসারের উন্নতি সম্ভব— দায়িত্বহীন ভবঘুরেদের দ্বারা নয়, সংসারের মাঝে থাকিয়াই সংসারের সেবা যারা করে একমাত্র তাদের দ্বারা।

হৃষীকেশ থেকে আমরা যাই দেরাদুন। সেখানে এক আঁধার রাতে আকাশের গায় বহু দূর বিস্তৃত আলোর মালা দেখিয়া অভিভূত আমি পাশের একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম ওটা মুসুরীর পাহাড়। তারপর দিনই আমরা দু-জনে হাঁটিয়া রওনা হইলাম মুসুরী পাহাড় চড়ার উদ্দেশ্য। বাদলা দিনের দারুণ শীতে গরম কাপড় ও কম্বল শূন্য অমরা দুটি জীব বনবিভাগের জনৈক বাঙ্গালী চাকুরের প্রসাদে প্রাণ বাঁচাইয়া দেরাদুনে ফিরিয়া আসিলাম।

হরিদ্বার ফিরিয়াই দেখি সাধুজী অনেকটা আরোগ্য হইয়া

গুহায় ফিরার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। যাওয়ার আগে হরিদ্বার তীর্থে আসা জনৈক শেঠের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণ আটা ও ঘী মাগিয়া আনিয়া মিশনে দিলেন। এরূপ করার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—দশজনের দানে-চলা এ-মিশনের টাকা এমনি এমনি খাওয়া ঠিক নয়। এই বুড়া সাধুর কর্ত্তব্য বোধ আমাদের দেশের কতক পরিমাণ লোকের থাকিলেও, অনেক জাতীয় প্রতিষ্টান সহজে মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইতে পারিতো। তার গুহায় যাওয়ার পর থেকে, আমিও দিনের বেশীর ভাগ সময় সেই গুহায়ই কাটাইতে লাগিলাম। ফলে তার অনুষ্ঠিত সাধন ভজনও কিছু কিছু শিখিলাম। ক্রমে ক্রমে ইচ্ছা হইলো, এর কাছে সন্ন্যাস লইয়া, হৃষীকেশের কোন নির্জ্জন গুহায় বহুদিন সাধন ভজন করিয়া, বাংলায় ফিরিব। সন্ন্যাস দিতে রাজী হইয়া তিনি বলিলেন—দু-দশ জন সন্ন্যাসী খাওয়াইতে বিশ পঁচিশ ঠাকা দরকার হইবে। জনৈক শেঠজীর কাছ থেকে সেই টাকা চাহিয়া নেওয়ার পর তিনি আমায় সন্ন্যাস দিবেন। সন্ন্যাস নেওয়ার প্রতীক্ষায় আছি, এর-ই মধ্যে উল্টো এক ঘটনার টানে আমার জীবন ধারা বহিলো অন্য এক পথে। যোগেনের এক চিঠিতে জানিলাম—আমাদের কলিকাতার ভাইদের মধ্যে দলাদলির সূত্রপাত হইয়াছে, শীঘ্রই আমার একবার কলিকাতা যাওয়া দরকার হইতে পারে। পর দিন-ই কলিকাতা যাওয়ার জরুরী তলব সহ গিরীশের একপত্র আসিলো। প্রাণের দায়ে সেই রাতেই কিছুদিনের জন্য সাধুর মায়া ছাড়িয়া কলিকাতা রওনা হইলাম।

২।১১ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট্।

কলিকাতা পৌছিয়াই দেখি ২।১১ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে যোগেন, নৃপেন প্রভৃতি মিলিয়া আমাদের ভাইদের জন্য একটি আড্ডা করিয়াছে। এই আড্ডাটি আমাদের একেবারে খাস ছিলো বলিয়া এখানেই অভয় আশ্রমের প্রথম প্রতিষ্ঠা বলা যাইতে পারে। সূত্রপাত তিন নম্বরের মেসে হইলেও, সেখানে বহিরঙ্গ মেম্বরদেরই ছিলো আধিক্য। খোঁজ করিয়া বুঝিলাম দলাদলির মূল কারণ সূক্ষ্ম হইলেও ব্যাপারটি বর্ত্তমানে খুবই স্থূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একদিকে প্রফুল্ল, নৃপেন, যোগেন, গিরীশ প্রভৃতি—অন্যদিকে হেমন্ত ও সুভাষ। দোটানায়ও অনেক আছে। আমি আমার ব্যক্তিগত প্রভাবে সাময়িক একটা মীমাংসা করিলাম বটে, কিন্তু দালানের ছাদের ফাটলের মতো, দলে একবার বিরোধ দেখা দিলে, শত জোড়াতালি সত্ত্বেও তার অবসান সম্ভব হয় না। ফাটল ক্রমশঃ গভীর হইয়া শেষে দালানকে চুরমার করিয়া ছাড়ে।

ব্রাহ্মণ বাড়িয়ার বন্যা

এর কিছু দিন পরে ব্রাহ্মণ বাড়িয়া বন্যায় ভাসিয়া যায়। সদ্য প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় হিত সাধন মণ্ডলীর তরফ থেকে সেখানে আমাদের যাওয়ার আহ্বান আসিলো। আমি সানন্দে এই আহ্বান মাথা পাতিয়া লইলাম। এরূপ সেবার ভিতর দিয়াই আমাদের প্রতিষ্ঠানটির রূপ দিতে হইবে, এ-মনোভাবই ছিলো এ-নিমন্ত্রণ স্বীকারের মূলে। ঠিক হইলো, টাকা যোগাইবেন হিত

সাধন মণ্ডলীর সম্পাদক ডাক্তার দ্বিজেন মৈত্র মহাশয়—আর আর কাজের ভার থাকিবে আমাদের উপর। আমি, কালু, বিধু প্রভৃতি ছয়জন কলিকাতা হইতে রওনা হইলাম। সংবাদ পাওয়া মাত্র ঢাকা হইতে প্রফুল্ল-ও আসিয়া জুটিলো। ব্রাহ্মণ বাড়িয়া থেকে সাত আট মাইল দূরে সাতগাঁ গ্রামে মাইনর স্কুলের আটচালাঘরে আমাদের থাকার বন্দোবস্ত হইলো। দত্তখোলার নমঃশূদ্রদের মাঝেই আমাদের বেশীর ভাগ চাল বিতরণ হইতো। সেখানকার নমঃশূদ্রদের খৃষ্টান করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত মিশন স্কুলটি আমার প্রাণে বার বার ধিক্কারের সুর জাগাইয়া তোলে। সর্ব্বক্ষণ মনে হইতো কিরূপে এদের জন্য কিছু করা সম্ভব। সেখানকার মাতব্বরদের সাথে এ-সম্বন্ধে আমার অনেক আলাপ-ও হইয়াছিলো। কিছু করিলে যে তারা রক্ষা পায় এ-ও তাদের কথাবার্ত্তা থেকে বুঝিলাম। কিন্তু করে কে? যৌবনে ত্যাগের যে আগুন প্রাণে জ্বলিলে, সারা জীবন ধরিয়া দেশ-সেবা যজ্ঞে নিজেকে তিলে তিলে আহুতি দেওয়া সম্ভব, সে-অনল আমাদের প্রাণে কই? তরুণদের তেজ নিভিয়া যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা পাড় হইয়া বিশাল সংসারে পা দিতে না দিতে। সোণার চাঁদ ছেলেরা মুষড়াইয়া যে কি হয় দেখিলে প্রাণ ফাটিয়া চোখে জল আসে। পঁচিশ বছর আগের, বঙ্গবিভাগের যুগের, বাংলার তরুণদের প্রাণে আজ-ও যদি স্বদেশীভাব প্রভাত তারার মতো জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতো, তবে বাঙ্গালীদের জ্বালা আগুণেই সারা ভারতে বিদেশী শাসন পুড়িয়া ছাই হইতো।

কাশীর টোলে

সাতগাঁ হইতে ফিরিয়া আসিয়া গুরুদাসের সাথে হাজারীবাগ ও গয়া ঘুরিয়া আমি একা যাই কাশী। পূর্ব্ব বন্দোবস্ত অনুসারে রামকৃষ্ণ মিশনে প্রথম উঠিলাম। বেনারস-মিশনের তখনকার কর্ম্মকর্ত্তা চারুবাবুর মতো একনিষ্ঠ নীরব কর্ম্মী আরো কিছু জন্মাইলে বাংলার চেহারা আজ অন্যরূপ হইতো। দু-চার দিনের মধ্যেই মনীন্দ্র নন্দীর টোলে আমার থাকার জায়গা ঠিক হইলো। বাঙ্গালী টোলার একটি স্যাঁৎ স্যাঁতে সংকীর্ণ গলিতে টোলের দোতলা বাড়ীটি অবস্থিত। এখানে কাশীর বিভিন্ন টোলের জন পনর পড়ুয়ার বিনা ভাড়ায় থাকার জায়গা মিলে মাত্র, খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত তাদের নিজেদেরই অন্যত্র করিতে হয়। ওখানকার প্রায় সকলেই দুপুরে খাইতো রায় বাহাদুরের ছত্রে। আমিও তাদের সাথে জুটিয়া পড়িলাম। রাত্রে প্রায়ই খাওয়া হইতো না, কেননা খাইলে নিজের হাতেই রাঁধিতে হইতো। কলিকাতার এক ডাক্তার বন্ধুর মাঝে মাঝে পাঠানো চার পাঁচ টাকায়ই আমার যাবতীয় খরচ চলিয়া যাইতো। আমি পানিনী, মেঘদূত, সাংখ্য ও বেদান্ত পড়া আরম্ভ করিলাম। পড়ানোর নির্দ্দিষ্ট একটি জায়গা না থাকায়, পণ্ডিতদের বাড়ী ঘুরিয়া বিভিন্ন বিষয় পড়িতে হইতো। বেদান্তের পণ্ডিত ছিলেন স্বামী বেদানন্দ। আমাদের গ্রামের সোহং স্বামীর ভগ্নী স্বয়ংভাতী দেবীও তখন কাশীতে থাকিতেন। তার বেদান্তে বিশেষ দখল ছিলো। বেদান্তের অনেক পড়ুয়া

তার সাথে বেদান্ত আলোচনা করিতে যাইতো। আমিও মাঝে মাঝে যাইতাম। তার সাথে আমার পরিচয় পূর্ব্ব হইতেই ছিলো। মাস কয়েক পর হঠাৎ একদিন তিনি বলিলেন—কাশীর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী পক্ষের কাউন্সিলরূপে ব্যারিষ্টার বাবু কাশী এসেছেন—এক হোটেলে থাকেন। তার সাথে তার ছোটবোনটিও এসেছে—এখনই সে তার সাথে দেখা করতে আসবে। একটু পরেই নীচে মোটরের ভোঁ শোনা গেলো। এই মোটরই তার—বলিয়া সন্ন্যাসী ঠাকরুণ আমায় পাশের ঘরে অপেক্ষা করিতে বলিলেন। ব্যারিষ্টার বাবুর বোন চলিয়া গেলে পর তিনি আমায় বলিলেন—সে বল্লো কেন তুমি সন্ন্যাসী হয়ে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছো, ডাক্তারী করেইতো অনেকের উপকার করতে পারো। কথাটা আমার প্রাণে প্রকাণ্ড একটা মোচড় দিলো। খানিক পরে, ভারী হৃদয়ে, মন্থর গতিতে টোলের পথে চলাকালে সে-কথা কটিই আমার হৃদয়ে নানারূপে নাড়াচাড়া করিতে লাগিলো। টোলে পৌছিয়া দেখি যোগেনের এক পত্র আসিয়াছে। চিঠিতে অনেক কথার মাঝে লেখা আছে—যুগলের জন্য বন্দোবস্ত করা টাকার অনেক গোল-মাল হওয়ায় সময় মতো টাকা পাঠানো যাচ্ছে না, ফলে বিদেশে যুগলের বিশেষ অসুবিধা হচ্ছে। নিজের ক্ষমতার সদ্ব্যবহার না করিয়া পরের কাছে ভিক্ষা চাওয়ার সঙ্কোচও তাকে অনেকটা আড়ষ্ট করিয়াছে। তার মতে আমার এখন ডাক্তারী দ্বারা টাকা উপার্জ্জন করিয়া যুগলের খরচ চালানো উচিত। চিঠি পড়িয়া এক মুহূর্ত্তেই আমার পরের পদক্ষেপ ঠিক

হইয়া গেলো। পরের দিনই কলিকাতার গাড়ীতে চাপিয়া বসিলাম।

কলিকাতায় আসিয়া ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে উঠিলাম। কলিকাতার বন্ধুদের আমার প্র্যাক্‌টিস্‌ করা সম্বন্ধে দুমত হইয়া দাঁড়াইলো। তাদের মধ্যে এক দলের যোগেনের মতে সমর্থন ছিলো পূরা-পূরি। আর একদলের কাছে আমার প্র্যাক্‌টিস্‌ করাটা বড়ই বেসুরো ঠেকিলো। তারা আমাকে মনে করিতো এ-ধরণের সাধারণ বিষয় কর্ম্মের অনেক উপরে। তাই তাদের প্রাণের টন্‌টনে ব্যাথার মূল কারণ বুঝিতে আমার মোটেই বেগ পাইতে হইলো না। কিন্তু যোগেনের কথার ঔচিত্য অস্বীকার করাও অসম্ভব। যুগলের খরচ যোগানোর জন্য আমিই বিশেষ ভাবে দায়ী। দরকার হইলে এ-জন্য আমায় আগুণও বরণ করিতে হইবে। তাই আমি প্র্যাক্‌টিস্‌ করাই ঠিক করিলাম। আগের দলাদলি মিটার আগেই নূতন দলাদলির সূচনা হইলো।

প্রথম প্র্যাক্‌টিস্‌

দু-চারদিনের ইতঃস্ততের পর চাঁদপুরে প্র্যাক্‌টিস্‌ করাই ঠিক্‌ হইলো। দাদার বাসায় খাওয়া দাওয়া সারিয়া প্র্যাক্‌টিসে পাওয়া সব টাকা কলিকাতা পাঠানো যাইবে—এ সম্ভাবনাই ছিলো সেখানকার সব চেয়ে বড় আকর্ষণ। চাঁদপুর বসিতে না বসিতেই ঠাকুরমার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া বাড়ী যাইতে হইলো। আমাদের জাতীয় চরিত্রের একটি দিক ফুটাইয়া তুলিবে আশায় সেখানকার একটি ছোট ঘটনার উল্লেখ সংক্ষেপে নীচে করা গেলো।

আমাদের অঞ্চলে মেডিক্যাল কলেজ হইতে উত্তীর্ণ ডাক্তার তখন ছিলো না একজনও। তাই গ্রামে যাওয়া মাত্র আমার চারিদিক হইতে ডাক পড়িতে লাগিলো। গ্রামে লোকদের কাছ থেকে ফী নেওয়া বাধ বাধ ঠেকিতো, তাই বিনা ভিজিটেই সকলকে দেখিতাম। এমনি সময় লোনসিং স্কুলের একটি নিঃস্ব ছেলে বই কেনার জন্য আমার কাছে তেরো টাকা চাইলো। অবস্থাপন্ন রোগীদের বাড়ী পিছু এক টাকা নিলেও এই তের টাকা অনায়াসে উঠিতে পারে আশায়, আমি তাকে সাথে লইয়া বাহির হইলাম। কিন্তু আগের দিন চার টাকা ফী অস্বীকার করিয়াছি এমন এক প্রতিবেশীর বাড়ী থেকেও এক টাকা আদায় অসম্ভব দেখিয়া ভিক্ষার সে পথ ছাড়িয়া দিলাম। ফলে এক দিনের প্র্যাক্‌টিসেই সেই টাকা কয়টি আদায় হইলো।

ডাক্তার হোসেন

বাড়ী থেকে চাঁদপুর ফিরিয়াই পূরা দস্তুর প্র্যাক্‌টিস্ আরম্ভ করিলাম। মেডিক্যাল কলেজের শেষের ক'বছর দল গঠনে ব্যয় হওয়ায়, হাতে কলমে ডাক্তারী শেখার সুযোগ খুব কমই জুটিয়াছিলো। তাই অপারেশন শেখার জন্য রীতিমত মিশন হাঁসপাতালে যাওয়া সুরু করিলাম। ডাঃ হোসেন ছিলেন তখন সে হাঁসপাতালের চার্জ্জে। ডাঃ হোসেনের মতো কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ লোক আমাদের দেশে কমই মিলে। বগুড়া জেলার কোনও সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে তার জন্ম। ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলে পড়ার সময় সেখানকার মিশনারীদের প্রভাবে পড়িয়া তিনি

খৃষ্টান হন। ডাক্তারী পাশ করার পর মিশন হাঁসপাতালে চাকরী লইয়া চাঁদপুর যান। ডাক্তার হোসেনের পূর্ব্বে, মিশন হাঁসপাতালের চার্জ্জ, অনেক বড় বড় সাহেব ডাক্তারের উপর ছিলো। এ-দের সহকারীরূপে কাজ করিয়া অপারেশনে ডাক্তার হোসেনের হাতও অনেকটা পাকে। আমি মনে মনে অস্ত্রো-পচারে তাকে গুরু মানায়, তিনি অকুণ্ঠিতভাবে আমায় শিখার সব সুযোগ দিলেন। ১৯১৬-এর জানুয়ারীতে আমার চাঁদপুরে প্র্যাক্‌টিস্ আরম্ভ হয়। প্র্যাক্‌টিস্ ক্রমশঃই বাড়িতেছে, এমন সময়, জুন মাসের মাঝামাঝি, দলের একটি বিশেষ কাজে আমায় যাইতে হইলো কলিকাতায়।

৫৮ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্

তখন আমাদের কলিকাতার আড্ডা ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট্ হইতে উঠিয়া ৫৮ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে গিয়াছে। সেখানকার ভাইদের কষ্টের জীবন দেখিয়া আমার বুক দুঃখে ফাটিয়া গেলো। বাড়ীটা বড় হইলেও, খাওয়ার ও পরার অভাব ছিলো বড়ই মর্ম্মান্তিক। গড়ে সকলের দুখানা করিয়া কাপড়ও ছিলো কিনা সন্দেহ। সেখানকার বাসিন্দাদের খুব কমেরই বাড়ী থেকে রীতিমতো টাকা আসিতো। নৃপেন ছিলো বয়সে বড়। সমস্ত ঝক্কিই পড়িতো তাহার ঘাড়ে। সেখানকার ভাইরা আমার চাঁদপুর থাকা সম্বন্ধে আপত্তি করিয়া বলিলো—এমন একটি জায়গায় আপনার থাকা দরকার যেখান থেকে অল্প সময় ও খরচে ঘন ঘন কলিকাতা আসা সম্ভব। চাঁদপুর থেকে কল্‌কাতা যাতা-

যাতের ঝঞ্ঝাট বড়ই বেশী। খানিক আলোচনার পর ফরিদপুরে প্র্যাক্‌টিস্‌ করাই ঠিক্‌ হইলো। চাঁদপুরের বন্ধুরা এ-কথা শুনিয়া দুঃখিত হইলো। তাহারা বলিলো—এমন জমে-ওঠা প্র্যাক্‌টিস্‌টা ছেড়ে নূতন জায়গায় যাওয়া নিতান্তই আহাম্মকী। নিজের সুযোগ ও সুবিধা মাপিয়া জীবন চালাই নাই কখনো। যাদের সাথে জীবন তরীর পালখানি কর্ম্মসাগরে উড়াইয়া দিয়াছি, তাদেরই ইচ্ছার চরণে বেশীর ভাগ সময় আমার নিজের মত লুটাইয়া পড়িয়াছে। তাই আমাকে গিয়া পৌছিতে হইলো ১৯১৬-এর আঠারো-ই জুলাই একেবারে অজানা ফরিদপুর সহরে।

ফরিদপুর

নবীন মুখুজ্যের প্রথম পক্ষের ছেলে হেম মুখুজ্যে ফরিদপুরে ওকালতী করিতেন। তার বাসায়ই উঠিলাম। হেমবাবুকে আমি ভাগনে বলিয়া ডাকিতাম। সে নামে-ই তিনি এখানে পরিচিত হইবেন। তার স্ত্রীকে আমি বলিতাম সাবিত্রী ঠাকরুণ। তাদের বাসার ছোট একখানা অন্ধকার ঘরে আমার থাকা ঠিক হইলো। অন্য কোন অতিরিক্ত ঘর না থাকায়ই এ বন্দোবস্ত। প্রথম কদিন কেউ কোনো খোঁজ খবর নিলো না। কিন্তু শেষে প্র্যাক্‌টিস্‌ বেশ জমিয়া উঠিলো। চাঁদপুরে অবসর সময় কাটিতো ডাক্তার হোসেনের সাথে হাঁসপাতালের কাজে, অন্য কোন কাজের কথা সেখানে মনেই হইতো না। কিন্তু ফরিদপুর আসা মাত্রই দল গড়ার প্রবল ইচ্ছা প্রাণে প্রচণ্ড বেগে ঝাঁকানি দিলো। তাই সময় পাইলেই সেই তালে ঘুরিতাম।

ফরিদপুরে অনুশীলন সমিতি

ফরিদপুরে তখন অনুশীলন সমিতির একটি বড় আড্ডা ছিলো। অনুশীলন সমিতির সংগঠন প্রণালীর সাথে আমার প্রথম পরিচয় নড়িয়ায়। কিন্তু সেই সংগঠন যে এতো পাকা ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত তার পূর্ণ অনুভূতি হইলো ফরিদপুর আসার পর। সারা সহরটি কয়েকটি পাড়ায় বিভক্ত। প্রত্যেক পাড়ায় জনৈক ক্যাপটেনের অধীনে সকল ছেলেদের কাজকর্ম্ম সুনিয়ন্ত্রিত। ক্যাপটেনের অধীনে বিপ্লব-ভাব উদ্দীপক একটি ছোট লাইব্রেরী। এ-লাইব্রেরী হইতেই সেই পাড়ার ছেলেরা বই নিতো। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ছেলেকে ভোরে ৪টায় উঠিয়া খানিকক্ষণ ব্যায়াম করার পর পাড়ার আরো দু-তিনটি ছেলের সাথে মিলিয়া ফর্সা না হওয়া অবধি রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতে হইতো। এ-ছাড়া প্রত্যেক পাড়ায় একটি করিয়া ক্লাব ছিলো। সেই ক্লাবেই সে পাড়ার ছেলেরা বিকালে ফুটবল প্রভৃতি খেলিতো। ক্যাপটেনের অধীনস্থ কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী ছাড়া প্রত্যেক পাড়ায়ও একটি করিয়া ছোট লাইব্রেরী ছিলো। কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী হইতে বিভিন্ন পাড়ার লাইব্রেরীতে প্রয়োজন মতো বই দেওয়া হইতো। সমিতির কোনো ছেলে যাতে কোনো খারাপ দলে না পড়ে কিংবা বাইরের কোনো লোকের সাথে না মিশে সে বিষয়ে সতর্ক নজর রাখা হইতো। সমিতিটি এ-ভাবে সংগঠিত ছিলো যে সহরের সব ছেলেকেই ইচ্ছায় অনিচ্ছায় ক্রমশঃ ইহার অধীনে আসিয়া পড়িতে হইতো এবং শৈশব

হইতে বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ায় বিপ্লবের ভাব তাদের মধ্যে আপনা আপনি জাগিয়া উঠিতো।

ফরিদপুর পৌছিয়াই আমি ছাত্রদের মাঝে একটি দল গড়িতে চেষ্টা করিলাম। অনুশীলন সমিতি প্রাণপণে বাধা দিতে লাগিলো কিন্তু আমাকে ঠেকানো মুস্কিল। আমি সহরের একজন বড় ডাক্তার। অতি সাদাসিদে ভাবে আমার বাস। পরের সেবাতেই আমার দিনের বেশী সময় কাটে। টাকা খরচ করার ক্ষমতাও আমার অনেক বেশী। তাই তাদের আঁটাআঁটি বাঁধন সত্ত্বেও কিছু কিছু ছেলে আমার দিকে ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিলো। স্কুলের ভালো ছেলেদের দিকেই আমার তখন ঝোক্ ছিলো। তখন আমি ভাবিতাম কর্ম্মক্ষেত্রে এরাই আগাইতে পারিবে অনেক সহজে। কিন্তু এখন সংসারের চাপে এ-ধারণা অনেক বদলাইয়াছে। বিশ্ববিত্থালয়ের পরীক্ষা মানুষের যোগ্যতার কতক মাপকাঠি হইলেও প্রকৃত মনুষ্যত্বের পরীক্ষা হয় কর্ম্মক্ষেত্রে, সংগ্রামের মাঝে। ফরিদপুরের দু-চারটি ভালো ছেলে আমার সাথে মিলায়, সমিতির কর্ত্তৃপক্ষের প্রাণ আঁৎকাইয়া উঠিলো। এরা আমায় মনে করিতে লাগিলো তাদের পথের কণ্টক।

ফরিদপুর যাওয়ার মাস দুই পরেই বিধুর কঠিন অসুখের সংবাদবাহী প্রফুল্লের এক জরুরী তারে আমার কলিকাতা যাওয়ার তলব পড়িলো। কলিকাতা পৌছিয়াই বুঝিলাম বিধুর অসুখের সংবাদ ভুয়ো, আমাকে ধরাধাম হইতে পরলোকে পাঠানোর আয়োজনের আকস্মিক সংবাদই তাদের ওরূপ টেলিগ্রাম

পাঠানোর কারণ। সব শুনিয়া আমি বলিলাম—টেলিগ্রাফ না কোরলেই ভাল হতো, আমার মৃত্যুতেই তাদের দেশ-সেবার পথ উন্মুক্ত হলে, দেশ-সেবার সে বেদীমূলেই আমার প্রাণ বিসর্জ্জন দেওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু সে-শুভলগ্ন তখন অতীত হইয়া গিয়াছে—ফিরিয়া পাওয়ার আর কোনো উপায় নাই। তার অল্প পরেই পুরী থেকে যেগেনের কঠিন অসুখের সংবাদ পাইয়া আমি সেখানে রওনা হইলাম।

পুরী

পুরীর হরনাথ আশ্রমেই তখন যোগেন ও গিরীশ ছিলো। আমিও সেখানে গিয়া উঠিলাম। কিছুদিন পরে জলপাইগুড়ীর প্রসিদ্ধ চা-কর যোগেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ও সপরিবারে সেখানে আসিলেন। যোগেশ ঘোষকে আমরা মামাবাবু বলিতাম। মামাবাবুর সাথে অল্প পরিচয় আমার এর আগেই ছিলো। কৃষ্ণভক্ত মামাবাবুর সাথে কীর্ত্তনপ্রিয় একদল বন্ধুও আসিলো। এদের কীর্ত্তনে মামাবাবুর বাসা দিনরা মুখরিত থাকিতো। মামীমাও এদের সকলের সেবা .ণ ঢালিয়া করিতেন। এমন সময় জটা ও ত্রিশূলধারী একজন বাঙ্গালী সন্ন্যাসীও হরনাথ আশ্রমে আসিয়া জুটিলেন। তিনি অতি সাধু প্রকৃতির লোক ছিলেন। সাধন ভজনেই তাঁর বেশীর ভাগ সময় কাটিতো। অবসর সময়ে প্রাণ খুলিয়া হাসিমুখে আমাদের সাথে তাঁর ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। তাঁর ভড়ংহীন সরল বিশ্বাসে আমাদের সকলেই একটু মুগ্ধ হইয়া-

ছিলো। একদিন সামনের বারান্দায় বসিয়া সমুদ্র-স্নানের জন্ত গায়ে তেল মাখিতেছি, এমন সময় খিড়কী দরজা দিয়া একটি চোর ঢুকিয়া আমাদের বোচকা-বুচকী, টাকা-পয়সা, কাপড়-চোপড় সব লইয়া গেলো—আমার ষ্টেথিস্‌কোপটি পর্য্যন্ত। তেলমাখা শেষ হইলে ঘরে ঢুকিয়া দেখি ঘর একেবারে শূন্য—কিছুই নাই। পদ-চিহ্ন ধরিয়া খানিকটা আগাইয়া দেখি আমার ষ্টেথিস্‌কোপটি পড়িয়া রহিয়াছে, আর কিছুই পাওয়া গেলো না। ষ্টেথিস্‌কোপটি সাধু বাবাকে দেখাইতে তিনি বলিলেন—ভগবান হাতে ধরেই তোমার জন্ত এটি রেখে গেছেন, এটি থাকা পর্য্যন্ত তোমার কোনো কষ্ট হবে না। সেদিন বিকালেই একটি রোগী দেখার আহ্বান আসিলো, তাতে তখনকার চলার আন্দাজ কিছু টাকাও জুটিলো।

এর কিছুদিন পরেই মার অসুখের সংবাদ পাইয়া চাঁদপুর যাইতে হইলো। সেখান থেকে ফরিদপুর গিয়া দেখি বাসার সামনে দুটি লাল পাগড়ি বসা। বিকালে সি, আই, ডি, ইনস্‌পেক্টার মতিবাবু আসিয়া বলিয়া গেলেন—পরদিন বেলা এগারোটায় পুলিস সাহেবের সাথে দেখা করিতে হইবে তখন পুলিসের নামে আমাদের ভয় হইতো। ভাবিলাম কি না জানি একটা হয়। পুলিস সাহেবের সাথে দেখা হওয়া মাত্রই তিনি আমায় স্পষ্ট ভাষায় বলিলেন—বর্ত্তমানে বোমাওয়ালাদের সাথে তোমার কোনো সম্পর্ক না থাকলেও তুমি এমন একটি দল গড়ার চেষ্টায় আছো, যার মূল উদ্দেশ্য ইংরেজদের এদেশ থেকে তাড়ানো। তার কথা শুনিয়া আমি সোজাসুজি বলিলাম—পরাধীনতা কেউ

চায় না, নিজেদের দেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যই ইংরেজ এই যুদ্ধে ঝাঁপ দিয়েছে এ-কথাতো ইংলণ্ডের বড়লোকদের মুখ থেকেই বেরুচ্ছে, স্কুল কলেজে পড়ানো ইংলণ্ডের ইতিহাসের প্রতি পাতাতে স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনীতে ভরা, তবে আমার এরূপ চেষ্টায় অপরাধ কোথায়? তিনি উজ্জল মুখে আমায় বলিলেন—অমি ইংরেজ, স্বাধীনতা সকলেরই কাম্য একথাটি ভালো করে বুঝি, তারা স্বাধীনতা চায় কিনা একথাটি এর আগে অনেক ছেলেকে জিজ্ঞাসা করেছি, কিন্তু কারো মুখ থেকে এতো স্পষ্ট ভাবে হাঁ বেরোয় নাই, এর কারণ কি? এ-ধরণের কথা চলার পর তিনি আমায় একখানি চিঠি পড়তে দিলেন। তাতে যা লেখা ছিলো তার মর্ম্ম নিম্নরূপ—আমাকে মারার জন্য দুটি যুবক (তাদের নামও পত্রে লেখা ছিলো, আমার এখন মনে নাই) অমুক তারিখে ফরিদপুর পৌঁছিবে, সব বন্দোবস্ত যেন ঠিক থাকে। ডাক যোগে এই চিঠি চাঁদপুর থেকে ফরিদপুর পাঠানো হইয়াছিলো—পুলিসের হাতে পড়িয়াছে। সব ব্যাপারটা আগা গোড়া স্পষ্ট হইয়া গেলো। পুলিস সাহেব আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন—এ সম্বন্ধে আমি কিছু জান কি না? মিথ্যার জন্য বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া আমায় খাড়া জবাব দিতে হইলো—না। এখানে সত্যকথার সূত্র যে আমায় কোথায় টানিয়া লইয়া যাইতো, তাতে ক'রে আর এক দলের ঘাড়ে বিপদের কতো বড়ো বোঝা যে চাপানো হইতো, তা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়াই মিথ্যা বলার অনভ্যাস সত্ত্বেও সত্যের অপলাপ করিতে হইলো। খুব

জোরের সাথে 'না' বলায় পুলিস সাহেব বোধহয় আমার কথা বিশ্বাস করিলেন। তারপর আমার অন্তরীণ (internment) সম্বন্ধে কথা উঠিলো। পুলিস সাহেব বলিলেন—আমি যদি প্রতি শনিবার তার কাছে হাজিরা দেই ও তার অনুমতি ছাড়া অন্যত্র না যাই, তবে আমার অন্তরীণ তিনি বন্ধ করিয়া দিবেন। তারপর আমার বিশেষ অনুরোধে তিনি আমার উপর নজর রাখার কনেষ্টবল দুটিও আমার বাসা থেকে তুলিয়া নিলেন।

হিতৈষী স্কুল ও মেথর বিদ্যালয়

এরপর নিশ্চিন্ত মনে প্র্যাকটিস্ সুরু করিয়া সহরের নানা কাজে হাত দিলাম। বহু পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত ফরিদপুর হিতৈষী স্কুল নামে একটি মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় অস্তিত্বের প্রায় শেষ সীমায় পৌছিয়া খাবি খাইতেছিলো। সেই স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ এবং ফরিদপুরের বন্ধুদের বিশেষ অনুরোধে এ-স্কুলটিকে বাঁচানোর চেষ্টা করা গেলো। নূতন বাড়ী ভাড়া লইলাম। নূতন শিক্ষক নিযুক্ত করা হইলো। ফলে স্কুলের ছাত্রসংখ্যা লাফাইয়া লাফাইয়া বাড়িয়া অতি অল্প কালের মধ্যে একশ ত্রিশের কোঠায় পহুঁছিলো। ছাত্রদের মাইনের টাকায় সব খরচ কুলাইতো না। বাকি টাকা আমায়ই দিতে হইতো। মেথরের ছেলেদের লইয়া একটি নৈশ বিদ্যালয়ও খোলা গেলো। মেথর ছেলেদের সাথে পাশের গাঁয়ের মুসলমান ছেলেরাও সে স্কুলে পড়িতো। নৈশ বিদ্যালয়ে পড়ানোর ভার ছিলো হিতৈষী স্কুলের দু-জন শিক্ষকের উপর। আমি শুধু প্রতি সন্ধ্যায় সারাদিনের কাজের পর

সেখানে গিয়া বসিয়া থাকিতাম। স্কুল বসার আগে মেথরপাড়ার ছেলেদের ডাকিয়া আনার ভারও ছিল আমার উপর। এ-কাজে কসিমুদ্দিনও (বর্ত্তমানে পল্লীকবি রূপে পরিচিত) আমায় সাহায্য করিতো। এমনি করিয়া সেখানকার মেথরদের সাথে আমার ভাব ঘনাইয়া আসিলো। প্রতিদিন সকাল ন'টায় আমি তাদের পাড়ায় গিয়া খোঁজ করিয়া জানিতাম কারো কোনো অসুখ হইয়াছে কি না। অসুখ হইলে ওষুধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া সেখান হইতে বিদায় হইতাম। মেথরদের আমার ব্যবস্থা মতো ওষুধ বিনা আপত্তিতে স্থানীয় সরকারী হাঁসপাতাল হইতে দেওয়া হইতো বলিয়াই একাজে অনেক সুবিধা হইয়াছিলো। অনুশীলন সমিতির বাধা ঠেলিয়া ক্রমশঃ একটি পাড়ার ক্লাবের প্রেসিডেণ্টও আমি হইয়াছিলাম। সেই সূত্রে সেই পাড়ার ছেলেদের সাথে মিশিবার সুযোগও আমার জুটিলো। ফরিদপুরে তখন দুটি নাট্য সম্প্রদায় ছিলো। তাদের একটির যুগ্ম সম্পাদকও আমি হইলাম। এই সব কাজের ভিতর দিয়া আমার নিজেরও একটি দল গড়িয়া উঠিলো। সে-দলের ছেলেদের মধ্যে কিরণ বাড়ুজ্যের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সে সেখানকার সরকারী উকীলের ছেলে ছিলো—কলিকাতার কলেজে পড়িতো। বাবুগিরির দিকে তখন তার বিশেষ ঝোঁক ছিলো। আমার পাল্লায় পড়িয়াই তার মতিগতি বদলায় এবং পরে সে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী হয়।

হোমরুল আন্দোলন

এরপর আমার জীবনের বড় ঘটনা এ্যানি বেশান্তের হোমরুল আন্দোলনে যোগদান। এ-সম্বন্ধে তার ষ্টার থিয়েটারের বক্তৃতায়

উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিলো। সেই শুভ্রকেশা মহিয়সী মহিলার বুক ফুলাইয়া ফুলাইয়া মেঘ গম্ভীর স্বরে বলা নীচের কথা কটি এখনো আমার প্রাণে ঠিক শোণার সময়ের মতোই সতেজে বাজিতেছে—যদি তোমরা কিছু পেতে চাও তবে ইংরেজের এ-দুর্ব্বল মুহূর্ত্তেই তা আদায় কর। আমি ইংরেজদের চিনি। যুদ্ধ শেষ হওয়ার সাথে সাথে বিপদ কেটে গেলে তারা তোমাদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাবে। তোমাদের সাহায্য ছাড়া ইংরেজের এ-যুদ্ধ চালানো অসম্ভব। একমাত্র স্বাধীনতা লাভের মূল্য স্বরূপই তোমরা তোমাদের অনুকূল দক্ষিণ বাহু ইংরেজের দিকে বাড়াতে পার—এ দীর্ঘ দাসত্ব আরো দীর্ঘ দিনের জন্য কায়েমী করার জন্য নয়। দাসের জাত তোমরা—স্বাধীনতার মূল্য কি বুঝবে। আমার মতো স্বাধীনতার আবহাওয়ার মাঝে বেড়ে উঠলে বুঝতে পারতে স্বাধীনতার জন্য কিরূপে সর্ব্বস্ব পণ করতে হয়। তিনি হুবহু এই কথাগুলি বলেন নাই, তবে যাহা বলিয়াছিলেন তার মোটামুটি ভাব এরূপ। ফরিদপুর ফিরিয়া আসিয়া হোমরুল লীগের একটি শাখা সেখানে খোলা গেলো এবং আমি হইলাম তাহার সম্পাদক। বর্ত্তমান অসহযোগ আন্দোলনের মতো সে আন্দোলনে করার ছিলো না কিছুই। কাজেই তার প্রাণ হোল ক্ষণস্থায়ী। এই আন্দোলনকে সূত্র করিয়া তখনকার রাজনৈতিক নরম ও গরম দলের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধিয়া উঠিলো। নরম দলের নেতা সুরেন বাবু প্রভৃতি আসন্ন কলিকাতা কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট করিতে চাহিলেন মামুদাবাদের রাজাকে এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বহরমপুরের উকীল

বৈকুণ্ঠনাথ সেনকে। আমাদের পক্ষের জিদ্ হইলো এ্যানি বেশান্তকে প্রেসিডেন্ট ও রবি ঠাকুরকে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি করার। ইহা লইয়া নানাস্থানে সভাসমিতি হইলো। ফরিদপুরেও একটি মিটিং ডাকা গেলো। অম্বিকা মজুমদার রাগ করিয়া সে মিটিং-এ আসিলেন না। তাকে বাদ দিয়া ফরিদপুরে এই বোধ হয় প্রথম রাজনৈতিক সভা এবং এ-ঘটনা থেকেই তার রাজনৈতিক মৃত্যুর সূত্রপাত। শেষে উভয় পক্ষের রফা হওয়ায় এ্যানি বেশান্ত হইলেন প্রেসিডেন্ট, বৈকুণ্ঠ বাবু অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি।

ফরিদপুরে নানারকম কাজে গা ভাসাইয়া দিলাম বটে, কিন্তু আগেকার সেই ভগবান লাভের জন্য উন্মাদনা অনেকটা কমিয়া গেলো। গীতা ও উপনিষদ পড়ার ত্রুটি ছিলো না কিন্তু ভগবান লাভ করিতেই হইবে, ভগবান লাভ না হইলে আর সবই বৃথা, এ-ভাবটি যেন ধীরে ধীরে মরিয়া গেলো। টাকা আয়ের পরিমাণ প্রতি মাসেই বাড়িয়া চলিলো বটে, কিন্তু সাথে সাথে নিত্য নূতন দাবীও উপস্থিত হইতে লাগিলো। ফলে কলিকাতা পাঠানোর জন্য থাকিতো না কিছুই। এজন্য নৃপেনদের সেখানে খুবই কষ্ট হইতো। গালিগালাজও বর্ষিত হইতো আমার উপর কম নয়। কিন্তু এমনি ছিলো আমার স্বভাবের দুর্ব্বলতা—কেউ টাকা চাইলে না করিতে পারিতাম না। আজ অমুক বাবু আসিয়া বলিলেন—এতো টাকা না হইলে মেয়ের বিয়ে আট্‌কায়, অমনি বার করিয়া দিতে হইতো সে-পরিমাণ টাকা। আজ অমুকের দোকান এতো টাকা না

হইলে চলে না, কাল অমুক ছেলের নাম কাটা যায় মাইনের টাকার অভাবে—এমনি ধরণের প্রতিদিনের দাবী দাওয়া মিটাইতেই আয়ের সব টাকা উজাড় হইতো।

একদিন সন্ধ্যাবেলা, নিজের নিরালা অন্ধকার ঘরখানায় বসিয়া একমনে গীতাপাঠ করিতেছি, এমন সময় যোগেন আসিয়া উত্তেজিত ভাবে বলিলো—ঘরে বসে গীতা পাঠ সকলেই করতে পারে, কিন্তু যাও দেখিনি যুদ্ধে, সেখানে বসে যদি গীতা পাঠ করতে পার, তবেই বুঝবো বাহাদুরী। আমি যোগেনের পানে হাঁ করিয়া চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—এ-কথা বলার মানে কি? সে বলিলো—তুমি যুদ্ধে যাও এই আমাদের সকলের ইচ্ছে। এখানে থাক্‌লে অন্তরীণ হওয়ার আশঙ্কা আছে। তখন যুদ্ধে যাইবার ইচ্ছা ছিলো না আমার আদৌ। চারিদিক থেকেই ফরিদপুর আনন্দধাম হইয়া উঠিতেছিলো। কিন্তু যোগেন জোড় করিয়া বলিলো—তোমাকে যুদ্ধে যেতেই হবে। আমি তাকে বলিলাম—তোমাদের কাছে এ-মাথা তো নত হ'য়ে আছে চিরদিনই, তোমাদের দশ জনার কথাই আমার কাছে হুকুম। সে আবার বলিলো—এই আমাদের হুকুম। পুলিস সাহেবের সাথে আমার অন্তরীণ সম্বন্ধে যে-সব কথা হইয়াছিলো সে-সব তাকে বলিলাম কিন্তু কোন ফল ফলিলো না। কিছুদিন আগে থেকেই আমাদের মেছুয়াবাজারের মেসের উপর পুলিসের তীব্র দৃষ্টি পড়িয়াছিলো। যখন তখনই খানা তল্লাসী হইতো। বহু খবর পূর্ণ আমার একখানা ডায়রীও তাদের হস্তগত হইয়াছিলো। নৃপেনদের সি. আই. ডি অফিসে লইয়া গিয়া অনেক হাস্তন্যাস্তও

করিয়াছে। কিছুদিন আগে অমূল্য উকীল অন্তরীনাবদ্ধ হইয়াছে। এ-সব কারণে কলিকাতার ভাইরা আমার যুদ্ধে যাওয়া ঠিক করিয়াছিলো। তাদের ধারণা ছিলো যুদ্ধে গেলেই আমার সাত খুন মাপ হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সাময়িক চাকরি

১৯১৭-এর ২২শে নবেম্বর ওয়ার কমিশন লইয়া সন্ধ্যার গাড়ীতে কলিকাতা হইতে জব্বলপুর রওনা হইলাম। সাহেবী ধরণে খানা-পিনার অভ্যাস না থাকায়, প্রথম শ্রেণীর যাত্রী হইয়াও, রেষ্টুরেণ্ট কারে গিয়া খাইতে সাহস হইলো না। ফলে কলিকাতা হইতে জব্বলপুর পর্য্যন্ত সারা পথ নিজের গাড়ীতে চা টোষ্ট খাইয়াই কাটাইতে হইলো। এ-চাকরির কায়দা কানুন সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ হওয়ায়, পূর্ব্ব হইতে কোন বন্দোবস্ত করিয়া আসি নাই। কি করিবো, কোথায় যাইবো এ-ধরণের দ্বিধা ও সঙ্কোচের মাঝে জব্বলপুর নামিলাম। প্ল্যাটফরমে নামিয়া সকলেই লাগেজ পত্রসহ গাড়ীতে চড়িয়া নিজ নিজ গন্তব্যস্থান-অভিমুখে রওনা হইলো। আমি হতভম্বের মতো ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময় দোহারা চেহারার জনৈক পাঞ্জাবী মুসলমান সেলাম করিয়া আমায় বলিলো—বেয়ারা চাই সার? আমি যেন হাতে আকাশ পাইলাম। আমার উত্তরের কোন অপেক্ষা না করিয়াই, সে নিজের পকেট হইতে আগের মুনীবদের দেওয়া সার্টিফিকেটের তাড়া বাহির করিলো। সাথে সাথে উর্দ্দুতে বলিলো—মাসে ত্রিশ টাকা মাইনে দিতে হবে সাব, মেজর সাহেবও তাই দিতেন। টাকার পরিমাণের চিন্তার অবসর আমার ছিলো তখন কমই। আমি তাকে ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করিলাম—

কোথাও একটা ওঠবার জায়গা ঠিক্ করতে পারবে? পারবো বই কি সাব, এ-সব কাজে যে পাকা হয়েছি ছোটকাল থেকে—বলিয়া কাছের এক টাঙ্গাওয়ালাকে ডাকিলো। কোথায় যাবে আমার এ-কথার উত্তরে সে বলিলো—ডাক বাংলায়, সেখানে জায়গা না মিললে জ্যাকসন হোটেলে। উভয় স্থানই লোকে ভরতি। তাই আমায় শেষে আশ্রয় লইতে হইলো মেয়েদের এক হোটেলের নিভৃত কোণে। ডাইনিংরুমে খেতে যাবো না—হোটেলের কর্ত্তাঠাকরুণকে এ-সংবাদ পাঠানোয়, খানা কামরায়ই আসিয়া হাজির হইলো। আমার খাওয়ার ধরণ দেখিয়া বেয়ারা খানিকটা মুচকী হাসিয়া বলিলো—সাব, হুকুম করলে আমি আপনাকে খাওয়া শিখাতে পারি। সে অবধি সে-ই আমার খানা-খাওয়া সাগরের প্রথম কাণ্ডারী হইলো। খাওয়া শেষে সে আমায় জিজ্ঞাসা করিলো—সাব, আউরত মাঙ্গতে? আমি তো অবাক। বিনা শঙ্কোচে সে বলিয়া যাইতে লাগিলো—একটি সুন্দরী মেয়ে আছে, মেজর সাহেবের জন্য রোজ রোজ আন্‌তাম, মাসে পঞ্চাশ টাকা লাগ্‌বে। এ-ধরণের অভিজ্ঞতা আমার জীবনে এই প্রথম। আমি প্রমাদ গণিলাম- তখনকার জন্য নয়, সে পরীক্ষার জন্য আমি যথেষ্ট শক্ত ছিলাম। আমার মনে হইলো এরূপ নিশীথ রাত্রে, এ-ধরণের নির্জ্জন কক্ষে, টাকা ভরা পকেট লইয়া আমায় দিনের পরদিন পড়িতে হইবে এরূপ সয়তানের প্রলোভনে। আর একটি বেয়ারা পাওয়া মাত্রই ইহাকে ছাড়াইয়া দেওয়া ঠিক করিলাল। দু-দিন বাদেই জ্যাক্‌সন হোটেলে স্থান জুটিলো।

পরের দিন কাজে যোগ দিলাম। মেজর নেস্‌ফিল্ড আমাদের সেখনকার কর্ত্তা। ইনি প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ নেস্‌ফিল্ডের পুত্র। ছোটখাট, শাদাসিদে লোকটির প্রাণ যেমনি সরল, মুখ তেমনই কড়া। গৌহাটি না কোথায়, নিজের দুর্ব্যবহারের জন্য, দুটি বাঙ্গালী তরুণের হাতে উত্তম মধ্যম খাওয়া অবধি তিনি বাঙ্গালীর উপর ছিলেন হাড়ে হাড়ে চটা। তাই আমাকে দেখিয়াই তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিলেন—বাঙ্গালীদের চিনতে আমার বাকী নাই, বাঙ্গালীরা মজঃফরপুরে নিরীহ মেয়েদের উপর বোমা ছুড়ছে, বাঙ্গালীদের সাথে ইংরেজের মিল অসম্ভব ইত্যাদি। এক কথায় বাঙ্গালীরা তার চক্ষুশূল, পারিলে সে তাদের পিষিয়া মারে। লোকটা ছিলো কিন্তু খুবই পণ্ডিত, চৌখস, অপারেশনেও অনেকটা সিদ্ধ হস্ত। তারকাছ থেকে অনেক শেখার আছে দেখিয়া, গালি-গালাজ সত্ত্বেও, শত্রু-পুরীতে কচের বাসের মতো, মান অপমানে জলাঞ্জলি দিয়া, তার পিছে পিছে ঘুরিতাম। বিদ্যা-দান ব্যাপারে তিনি ছিলেন অকুণ্ঠ-চিত্ত, দিতে দিতে তার প্রাণ যেন উথলিয়া উঠিতো। সে-সময়ের স্বচ্ছতার মাঝেই তার ভিতরের সরল প্রাণটি সম্পূর্ণ ধরা পড়িতো। মাস খানেক সেখানে থাকার পরই আমার নসীরাবাদ যাওয়ার হুকুম আসিলো। শেখার এতো বড় একটা সুযোগ খোওয়ানোয় মনে মনে দুঃখই হইলো। জব্বলপুর ছাড়ার দিন বিকালে রাস্তায় হঠাৎ তার সাথে দেখা। তিনি মোটর সাইকেলে যাইতেছিলেন। আমায় দাঁড় করাইয়া, সাইকেল হইতে নামিয়া, বলিলেন—তোমার প্রতি আমি মোটের উপর

খুসীই ছিলাম। সংসারে খুব কম লোকই কিছু জানে, কিন্তু কেহই এ-কথা স্বীকার করতে চায় না। তুমি কিন্তু নিঃসঙ্কোচে বলতে তুমি কিছু জান না। যতোটুকু সম্ভব শেখার জন্য প্রাণ পণে চেষ্টা করতে। এর মধ্যে একদিন জব্বলপুরের প্রসিদ্ধ মার্ব্বেল পাথরের মাঝে প্রবাহিত প্রপাতটিও দেখিয়া আসিয়াছিলাম। আমাদের জব্বলপুরের বাংলা হইতে নর্ম্মদা নদী মাইল খানিক দূরে ছিলো। কি জানি কি এক প্রবল আকর্ষণে প্রায় প্রতি সন্ধ্যায়ই নর্ম্মদা তীরে একা বেড়াইতে যাইতাম এবং তার পর্ব্বতসঙ্কুল পাড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া থাকিতাম। ভারতের কতো অতীত সাধনার কথাই না তখন মনে আসিতো। মনে হইতো যেন সেই পুরাণো যুগের ঋষিরা আমার চোখের সামনে প্রস্তরখণ্ড সমূহের উপর তখনও ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বসিয়া আছেন—তাদের দেওয়া ভাব-ধারার সাথে সাথে তাঁরাও যেন ভারতের বুকে অমররূপে অবস্থান করিতেছেন।

নশীরাবাদ

নশীরাবাদ পৌঁছিয়া দেখি সেখানকার কর্ত্তা মেজর ডয়িগ (Doig) মেজর নেসফিল্ডের একেবারে উল্টো। ইনি ব্যবহারে খুবই নম্র কিন্তু ডাক্তারী বিদ্যায় একেবারে গণ্ডমূর্খ। এমন একটি মূর্খ কিরূপে এতোদিন ধরিয়া চাকরি করিয়া আসিতেছেন, ভাবিয়া অবাক্ হইলাম। মেজর নেসফিল্ড ছিলেন আই,এম, এস (Indian Medical Service)—ইনি আর, এ, এম, সি (Royal Army Medical Corpse)। আই, এম, এস,

ভারতীয় সৈনিকদের জন্য আর আর, এ, এম, সি-রা কাজ করে ইংরেজ সৈনিক বিভাগে। আর, এ, এম, সি-রা খুব পণ্ডিত ও কর্ম্মকুশল—আমার বহুদিনের এ ধারণা এক নিমেষেই দূর হইলো। আমাকে সেখানে ২।৯ দিল্লী ইনফ্যান্ট্রী হাঁসপাতালের ভার দেওয়া হইলো। দিল্লী ইন্‌ফ্যান্ট্রীর অধিনায়ক মেজর ট্রটার সৈনিক হিসাবে অনেকটা হাবা হইলেও মানুষটি ছিলেন অতি খাঁটি। তার বাবা ব্রহ্মযুদ্ধে মারা যান। নিজে অবিবাহিত, মদের নেশায় দিনের বেশীর ভাগ বিভোর থাকিতেন। প্রথম সাক্ষাতের সময় তিনি আমায় বলিলেন—তরুণ ইংরেজ অফিসারদের খানিক অত্যাচার সওয়া ছাড়া তোমার গত্যন্তর নাই। পদবী সমান হলেও, ইংরেজেরা ভারতীয়দের সাথে পুরোপুরি বন্ধুভাবে মিশতে নারাজ, উঁচু নীচু ভাবটা ক্রমশঃ কমে এলেও আরো অনেক দিন থাকবে ইত্যাদি। নশীরাবাদে আর একজন বাঙ্গালী I. M. S. অফিসার ছিলেন। তার সাথেই আমার থাকার বন্দোবস্ত হইলো। খাওয়া দাওয়াও তার সাথেই চলিতেছিলো। কিন্তু মেজর ট্রটারের অনুরোধে আমাকে রেজিমেণ্টের অফিসারদের মেসে যোগ দিতে হইলো। তিনি বলিলেন—মেসে না খেলে অন্যান্য অফিসারদের সাথে আলাপ পরিচয় জমে উঠে না। মেসের কায়দায় খাওয়ার অভ্যাস নাই বলায়, তিনি বলিলেন—সেজন্য কোন ভয় নাই। ভারতীয়দের ভোজন পদ্ধতি যে অন্যরূপ, সকল ইংরেজই এ কথা জানে। তাই তোমার প্রথমকার ত্রুটি বিচ্যুতি তারা দরদ-ভরা প্রাণেই স'বে, আর প্রথম দু-তিন দিন তোমাকে মেসে দু-জন

অফিসারের সাথে আলাদা খাইয়ে তৈরী করেও নেওয়া হবে। পর দিনই দুজন তরুণ অফিসারকে আমায় খাওয়া শেখানোর জন্য নিযুক্ত করা হইলো। এর দু-দিন পর হইতেই সকলের সাথে মিলিয়া মেসে খাওয়া আরম্ভ করিলাম।

এর পর মেজর ট্রটার আমায় একদিন ক্লাবে লইয়া গিয়া ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। ভর্ত্তি হওয়ার সময় বলিলেন—এর জন্য মাসে চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা বেশী খরচ হবে বটে, কিন্তু তা পুষিয়ে যাবে সেখানে ইংরেজ চরিত্রের ভাল মন্দ দেখার সুযোগ মেলায়। তার পর থেকেই আমার ক্লাবে যাওয়া আরম্ভ হইলো। ক্লাবের জীবন বিকাল পাঁচটায় সুরু হইয়া রাত আটটা অবধি চলে। ক্লাবে সকলে প্রথম মত্ত হয় ক্লাব গৃহের বাইরে টেনিস খেলায়—পরে গৃহের ভিতর ব্যাড্‌মিনটন, বিলিয়ার্ড, তাস প্রভৃতি লইয়া। প্রথম দু-চার দিন এদিক ওদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া কাটিলো। কিন্তু হাঁ করিয়া পরের খেলা দেখিয়াই তো আর চিরদিন চলে না। নিজেরও একটা কিছু আরম্ভ করা প্রয়োজন হইলো। কিন্তু কিসে প্রথম হাত দেই—সকলটাতেই যে আনাড়ী। তখন আমার ভারী দুঃখ হইতো শৈশবে কেন নানারূপ খেলা শিখি নাই। কিছু না খেলিয়া শুধু পড়ায় শৈশব ও কিশোর কাটানো জাতীয় চরিত্র বিকাশের যে কতো বড় অন্তরায়, উঁচু নীচু বুড়ো জোয়ান প্রত্যেক ইংরেজের সকল রকম খেলায় কম বেশী সামর্থ্য দেখিয়া, তা চোখের উপর চিত্রের মতো ফুটিয়া উঠিলো। আমার অসুবিধার কথা মেজর সাহেবকে বলায়, তিনি হাসিয়া কহিলেন—তুমি ঘাবড়াচ্ছ কেন, আমি নিজেই তোমায় কয়েক

রকম খেলা শিখিয়ে দেব। কি নিয়ে আরম্ভ কোরবো—এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেন—গলফ্ ও টেনিস। কথায়ই শেষ হইলো না, সেদিনই আমার গলফষ্টিক ও টেনিস্ র‍্যাকেটের অর্ডার বোম্বে পাঠাইলেন। গলফ্ষ্টিক্ আসা মাত্রই তিনি আমার নিজের বাংলায় আসিয়া তার গাড়ীতে গলফ্ক্লাবে লইয়া গেলেন এবং সবগুলো রিং ঘুরাইয়া আমায় মোটামুটি সে-খেলা শিখাইলেন। তার পর থেকেই আমার রীতিমতো গল্ফ খেলা সুরু হইলো।

কিছুদিন বাদেই দেউলী রেজিমেণ্ট নশীরাবাদ আসিলো। সে রেজিমেণ্টের ট্যান্ক্রীড্ নামে জনৈক অফিসারের সাথে আমার খুব ভাব হয়। সে সকল খেলাতেই খুব ওস্তাদ ছিলো। তার উপরই আমায় টেনিস্ খেলা শেখানোর ভার পড়িলো। শেখানোয় এদের ধৈর্য্য দেখিয়া আমি অবাক্ হইলাম। কোন খেলাই আমার শীঘ্র শীঘ্র আসিতো না। সবটাই ঘসিয়া মাজিয়া অতি কষ্টে শিখিতে হইতো। কিন্তু তার ধৈর্য্য-চ্যুতি হইতো না কিছুতেই। সে হাসিমুখে আমার সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি উড়াইয়া দিতো, এ-রূপ যেন সকলেরই হয় ঠিক এমনিভাবে। আমাদের দেশের সাধারণ সৈনিকদের গাছ-তলায় বসিয়া মেসিন্গানের জটিল যন্ত্রপাতী এদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া শিখাইতে আমি দূরে দাঁড়াইয়া মুগ্ধনেত্রে অনেক সময় দেখিয়াছি। শুধু নিজে পণ্ডিত হইলেই জাতির উন্নতি হইবে না, সকলকেই যতোটা সম্ভব সাথে টানিয়া লইতে হইবে—এ-ভাব ধারা যেন সর্ব্বক্ষণ বহিতো এদের সকলের হৃদয়ের প্রতি

রক্তে। জঙ্গলী ও গেঁয়ো রিক্রুটদের দিন পনেরর মধ্যে বীরের নূতন চেহারা দেওয়ার যাদুমন্ত্র জানে বলিয়াই ইহারা ভারতীয় সৈনিকদের সাহায্যে এতো বড় বড় যুদ্ধ জিতিয়া বিশ্ব-জোড়া সাম্রাজ্য গড়িতে পারিয়াছে।

এমনি ভাবে অন্য সব খেলাও কিছু কিছু শিখিলাম। একদিন টেনিস্ খেলার পর বন্ধুদের সাথে ক্লাবঘরে বসিয়া আড্ডা দিতেছি, এমন সময় আমার ঝোঁক হইলো এদের সবাইকে একগ্লাস করিয়া মদ খাওয়ানোর। এই ঝোঁকের পিছনে একটু আগের কথাও আছে। টেনিস্ খেলার পর এরা প্রায় প্রতিদিনই আমায় মদ সাধিতো। তাই অনেক দিনের নিমন্ত্রণের শোধ দেবার সাধ একদিন হইলো। কিন্তু মদ সাধার সাথে সাথেই মহা বিপদ ঘটিলো। সেখানে উপস্থিত সাত জনই আমায় এক গ্লাস করিয়া মদ খাইতে বলিলো। প্রথম আমি অনেক ওজর আপত্তি করিলাম। বলিলাম—কোনদিন অভ্যাস নাই, খাই কি করে। কিন্তু কে শোনে আমার কথা। সকলেই জেদ্ ধরিলো—খেতেই হবে, নইলে খাওয়ালে কেন। শেষে একে একে সাত গ্লাসই আমায় খাইতে হইলো। সপ্তম গ্লাস শেষ করিয়া, টলটলায়মান অবস্থায় সাইকেলে চড়িয়া কোনো রকমে বাংলায় পৌঁছিয়া কাপড় চোপড় না ছাড়িয়াই ধপাস করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। ছাত্রাবস্থা হইতেই আমার রাতে ভাল ঘুম হয় না। কিন্তু সে রাতটা যেন কাটিলো এক নিমিষে। সকালে উঠিয়া ভারী আনন্দ বোধ হইলো—সারা শরীরটা একেবারে ঝড়ঝড়ে। বুঝিলাম এরই জন্য মানুষ মদ খায়। ভাবিলাম—

এ-নেশায় একব্যার পেয়ে বস্‌লে আর উদ্ধার নাই। ঘুম না হ'লেই রাতে খেতে ইচ্ছা যাবে। এমনি করে হতে হবে এর চিরদাস—আর না হলে চলবে না। ঠিক্‌ করিলাম এ বিষ হইতে দূরে থাকিতে হইবে। এর পর বন্ধুবান্ধবদের বিশেষ পীড়া পীড়িতে মদের গ্লাস হাতে লইতে হইলেও, তা না খাইয়া গোপনে চেয়ারের পিছনে ফেলিয়া দিতাম। একবার ধরা পড়ায় নাকালও বনিতে হইয়াছিলো। ইংরেজ অফিসারদের গুণ অনেক। মদ ও মেয়ের ব্যাপার না থাকিলে, এদের চরিত্র হইতো প্রায় আদর্শ স্থানীয়। কিন্তু এ-দুটোই এদের আমাদের চোখে বড় বিশ্রী রঙ্গে রঙ্গাইয়া তুলে। ক্যান্টনমেণ্টের বাংলা গুলোর বিধি-ব্যবস্থাও তরুণ অফিসারদের মেয়ে সম্বন্ধে পতনে সাহায্য করে। প্রত্যেক বাংলায় আর আর চাকরদের সাথে একজন চৌকীদারও থাকে, যার প্রধান কাজই পাশের গাঁ থেকে মেয়ে জোটানো। আর ইংরেজের নৌক্‌রী করণেওয়ালা বাবুর্চি ও বেয়ারাদের নৈতিক অধঃপতন এতোটা হইয়াছে যে তাহারা সাহেবদের সেবায় নিজেদের স্ত্রীকন্যাদের লাগাইতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না। বরং একে তারা মস্ত একটা আয়ের পথই মনে করে। এদেশে আসা সাহেবদের মুখ হইতে মেয়েদের গল্প বাহির-ও হয় অতি সহজে, ঠিক্‌ সিগারেটের ধোঁয়ার মতো। ফলে নবাগতদের অধিকাংশই, তাদের পূর্ব্বজীবন যেরূপই থাক্‌না কেন, অল্প কালের মধ্যে এদের দলে ভিড়ে।

বিদ্রোহের পূর্ব্বাভাস

১৯১৯—৯ই এপ্রিল। রাত প্রায় একটা। বাংলায় শুইয়া আছি, এমন সময় হঠাৎ এলার্ম বিগল্ কানে যাওয়ায় ঘুম ভাঙ্গিলো। তাড়াতাড়ি ইউনিফরম পরিয়া, বাংলার বাহিরে গিয়া দেখি উত্তর পশ্চিম দিগন্ত একেবারে লাল হইয়া গিয়াছে। যথাসম্ভব জোরে সে-দিকে সাইকেলে চলিলাম। কাছে গিয়া দেখি আমাদের রেজিমেণ্টের অফিস-গৃহে আগুণ লাগিয়াছে। ...লের সাহায্যে আগুণ নিবানো শেষ হইলে, বাংলায় ফিরিয়া আ... শুইলাম। ঘুম আসিতে না আসিতেই এলার্ম বিগল্ আ... বাজিয়া উঠিলো। এবার ঘটনাস্থলে গিয়া দেখি আমাদের রে...মেণ্টের ব্যারাকের তিন চারটি গৃহে একই সাথে আগুণ লা...গিয়াছে। আগুণ নিবানো শেষ হইলে বাংলায় ফিরিয়াইয়া দেখি—...াইফেল্ ধারী সিপাহী বাংলার চারিদিকে টহল দিতেছে। ...ানায় শোওয়ার পর সিপাহীটি কাছে আসিয়া বলিলো ...হেব, আপনার কোন ভয় নাই, আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমান, ... যতো ইংরেজদের। দিল্লীর কাছে ইংরেজ গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করেছে, তাই ইংরেজের বিরুদ্ধে সিপাহীরা ক্ষেপেছে। শুধু এখানে নয়—দিল্লী, লাহোর সকল জায়গার সিপাহীদেরই এ-ভাব।

পরদিন সকালে কাগজ পড়িয়া সমস্ত ব্যাপারটা স্পষ্ট বুঝিলাম। যুদ্ধের বিপদের মাঝে, ইংরেজ ভারতীয়দের আশ্বাস দিয়াছিলো যে, যুদ্ধশেষে ভারতকে পুরাপুরি না হইলেও অনেকখানি স্বাধীনতা দেওয়া হইবে। এ্যানিবেশাণ্ট ও তিলক

ইংরেজের এই আশ্বাসনে বিশ্বাস না করিয়া হোমরুল আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। কিন্তু গান্ধীজী ইংরেজের কথা মানিয়া লইয়া হোমরুল আন্দোলনে তো যোগ দেনই না—বরং ইংরেজকে যতোটা সম্ভব সাহায্য করেন। ১৯১৮-এর ১১ই নভেম্বর যুদ্ধ বিরতি ঘটে। প্রেসিডেণ্ট উইলসনের নেতৃত্বে, এমেরিকার ইংরেজের পক্ষে যোগদানেই, এতো সহজে ইংরেজের জয়ী হওয়া সম্ভব হয়। যুদ্ধে যোগদানের পূর্ব্বে প্রেসিডেণ্ট উইলসন্ যুদ্ধে রত সকল দেশকে এ-আশ্বাস দিয়াছিলেন যে যুদ্ধ-শেষে সকল দেশেরই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ হইবে। উইলসনের এই আশ্বাসের পর জর্ম্মাণ সৈন্যদের যুদ্ধ চালানোর আর কোন প্রাণই থাকে না। তাহারা ভাবে—স্বাধীনতা যখন সুনিশ্চিত, তখন যুদ্ধ চালাইয়া আর লাভ কি? রুশের বলশেভিকদের ভাব-প্রবাহও জার্ম্মাণদের এ-চিন্তাধারায় রস জোগায়।

১৯১৮-এর দিল্লী কংগ্রেসেও এই আত্মনিয়ন্ত্রণের উপর বিশেষ জোর দিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু ১৯১৯-এর ফেব্রুয়ারী মাসেই ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে রাউলত বিল্ আইনে পরিণত করা হয়। এ-আইন অনুসারে যে-কোন লোককে রাজদ্রোহের সন্দেহে বিনা বিচারে যেখানে সেখানে যতোদিন ইচ্ছা আটক রাখা যাইতো। ভারতের রাজনৈতিক আকাশে বজ্রপাত হইলো। কোথায় স্বাধীনতা লাভের স্বপ্ন—আর কোথায় সকল প্রকার স্বাধীনতা হরণকারী এ-কালো আইন। এ-আইন পাশ হওয়া মাত্র সমস্ত

ভারতের হৃদয় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলো। গান্ধীজী এ-আইনের বিরুদ্ধে উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। তাহার উপদেশ অনুসারে ৩০শে মার্চ্চ ভারতব্যাপী হরতাল করা ঠিক হয়। কিন্তু এ-আদেশ সকল জায়গায় সময় মতো পৌছে না। তাই শেষে ঠিক হয় যে, ৩০শে মার্চ্চের পরিবর্ত্তে ৬ই এপ্রিল ভারতের সর্ব্বত্র হরতাল করা হইবে। শেষের এ-আদেশ যথাসময়ে দিল্লীতে পৌছে না। তাই সেখানে হরতাল হয় ৩০শে মার্চ্চই। দিল্লীতে হরতালীদের উপর গুলী চলে। ফলে পাঁচ জন মারা যায় ও অনেকে আহত হয়। দিল্লীর নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ও ডাক্তার সত্যপালের অনুরোধে গান্ধীজী ৮ই এপ্রিল বোম্বে হইতে দিল্লী রওনা হন। পথে তাহার উপর দিল্লী ও পাঞ্জাব না ঢোকার আদেশ জারী হয়। গান্ধীজী এই আদেশ মানিতে অস্বীকার করেন। ফলে তাঁহাকে দিল্লীর অনতিদূরে গ্রেপ্তার করিয়া, স্পেশাল ট্রেনে, বোম্বে ফেরত পাঠানো হয়।

গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের সংবাদ তড়িৎবেগে ভারতের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। তাহার গ্রেপ্তারের সংবাদে বিক্ষুব্ধ সিপাহীরা পূর্ব্বরূপে বিদ্রোহের সূচনা করে। পরের দিন অফিসে আসিয়া অনেক সুবেদার, জমাদার ও সিপাহী এই আগুন লাগানো সম্বন্ধে আমার সাথে আলাপ করে। কথায় কথায় অনেক কথা ওঠে। তাহাদের কথা হইতে বুঝিলাম, এক হইতে পারিলে, ভারতের সিপাহীদের পক্ষে বিদ্রোহ করা মোটেই কঠিন নয়। কিন্তু রেজিমেণ্ট সমূহ এ-ভাবে গঠিত যে, সকলে মিলিয়া কাজ করা খুবই কঠিন। গুপ্তচরেরও অভাব নাই। এ-সব সত্ত্বেও স্বাধীনতা

লাভের জন্য তারা অনেক কিছু করিতে প্রস্তুত। জমাদার, সুবেদারদের চেয়ে সাধারণ সৈনিকদের মাঝেই স্বাধীনতার এ-ভাব বেশী। তাদের অনেকেই প্রয়োজন হইলে, এজন্য, চাকরী তো সামান্য কথা, প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত।

এই ঘটনার অল্প পরেই আফগানদের সাথে খাইবার পাশে ইংরেজের যুদ্ধ বাধে। আমার সাথে পূর্ব্বে যেই বাঙ্গালী অফিসারটি থাকিতেন, তিনি বহুদিন পূর্ব্বেই অন্যত্র বদলী হইয়াছেন। তাহার স্থলে ডি সুজা (D' Souga) নামে আর একজন অফিসার আসিয়াছেন। তিনিও আমার সাথে এক বাঙ্গলায়ই থাকিতেন। আমাদের উভয়ের সে-যুদ্ধে যাওয়ার হুকুম আসিলো। ডি সুজা গোয়ানীজ খৃষ্টান। ভারতবাসী হইলেও সে নিজেকে ভারতবাসী বলিয়া পরিচয় দেওয়ার খুব বেশী পক্ষপাতী ছিলো না। নশীরাবাদের স্থানীয় ভদ্রলোকদের সাথে মেলা-মেশা সে প্রায় অপমানজনকই মনে করিতো। তার সামাজিক চাল-চলন চলিতো শুধু ইংরেজ মহলে। আমি, ইংরেজদের সাথে খুব মিশিলে-ও, ভারতীয়দের একেবারে বাদ দিতাম না। ক্যাণ্টনমেণ্টের পাশের সহরে অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোকের বাস ছিলো। সুযোগ পাইলেই আমি এদের পাড়ায় বেড়াইতে যাইতাম। বিয়ে সাদীতে এদের বাড়ীতে কখনো কখনো নিমন্ত্রণও হইতো। মাঝে মাঝে এদের বাড়ীতে দু-একটি রোগীও দেখিতাম। এদের ক্লাবে কখনো কখনো টেনিসও খেলিতাম। এরাও সময় সময় আমার বাংলায় বেড়াইতে আসিতো।

নশীরাবাদ হইতে রওনা হওয়ার দিন সকালে ডি সুজাকে বলিলাম—দেখো, আমাদের বিদায় দিতে ষ্টেশনে কোনো ইংরেজ যাবে না। সে বলিলো—না গিয়েই পারে না, আমরা যে কতো বার তাদের বেলায় গিয়েছি। আমি বলিলাম—তা গিয়েছি বটে, কিন্তু আমাদের বেলায় যাওয়াটা এরা প্রেস্‌টিজের হানি মনে করবে। অনেক কথা কাটাকাটির পরেও সে আমার সাথে একমত হইলো না। বিকালে ষ্টেশনে গিয়া দেখি সহরের বেশীর ভাগ ভদ্রলোকই হাতে নানা রকমের ফুলের মালা ও তোড়া লইয়া উপস্থিত—ইংরেজ একজনও নাই। গাড়ীতে ওঠা মাত্র আমাদের দুজনার গলা মালায় ভরিয়া গেলো। কিছুই করি নাই এদের জন্য—তবু এতো আদর। অথচ যাদের পেছনে এতো ঘোরাঘুরি করিলাম—মদেও যাদের জন্য খরচ হইলো কম নয়—তাদের একটি টুপীও দেখা গেলো না। ডি সুজা ফিরিঙ্গী-ঘেঁসা হইলেও, সে দিন বুঝিলো, ইংরেজ ও আমাদের মাঝে মিশ খাওয়ানোর চেষ্টা, তেল ও জল মেশানোর মতো বিফল।

পথে দিল্লী ষ্টেশনে পূর্ব্ব পরিচিত জনৈক মিলিটারী অফিসারের সাথে দেখা হইলো। তার কাছে শুনিলাম—দিল্লীতেও গান্ধীর গ্রেপ্তারের পর সৈনিকদের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছিলো। সেজন্য সৈনিক বিভাগের বড় কর্ত্তাদের মাথা একটু বিচলিতও হইয়া উঠিয়াছিলো। দিল্লীর অনেক জায়গায় কাঁটাওয়ালা তারের বেড়া পর্য্যন্ত লাগানো হইয়াছিলো।

আফগান যুদ্ধ

পেশাওয়ার পৌঁছিয়াই দেখি বিরাট সমর শয্যা। পৌঁছানোর পরের দিনই চল্লিশ নম্বর পাঠান পল্টনের সাথে আমার আগানোর হুকুম হইলো! পল্টনে পৌঁছিয়াই এড্জুট্যাণ্টকে বলিলাম—যুদ্ধের তাঁবু আমার নাই, দু-এক দিন সময় আমায় দিতে হবে, নইলে আমার জন্য আপনারই একটি তাঁবুর ব্যবস্থা করতে হবে। সে হাসিমুখে ঘাড় নাড়িয়া বলিলো—তাতে আটকাবে না। পরদিন ভোরে ঘোর ঘোর থাকিতেই পলটনের সাথে আমি পেশাওয়ার হইতে রওনা হইলাম। বৈশাখ মাস। গরম প্রায় একশো দশ ডিগ্রী। দুদিকে খাড়া উঁচু পাহাড়। তারই মধ্যবর্তী খাইবার গিরিসঙ্কটের পথে সারাদিন মার্চ্চ করিয়া সন্ধ্যায় আমরা আলী মস্জিদ পৌঁছি। সারাদিনের হাড় ভাঙ্গা খাটুনির পর, বিশ্রামের সম্ভাবনায় শুক্নোমুখে হাসি-রেখা ফুটিতে না ফুটিতেই, নিকটের পাহাড়ের উপর হইতে শত্রুদের ছোড়া গুলি শ্রাবণের ধারার মতো আমাদের উপর বর্ষিত হইতে লাগিলো। আমাদের ক্যাম্পের কাছে জনৈক পাঠানের একটি খালি বাড়ী পড়িয়াছিলো। গুলি হইতে আত্মরক্ষার জন্য তারই বারান্দায় আশ্রয় লইলাম। চালের উপর ও সামনের উঠানে অগনিত গুলি পড়িতে দেখিয়া প্রথমটা বেশ একটু ঘাবড়াইলাম। কিন্তু দশ মিনিটের মধ্যেই এই ব্যাপারটা অনেকটা বরদাস্ত হইয়া আসিলো। আমাদের পক্ষের সৈন্যদের পাল্টা আক্রমনে ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই শত্রুরা হটিয়া

গেলো। দু-একদিন আলী মসজিদে থাকিয়া আমরা আরো দশ মাইল আগে ল্যাণ্ডিকোটাল গেলাম। ল্যাণ্ডিকোটালে শিখদের একটি সুন্দর দুর্গ আছে। আমাদের তাঁবু পড়িলো দুর্গের বাহিরে একটু দূরে। আমাদের ক্যাম্পের একটু দূরের মাঠেই পাশের গাঁয়ের শিরোয়ানী পুরুষ-মেয়েরা কাজ করিতে আসিতো। এদের গাঁয়ের বুরুজওয়ালা মাটির ঘর গুলি দেখিতে সুন্দর ও রোমাঞ্চকর। এদের সাথে আমাদের কোনো লড়াই ছিলো না, তাই এরা নির্ব্বিবাদে নিজেদের বাড়ীতেই বাস করিতো। এদের প্রত্যেকের বাড়ী এক একটি দুর্গ। এ-সব দুর্গে বসিয়া এরা প্রায় প্রতিনিয়তই নিজেদের মধ্যে লড়াই চালায়। এ-সব লড়াইয়ে এরা মুক্ত ভাবে রাইফেল ব্যবহার করে। এদের প্রত্যেকেরই রাইফেল আছে। রাইফেল ছাড়া এরা কোথায়ও যায় না। যাওয়া নিরাপদও নয়।

ল্যাণ্ডিকোটাল পৌছিয়াই এড্‌জুট্যাণ্টের কাছে একটি তাঁবু চাহিলাম। কিন্তু সে অনেকটা মিলিটারী মেজাজে বলিলো—আমার কোন বাড়তি তাঁবু নাই। একটা যা ছিলো তা-ও দিতে হয়েছে জনৈক ইংরেজ অফিসারকে। রাগে আমার সারা শরীর গরগর করিতে লাগিলো। চোখ রাঙ্গাইয়া তাকে বলিলাম—আমি ভারতীয়, তাই তুমি আমার সাথে এরূপ ব্যবহার করতে সাহস পেলে। সে মুখ হাঁড়ি করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলো। আমি সে দিন থেকে অভিমানে অফিসারদের সাধারণ মেসে খাইতে যাওয়া বন্ধ করিলাম। হাঁসপাতালের জন্য দেওয়া সাধারণ একটি দো-চালা তাঁবুর

এক কোণে আমার তলপী-তলপা লইয়া আড্ডা গাড়িলাম। খাওয়া দাওয়াও চলিতো সেখানে। আমার এ-অপমান জনক অবস্থা দেখিয়া জনৈক মুসলমান জমাদার আসিয়া বলিলো— সাহেব, আপনার তাঁবুর অভাব হ'লে আমার একটা তাঁবু আছে, নিতে পারেন। তখন আমার মনে পড়িলো অনেক দিন আগের জনৈক ভারতীয় সিনিয়ার অফিসারের উপদেশ —মনে রেখো, যুদ্ধ ক্ষেত্রে ভারতীয়ের বন্ধু শুধু ভারতীয়ই। একজন সাধারণ ভারতীয় সৈনিক যা করার জন্য গলা বাড়াবে, কোনো ইংরেজ বন্ধুর কাছে তার দশ ভাগের এক ভাগের আশাও চাঁদের জন্য ক্রন্দনের সমান। জমাদার সাহেব একজন ভারতীয় অফিসার। সৈনিকবিভাগে সম্মানিত ব্যক্তি। আমি তাকে বলিলাম—আমার তো এখন এতেই চলে যাচ্ছে, পরে দরকার হ'লে বোল্‌বো।

ল্যাণ্ডিকোটালে অবিরাম ঘূর্ণী বায়ু বহিতো। ধুলোয় সারা-দিনই ক্যাম্প প্রায় অন্ধকার থাকিতো। ফলে সকলের চেহারা হইতো অনেকটা ছাইমাখা শিবের মতো। একদিন দুপুর রাতে ঘূর্ণীবায়ুর এক প্রচণ্ড দমকা হাওয়ায় আমার একমাত্র আশ্রয় হাঁসপাতালের তাঁবুটিও উড়িয়া গেলো। আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় অশ্রুজল পড়িয়াছে জীবনে অনেক দিনই। দুঃখে ও রাগে কখনো এর আগে চোখের জল বাহির হয় নাই। কিন্তু সে-দিন অশ্রু-সংবরণ অসম্ভব হইলো। অন্তঃস্থল মথিত করিয়া মুখ দিয়া আপনা আপনি বাহির হইলো—ভগবান, এই একটি মাত্র সম্বল ছিলো, তাও কেড়ে নিলে। মেসের টেবিলে শুইয়া সে

রাতটা কোনোরকমে কাটিলো। পরদিনই হুকুম আসিলো আরো দশমাইল আগানোর।

এই নূতন জায়গার নাম ল্যাণ্ডিখানা। খাইবার পাশের প্রকৃত প্রস্তাবে এখানে-ই শেষ। আফগান রাজ্যের আরম্ভ এখান থেকে তিন চার মাইল আগে। প্রসিদ্ধ বাগ স্প্রিং (Bagh Spring) এর-ই অতি কাছে। এই বাগস্প্রিংএর জলরোধ করার জন্যই আফগানের সাথে ইংরেজের এই যুদ্ধ বাঁধে। খাইবার পাশে আসা অবধি ভালো স্নানের সুযোগ জোটে নাই। এ-অঞ্চলে জলের অত্যন্ত অভাব। প্রত্যেক অফিসার ও সৈন্যকে পরিমিত পরিমাণ জল দেওয়া হইতো। তাতেই সারাদিনের কাজ করার পর সন্ধ্যাবেলা কোন রকমে কাকস্নান সমাধা হইতো। বালিতে সর্ব্বক্ষণ গা কিচ্ কিচ্ করিতো। তাই ল্যাণ্ডিখানা পৌছার পরই সকলে পাগল হইলো এই ঝরণার জলে গা ডুবাইয়া স্নানের জন্য। আমিও গেলাম। স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ জল দেখিয়া সাহেবরা সকলেই ল্যাংটা হইয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িলো। চারিদিকে হাজার হাজার সিপাহী দাঁড়ানো। তারা তাদের মানুষ বলিয়াই গ্রাহ্য করিলো না। নি[illegible] দ্বিধায় দিগম্বর সাজিয়া হাসাহাসি করিতে লাগিলো। শুধু তরুণ অফিসারেরা নয়, বুড়ারা পর্য্যন্ত। মুস্কিল হইলো আমার। বড় মোটা টার্কিশ টাওয়েলটা কোনো মতে কোমরে জড়াইয়া জড়সড় ভাবে আমায় নামিতে দেখিয়া মেজর হিল সাহেব প্রায় একটু রুষ্ট কণ্ঠেই বলিলেন—Don't be silly Doctor. মেজর হিলের ছিলো আমাদের রেজিমেণ্টে পদ মর্য্যাদায় তৃতীয় স্থান। সকলের

উপর ছিলেন কর্ণেল সাহেব, তারপর একজন মেজর—সেকেণ্ড-ইন্-কমাণ্ড, মেজর ছিল তৃতীয়। এরপর সকলে মিলিয়া আমার তোয়ালেটা ধরিয়া টানাটানি সুরু করিলো। যতো টানে ততো আমার লাজ বাড়ে। শেষে আমায় নেহাৎ সেকেলে মনে করিয়া রেহাই দিলো। বাগস্প্রীং-এ দু-তিনদিন থাকার পর ফিরিয়া আমাদের ল্যাণ্ডিকোটাল যাইতে হইলো।

এবার আর তাঁবুর কোনই অসুবিধা রহিলো না। অত্যধিক গরমে ছোট তাঁবুতে থাকা কষ্টকর। তাই চার জনার আন্দাজ বড় টেণ্ট আমদানী করা হইলো। আমাদের টেণ্টের তিন কোণে থাকিতো তিনজন তরুণ ইংরেজ অফিসার আর এক কোণে থাকিতাম—হংস মধ্যে বক যথা—আমি। এখানে একই ঘরে এদের সাথে দিন রাত থাকার সুযোগে এদের চরিত্রের মাধুর্য্য আমার কাছে আরও স্পষ্টরূপে ধরা পড়িলো। আমরা বাহির থেকে দেখি এদের উদ্দাম ফেণিল জীবন স্রোত। কিন্তু এদের ভিতরের সৌম্য সুন্দর মূর্ত্তিটি ফুটিয়া ওঠে বাইরের গোলমাল হইতে বহুদূরে নিরালা নিভৃত গৃহকোণে। এক ঘরে চারজন থাকিলেও সকাল হইতে বিকাল ৪টা অবধি পরস্পরের মধ্যে সেখানে কোনরূপ কথাবার্ত্তা চলিতো না। কথা কওয়ার নিতান্ত ঠেকা হইলে যাইতে হইতো বাইরে কিংবা খাওয়ার তাঁবুতে। কোন বন্ধু দেখা করিতে আসিলে, তারও তাঁবুর ভিতর ঢোকা ছিলো রীতি বিরুদ্ধ। দরজায় দাঁড়াইয়া ইঙ্গিত করা মাত্রই যার সাথে দেখা করিতে আসিয়াছে সে অতি চুপচাপে, ঘরের আর কারোর

কোনরূপ অসুবিধা না করিয়া, বাহিরে চলিয়া যাইতো এবং বাহিরে দাঁড়াইয়া কিংবা কখনো কখনো মেসের তাঁবুতে বসিয়া বন্ধুর সাথে আলাপ করিতো। সকলেই সারাদিন আপন মনে নিজের বিছানায় চিৎ হইয়া শুইয়া রুচি অনুযায়ী বই পড়িতো এবং পড়া বিষয়ে রাত্রে খাবার টেবিলে আলাপ চালাইতো। অনেক গভীর বিষয়ে আলোচনা হইতো। সৈনিক অফিসারদের খুব কমই ইউনিভারসিটির পরীক্ষা পাশের ধার ধারে। মোটামুটি লেখাপড়া শিখিয়াই তাহারা সৈনিক বিভাগে ঢোকে। কিন্তু নিজেদের অসীম পরিশ্রমের ফলে অনেকে অনেক বিষয়ে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করে—নানা ভাষাও শেখে। মেজর টুটার তেরো চৌদ্দটা ভাষা মোটামোটি জানিতেন। এ-সব ভাষা এদের অনেক সময় বাধ্য হইয়াও শিখিতে হয়। যুদ্ধ উপলক্ষে ইহাদের পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যাইতে হয়। স্থানীয় ভাষা জানা না থাকিলে নিপুনতার সাথে সে দেশে যুদ্ধ চালানো অনেক সময় অসম্ভব। তাই উদ্যোগী অফিসারেরা ইচ্ছা করিয়াই অনেক ভাষা শেখে। ভাষা শিখিলে পুরস্কার লাভ হয়, ভাবী উন্নতির আশা বাড়ে, এ-ও এদের এসব কাজে উৎসাহিত করে। শুধু ভাষাই নয়—ল্যাণ্ডসকেপ্ পেইন্টিং—প্রকৃতির চিত্রও এদের আঁকিতে শিখিতে হয়। তাই অনেক অফিসারকে ভাল ছবি আঁকিতেও আমি দেখিয়াছি। এ-ধরণের আরো অনেক বিদ্যা তারা অর্জ্জন করে। যুদ্ধক্ষেত্রে সব সময় যুদ্ধ চলে না, অনেক সময় নীরবে বসিয়া থাকিতে হয়। এ-সব সময় তারা শুধু গল্প-গুজব, হাসি-ঠাট্টা

কিংবা অমোদ-প্রমোদে না কাটাইয়া এ-ধরণের বিদ্যা অর্জ্জনে ব্যয় করে। তাই যুদ্ধক্ষেত্রে এ-অলস জীবনও তাদের এক ঘেঁয়ে নীরস না হইয়া আনন্দ-চঞ্চল ও বিচিত্রময় হইয়া ওঠে।

পাঁচটার পর কিন্তু কারো টেণ্টে থাকার সাধ্য থাকে না। সকলকে ইহারা ধরিয়া বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া যায় খেলার মাঠে। কেহ যাইতে আপত্তি করিলে বলে—Don't make your knees stiff. প্রতিদিন বিকালে খেলা ইংরেজ চরিত্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট। যুদ্ধক্ষেত্রের সহস্র প্রকার অসুবিধার মধ্যেও এরা নানারূপ খেলার বন্দোবস্ত করে। এ-সব খেলায় যোগ দেয় শুধু অফিসারেরাই নয়—সাধারণ সৈনিকেরাও। আভিজাত্য ও সাম্যের বিচিত্র মিলনে এদের জীবন গঠিত। প্যারেড্ গ্রাউণ্ডে, খাওয়ার টেবিলে, থাকার টেণ্টে, অফিস-গৃহে এদের মেজাজ আভিজাত্যের ছাঁচে ঢালা। কিন্তু খেলার মাঠে কিংবা অন্যান্য আমোদ-প্রমোদে এদের কোন আভিজাত্যেরই চিহ্ন থাকে না। তখন সকলে আশ্চর্যারূপে সমান হইয়া যায়। এ-ভাবে সমান হইতে পারে বলিয়াই মাইনে, পোষাক, খাওয়া দাওয়া প্রভৃতি ব্যাপারে অফিসার ও সৈনিকের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ সত্ত্বেও, এদের মধ্যে একটি নিবিড় ভালবাসা ও একাত্মবোধের সম্বন্ধ গড়িয়া ওঠে। আর খেলার মাঠে কৃতিত্বের উপরই অনেকের চাকুরি রাজ্যের ভাবী উন্নতি নির্ভর করে। খেলার মাঝেই যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষার অনেকটা আপনা-আপনি লাভ হয়। ভাল খেলোয়ারের পক্ষে সুদক্ষ সৈনিক হওয়া অতি সহজ। এজন্য

খেলা সৈনিকদের শিক্ষার একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ। খেলা-শেষে সকলে স্নান সারিয়া ও পোষাক পরিয়া ডিনার টেবিলে আসিয়া জড় হয়। ডিনার টেবিলে সকলকেই পরিপাটী রকমে নিজ নিজ পদ অনুযায়ী সৈনিকের পোষাক পরিয়া আসিতে হয়। ডিনার এদের প্যারেডেরই অংশ বিশেষ। প্রতিদিন ঠিক সময়ে ডিনার আরম্ভ হয়। ডিনার আরম্ভ হওয়ার আগে সকলকেই সেখানে আসিয়া সমবেত হইতে হয়। দেরীতে আসা অপরাধের সামিল। ডিনার টেবিলে অফিসারেরা নিজ নিজ পদ অনুসারে নির্দ্দিষ্ট আসনে বসে। কমাণ্ডিং অফিসার বসেন টেবিলের শীর্ষদেশে। কোন অফিসার কোন দিন দেরীতে আসিলে, তাকে অতি বিনীতভাবে কমাণ্ডিং অফিসারের কাছে গিয়া, ধীরে ধীরে বলিতে হয়—Sorry sir, I am late. ডিনার শেষ হইলে ব্রীজ্ খেলা আরম্ভ হয়। এ-খেলার মধ্যেও এদের সংযমের অভাব নাই। আমরা চারজন মিলিয়া খেলিতে আরম্ভ করিলেই ঝগড়া ঝাটি করিয়া সব শেষ করি। এদের মধ্যে খেলার সময় আমি কিন্তু কখনো ঝগড়া ঝাটি দেখি নাই। এরা টাকা বাজি রাখিয়া খেলে—বিনা বাজীতে কখনো খেলে না। কেউ খেলায় অন্যায় করিলে কিংবা খেলিতে না পারিলে তাকে লইয়া হয়তো এরা আর পরে খেলে না। কিন্তু খেলার মাঝে কথার নির্ম্মম খোঁচায় কারো প্রাণে ব্যাথা দিয়া খেলার সব সৌন্দর্য্য নষ্ট করে না। খেলা শেষে প্রত্যেকেই যায় নিজ নিজ তাঁবুতে শুইতে। এরা মুখে কারো প্রতি কোনো দরদ না দেখাইলেও, অন্যের সুখ দুঃখের প্রতি এদের সর্ব্বক্ষণ পূরা নজর।

এক ঘরে চারজন শুইলেও কেউ কখনো গোলমাল করিয়া কারো শান্তিভঙ্গ কিংবা নিদ্রার ব্যাঘাত করে না। এ-সম্বন্ধে একদিনের কথা আমার বেশ মনে আছে। আমি শুইয়া আছি। আমার পাশের বিছানাতেই আর একজন আড়াল-করা হারিকেনের আলোয় অতি সন্তর্পণে একখানা বই পড়িতে ছিলো। আমার রাত বারোটায় প্রতিদিনই প্রস্রাব করিতে উঠিতে হয়। সে দিনও উঠিলাম। আমায় উঠিতে দেখিয়া অতি দুঃখের স্বরে সে বলিলো—I am sorry, I disturbed you. এরূপ সমবেদনার চিহ্ন আমি দেখিয়াছি এদের প্রায় সকল কাজেই। এবং এর অভাবেই আমাদের দেশে জীবন অনেক সময় দুর্বিসহ হইয়া উঠে।

একদিন রাতে আমরা খানা খাইতেছি—সংবাদ আসিলো নিকটের এক পাহাড়ে শত্রুরা জমা হইয়াছে, রাত দুটোর সময় আমাদের রেজিমেণ্টের রওনা হইতে হইবে সে পাহাড়ের দিকে তাদের সাথে লড়াই-এর উদ্দেশ্যে। আমাদের রেজিমেণ্টের কর্ণেল গ্রাসফোর্ড অতি সুপণ্ডিত ও সুনিপুণ যোদ্ধা ছিলেন। অনেক সম্মানিত পুরস্কার এবং উপাধিও তাঁর এ জন্য লাভ হইয়াছিলো। এ-সংবাদ শুনিয়াই তিনি আমায় বলিলেন—যাও না ডাক্তার, ঠেকাও এদের। Had we left India to day, the Afghans would have looted the bazars of Calcutta within twenty-four honrs. আমার যে স্বদেশের পানে খুব টান, ইংরেজদের শাসকরূপে এ-দেশে থাকা যে আমি মোটেই পছন্দ করি না, দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা চাই, প্রয়োজন

হইলে দেশের স্বাধীনতার জন্য এদের সাথে সংগ্রাম করিতেও প্রস্তুত—এ-সব কথা কর্ণেল সাহেবের জানা ছিলো ভালরূপেই। উত্তরে আমি বলিলাম—কর্ণেল সাহেব, আপনি ভুলে যাচ্ছেন, ইংরেজদের এদেশে আসার আগে, আফগানরা কলিকাতার বাজার লুট করে নাই, ভারতের শিখেরাই আফগানদের দেশের বেশীর ভাগ দখল করেছিলো। সামনের এ-দুর্গটি শিখদের এই জয়েরই পরিচায়ক। কিন্তু আপনাদের পৌনে দুইশ বৎসরের শাসনের ফলে আমরা এতো দুর্ব্বল ও হীনবীর্য্য হয়ে পড়েছি যে আপনার মুখে আজ ওরূপ অপমান সূচক কথা অনায়াসে বেরুতে পারলো। কর্ণেল সাহেব আমার মুখ থেকে এ তেতো সত্যটুকু শুনিয়া মনে মনে নিশ্চয়ই সুখী হন্ নাই কিন্তু এর জবাবে-ও তার বলার কিছু ছিলো না। তারপর আরম্ভ হইলো যুদ্ধে রওনা হওয়ার আগেকার আমোদের পালা। সকলে হাত ধরাধরি করিয়া গোল হইয়া দাঁড়াইয়া মদ খাইতে খাইতে নাচিয়া গাইতে লাগিলো—

Let us to night merry be,
For to-morrow we will die.

এদের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া মনে চমকিয়া উঠিলো বিবেকানন্দের সেই অমরবাণী—বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। এরা কানায় কানায় সংসারকে ভোগকরে, আবার মৃত্যুকেও বরণ করিতে পারে ভোগের রঙ্গীণ অর্ঘ্য হাতে করিয়া। আমি অবাক নয়নে দাঁড়াইয়া এদের আনন্দ লীলা দেখিতেছি, এমন

সময় মেজর হিল আমার হাত ধরিয়া এক ঝাঁকুনি দিয়া বলিলো—

Don't be silly Doc—Have some drink to night. সে নিশীথ রাতে মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণের আয়োজনের মাঝে-ও মৃত্যু পথের সহযাত্রীর অনুরোধ রক্ষার জন্য আমার কিন্তু মদের গ্লাস হাতে লওয়া সম্ভব হইলো না।

এ-চিত্র দেখিতে দেখিতে অন্য যে একটি চিত্রের কথা তখন মনে হইয়াছিলো, তা-ও এখানে বলিয়া ফেলি। সে-সময় আমি ও যুগল মেডিক্যাল কলেজে পড়ি। এখনকার মতো তখন কলিকাতায় বায়োস্কোপের ছড়াছড়ি ছিলো না। মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের কাছে ম্যাডান্ কোম্পানীর একটি মাত্র বায়োস্কোপ গৃহ ছিলো। Battle of Waterloo দেখিতে আমি ও যুগল একদিন সেখানে গিয়াছিলাম। এই আমার জীবনে দ্বিতীয় বার বায়োস্কোপ দেখা। ইংরেজ শিবিরে পুরুষ ও মেয়েদের পূর্ণ উদ্যমে বল্‌ড্যান্স চলিতেছে। এমনি সময় যুদ্ধের জন্য তৈরী হওয়ার বিগল বাজিয়া উঠিলো। বল্‌ড্যান্স এক নিমেষে বন্ধ হইলো। পাঁচমিনিটে সকলে সমর সাজে সাজিয়া আসিলো। ভোগের মাঝে সর্ব্বস্ব ত্যাগের জন্য সদা তৈরী থাকার এ-সাধনাই ইংরেজকে এতো বড় করিয়াছে। এ-প্রসঙ্গে আরো একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। ১৯১৮-এর যুদ্ধ-বিরামের কয়েক মাস আগে জার্ম্মাণরা যখন অতি জোড়ে প্যারিসের দিকে আগাইতে ছিলো—ইংরেজের আসন্ন পতনের আশঙ্কায় যখন অনেকের প্রাণই প্রায় পূর্ণ—তখন একদিন নশীরাবাদ

মেসে বসিয়া ডিনার খাইতেছি, দেখি সকলে আমোদ প্রমোদে মত্ত। কারো মুখে কোনো চিন্তার রেখা মাত্র নাই। ডিনার শেষে সকলেই আপন আপন বাসায় চলিয়া গেলো —আমি ও টুটার সাহেব শুধু বাকী রহিলাম। আমি টুটার সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম—আমাদের পক্ষের পরাজয়ের সংবাদ প্রতি মুহূর্তে আসিতেছে—তবুও আপনাদের কোনও উদ্বেগ নাই। এর মানে কি? তিনি মদের গ্লাসটি মুখ হইতে নামাইয়া হাসিয়া বলিলেন—এতো সহজে অস্থির হলে ইংরেজকে আজ অর্দ্ধেক দুনিয়া শাসন করতে হ'তো না। নশীরাবাদ থাকিতে থাকিতেই যুদ্ধ থামে। নশীরাবাদে এ-সংবাদ পৌঁছে সন্ধ্যার পর। আমাদের মেসে সে-দিন গেষ্ট নাইট ছিলো। ডিনার শেষ হইলে ক্যাণ্টনমেণ্টের আর সব অফিসারদের-ও আমাদের মেসে আমোদ করার জন্য ডাকা হইলো। সে ক্যাণ্টনমেণ্টে তখন একশ কুড়িজন অফিসার ছিলো। সকলেই আসিলো। রাত দশটা থেকে আরম্ভ করিয়া একটা অবধি তুমুল মদ খাওয়া চলিলো। একটার পর যাদের জ্ঞান ছিলো তারা নিজেরাই আপন আপন বাংলায় চলিয়া গেলো। জ্ঞানহারাদের কেউ কেউ বোধ হয় সে-মাঠেই পড়িয়া রহিলো। কাউকে কাউকে বেয়ারারা হারিকেন হাতে আসিয়া খুঁজিয়া লইয়া গেলো। আমিও দু-এক জনকে পৌঁছাইয়া দিলাম। পরের দিন সকালে দেখি সকলে আপন আপন কাজে ব্যস্ত। এতো বড় একটা যুদ্ধে এরা যে জয়ী হইয়াছে, তা কারো মুখে কিংবা কাজে প্রকাশ পাইলো না। এ-সম্বন্ধে

এর পর কোনো কথাও আমি এদের মুখে শুনি নাই। নশীরাবাদে আমার এক বিশেষ বন্ধু ছিলো—নাম ক্যাপটেন্ গ্রীণউড্। সে ইংলণ্ডের এক অভিজাত বংশের ছেলে। চার বৎসর গ্যালিপলিতে কাটাইয়া ভারতে আসিয়াছে। গ্যালিপলিতে সে কি কি করিয়াছে বলার জন্য কতো দিন পীড়াপীড়ি করিয়াছি। সে কিন্তু সে সম্বন্ধে কখনও কিছু বলে নাই। বেশী জেদ্ করিলে বলিতো—কি আর করেছি, কতো লোককে কতো করতে দেখেছি, আমার কথা আর কি বোল্‌বো।

এর কিছু দিন পরেই ঘোড়া হইতে পড়িয়া আমার গলার ডান হাড়খানা ভাঙ্গিয়া যায়। নশীরাবাদেই ঘোড়া চড়া আরম্ভ করিয়াছিলাম কিন্তু পাকা হইতে পারি নাই। তাই এ-পতন। চিকিৎসার জন্য প্রথম আমায় নেওয়া হইলো এ্যামবুল্যান্স হাঁসপাতালে। ল্যাণ্ডিকোটাল দুর্গের একটি পাকা দালানে এই হাঁসপাতালটি অবস্থিত ছিলো। হাঁসপাতালে যাওয়ার পরই আমি বেদনায় আস্তে আস্তে কোঁ কোঁ করিতে লাগিলাম। আমার কোঁ কোঁ শব্দ শুনিয়া ইংরেজ মেডিক্যাল অফিসার রাগিয়া বলিলো—Why are you groaing and disturbing other patients? আমি বলিলাম—বড় ব্যাথা, তাই একটু কোকাচ্ছি। আমার কথা শুনিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন—But you have no right to disturb others. আমি চুপ করিলাম। এরপর শত অসুবিধা সত্ত্বেও মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলি নাই। অন্যকে চুপ করিয়া শুইয়া থাকিতে দেখিয়া নীরবে সহার অভ্যাস আমারও

হইলো। দিন দুই ল্যাণ্ডিকোটাল হাঁসপাতালে রহিলাম। অনেক ইংরেজ অফিসারের সাথেই ল্যাণ্ডিকোটালে জানা শোনা ছিলো, একজন ছাড়া কেহ আমায় দেখিতে আসিলো না। এরপর আমায় নেওয়া হইলো পেশাওয়ার। সেখানেও সেই চুপচাপ ভাব। নার্স, কম্পাউণ্ডার, ড্রেসার, অর্ডারলী সকলেই চুপে চাপে আপন কাজ করিতেছে। সারা হাঁসপাতালে যেন নিঝুম রাতের নিস্তব্ধতা। কারো মুখে কোনো কথা নাই।

সেখান থেকে এ্যাম্বুলেন্স ট্রেণে গেলাম রাওলপিণ্ডী বেস (Base) হাঁসপাতালে। একটা বড় ওয়ার্ডে প্রায় চল্লিশ জন রোগী। রোগীদের সবই ইংরেজ অফিসার। তাদেরই মাঝে আমার একটি বিছানা মিলিলো। এতোগুলি লোক একসাথে আছি। তবুও কোন গোলমাল নাই। সকলেই নীরবে, কারো কোনো অসুবিধা না করিয়া, আপন আপন কাজ করিতেছে। কথা-বার্ত্তা, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে এদের এই সংযমই আমায় মুগ্ধ করিতো। রাওলপিণ্ডী হাঁসপাতালে ছোট একটি লাইব্রেরী ছিলো। সকাল হইতে রাত দশটা অবধি, খাওয়া দাওয়া ছাড়া কোনো কাজ না থাকায়, শুধু বই পড়িয়াই কাটাইতাম। প্রতিদিন সকালে নার্স একখানা বই দিতো। সে-দিন রাত্রে সে বইখানা শেষ করিয়া শুইতাম। হাঁসপাতালে বাইশ দিন ছিলাম। বাইশখানা বই শেষ হইলো।

রাওলপিণ্ডী হাঁসপাতালের অফিসারেরা একদিন দেখি সামরিক পোষাকের পরিবর্ত্তে মুফ্‌তী (civil dress) পরিয়া

আসিয়াছে। কারণ জিজ্ঞাসা করায় জনৈক মেডিকেল অফিসার আমায় বলিলো—আমরা এই যুদ্ধে আর কোন হিস্যা নেব না ঠিক করেছি। কেন নেব? আফগানরা কি অপরাধ করেছে? তারা স্বাধীনতা চায়, হোক না তারা পূর্ণ স্বাধীন, তাতে আমাদের লোকসান কি? তাদের পরাধীন রাখার কি অধিকার আছে আমাদের? আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—তবে আজ এখানে এসেছেন কেন? সে বলিলো—আমরা সাধারণ পোষাক পরে রোগীদের সেবা করবো মাত্র, যুদ্ধের আর কোন কাজ করবো না। শুধু কি মেডিকেল অফিসারেরাই এই সংকল্প করেছে, না ইংরাজ সৈনিক মাত্রই—আমার এ-প্রশ্নের উত্তরে সে বলিলো—সকল ইংরেজ সৈনিকই আর এ-যুদ্ধে কিছু করবে না ঠিক করেছে। ল্যাণ্ডিকোটাল থাকিতেই একদিন দেখি আফ্‌গানিস্থানের প্রতিনিধিরা সন্ধির কাথাবার্ত্তা চালানোর জন্য শিম্‌লা যাইতেছে। ভারতীয় সৈনিকদের অনেকেই—আমি শুদ্ধ—তাদের রাস্তার দু-পাশে দাঁড়াইয়া অভিনন্দন জানাই। আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গিয়াছিলাম বটে কিন্তু আমাদের প্রাণের স্বাভাবিক টান ছিলো তাদেরি দিকে। এ-অভিনন্দন তারই নিদর্শন। রাওলপিণ্ডি হাঁসপাতালে থাকিতে থাকিতেই সংবাদ আসিলো সন্ধি হইয়াছে—আমির আমানুল্লা তার দেশের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা চাহিয়াছিলেন, সেই স্বাধীনতা তিনি পাইয়াছেন। বাহিরের অনেককেই বলিতে শুনিয়াছি, ইংরেজ, যুদ্ধে হারার ফলেই, আমানুল্লার স্বাধীনতার এই দাবী মানিতে বাধ্য হইয়াছিলো।

কিন্তু আমরা—যারা যুদ্ধে গিয়াছিলাম—ভালরূপেই জানি আফগানের সাথে ইংরেজ কোনো যুদ্ধেই হারে নাই। ইংরেজের সুসংবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত বাহিনীর কাছে দাঁড়ানোর ক্ষমতা আফগানদের ছিলো না মোটেই। তাই যুদ্ধের পর যুদ্ধে হারিয়া তাহারা ক্রমাগত পিছনের দিকে হটিতে বাধ্য হইয়াছে। ইংরেজের এরোপ্লেন দু-একবার কান্দাহারের উপর এতো অধিক পরিমাণে বোমা ফেলিয়াছিলো যে আফগানেরা ভয়ে একেবারে মুষরাইয়া পড়িয়াছিলো। তবুও ইংরেজ আফ্‌গানের সর্তে কেন সন্ধি করিলো ভাবিবার বিষয়। যে ইংরেজ ভারতবর্ষকে পদানত রাখিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না, সে যে কেন এতো সহজে আফগানিস্থানকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিলো, তা তখন আমাদের কাছে একটি পরম বিস্ময়ের বস্তু ছিলো বটে, কিন্তু এখন রুশের ইতিহাস পড়িয়া বুঝিতে পারিয়াছি, শুধু আফ্‌গানিস্থানেই নয়, ইংরেজ সৈনিকরা সোভিয়েট রুশের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলো। ইংরেজ ও ফরাসী সৈনিকদের সোভিয়েট রুশের 'রুদ্ধে যুদ্ধ করিতে এই না-রাজিই সোভিয়েট রুশের রক্ষার একটি প্রধান কারণ। তখন সত্যিই দীর্ঘ দিন ব্যাপী ভয়াবহ যুদ্ধ চলার ফলে, শান্তির আকাঙ্ক্ষা মানুষের মনে অনেকটা জাগিয়াছিলো এবং প্রত্যেক জাতিরই স্বাধীনভাবে আপন অদৃষ্ট গড়িয়া তোলার অধিকার আছে—এ ভাব-ও শিক্ষিত দেশের জনগণের প্রাণে কতক পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছিলো। তাই ভারতীয় ইংরেজ সৈনিকদের আফ্‌গানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতে অস্বীকৃতি।

এবং এই অস্বীকৃতিই ইংরেজকে জয়ের মধ্যেও পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য করে।

এর পর আটাশ দিনের ছুটি লইয়া আসিলাম কলিকাতা। প্রফুল্ল তখন কলিকাতায় থাকে। সে এম,এ পাশ করিয়া প্রথম প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রফেসার হয়—পরে কলিকাতা মিণ্টের ডেপুটি এ্যাসে-মাষ্টারের চাকরি পায়। ৫৮ মেছুয়া-বাজার ষ্ট্রীটে পুলিশের অত্যধিক উৎপাত আরম্ভ হওয়ায়, আমাদের কলিকাতার আড্ডা নয় নম্বর বাদুড়বাগান লেনের বাড়ীতে নেওয়া হয়। প্রফুল্ল এখানেই থাকিতো। আমি-ও নয় নম্বরে উঠিলাম। কলিকাতায় আমাদের ভাবী কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইলো। ঠিক হইলো এক বছরের মধ্যেই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া কাজ আরম্ভ করা দরকার এবং এ ক বছরের মধ্যে আমাকে অন্ততঃ ছ হাজার টাকা জমাইতে হইবে। আশ্রম প্রতিষ্ঠার জায়গা সম্বন্ধেও অনেক জল্পনা কল্পনা হইলো। ফরিদপুরের বর্ত্তমান ডাক্তার কিরণ রায় তখন আমাদের দলের সাথে অনেকটা সংশ্লিষ্ট ছিলো। তাদের বাড়ী ফরিদপুর জেলার রাজবাড়ী হইতে ছ মাইল দূরে। একসময় তারা বড় জমিদার ছিলো। এখনো খাসে তাদের অনেক জমি আছে। কিরণ আমাদের সংকল্পিত আশ্রমের জন্য প্রয়োজনীয় জমি দিতে রাজী হইলো। তাই আমি ও যোগেন জমি দেখিতে তাদের বাড়ী গেলাম। জমি আয়তনে বড় হইলেও খুব বেশী পছন্দসই হইলো না। এর পর ফরিদপুর হইতে বাড়ী হইয়া চাঁদপুর যাই।

মা এ-সময় চোখের অসুখে ভুগিতেছিলেন। অপারেশন দরকার। তাঁকে লইয়া কলিকাতা ফিরিলাম। সাথে কালু-ও আসিলো। অপারেশনের পর মাকে কালুর চার্জ্জে রাখিয়া আমি লাহোর যাই।

মাসুদ যুদ্ধ

লাহোরে কয়েকদিন থাকার পর আমার ডেরাইসমাইলখাঁ যাওয়ার হুকুম হইলো। আফগান যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। মাসুদ যুদ্ধ চলিতেছে। মাসুদরা সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হইলেও একটি শক্তিশালী দুর্ধর্ষ পার্ব্বত্য জাতি। এদের পাহাড়ে দেশ অনুর্ব্বর। সেখানে কৃষি বিশেষ কিছু হয় না। ব্যবসাবাণিজ্য এরা করে না। লুণ্ঠনই এদের প্রধান উপজীবিকা। অনেক বছর যাবৎ ইংরেজ এদের বশে আনিতে চেষ্টা করিতেছে কিন্তু সফল হয় নাই। আফগানদের সাথে যুদ্ধের মূল কেন্দ্র ছিলো পেশাওয়ার। মাসুদদের সাথে যুদ্ধে মূল কেন্দ্র হইলো ডেরাইসমাইলখাঁ।

ডেরাইসমাইলখাঁ হইতে মাইল দেড়েক দূরে আকালগড় নামে শিখদের একটি দুর্গ আছে। বর্ত্তমানে ইহা একটি সৈনিকদের হাঁসপাতালে পরিণত হইয়াছে। এ-হাঁসপাতালটি অতি বড়। গোরা ও দেশী সৈনিকদের জন্য প্রায় পনর শ বিছানা আছে। এ-হাঁসপাতালেই আমার কাজ জুটিলো। হাঁসপাতালের অধ্যক্ষ কর্ণেল সাহেব—নাম মনে নাই—রুক্ষ মেজাজের লোক হইলেও—অতি কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন। আমি

চিরদিনই কাজ পছন্দ করি। এখানে অনেক কাজ জুটিলো। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খাটিয়াও কাজ শেষ করিতে পারিতাম না। কোনো কোনো দিন রাত আটটা নয়টা বাজিতো।

কয়েকদিন এ-হাঁসপাতালে কাজ করিবার পর টঙ্কে যাওয়ার হুকুম আসিলো। এই হুকুমে প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিলো। প্রথমতঃ—কর্ণেল সাহেবের যে মেজাজ, কাছে থাকিতেই ভয় হয়। দ্বিতীয়তঃ—টঙ্ক মাসুদ যুদ্ধের কেন্দ্রস্থল। সেখানে গেলে অনেক সংগ্রাম দেখা যাইবে। আগে সংগ্রামকে ভয় করিলেও, এখন আর সংগ্রামে আমার কোন ভয় হয় নাই। ল্যাণ্ডিকোটালে প্রায় প্রতি রাত্রেই চারিদিকের পাহাড় হইতে শত্রুরা আমাদের ক্যাম্পের উপর গুলি ছুড়িতো। অনেক সময় গুলী ঠিক মাথার উপর দিয়া হিস্ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। তবু কখনো ভয় হয় নাই। বরং কোন রাতে গুলী না আসিলেই ভালো লাগিতো না। শান্তি যেমন মানুষকে শান্তিপ্রিয় করিয়া তোলে, সংগ্রামও সেরূপ সংগ্রামপ্রিয় করে। এ-সংগ্রামের মাঝে সে তখন পায় আনন্দ। সংগ্রাম ছাড়া তার ভাল লাগে না।

তাই আমি রওনা হওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি সাজ গোজ শেষ করিলাম। এ্যাম্বুলেন্স গাড়ীও দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলো। এমন সময় কর্ণেল সাহেব দ্বারগোড়ে আসিয়া বলিলেন—ক্যাপটেন্ ব্যানার্জ্জি, "Are you in ?" ঘর হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হওয়ার পরই তিনি বলিলেন—তুমি খুব

কর্ম্মঠ, তোমার মতো লোক না হ'লে আমার চলবে না, তাই আমি তোমায় ছাড়লাম না, তোমার যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি। কর্ণেল সাহেব কাউকে-ও বড় একটা প্রশংসা করিতেন না, তাই তার এ-প্রশংসার মূল্য খুবই বেশী। কিন্তু তখন ইহা আমার মোটেই পছন্দ হইলো না। কারণ তখন আমার প্রাণ মাতিয়া ছিলো সংগ্রাম-আহ্বানে। কিন্তু কর্ণেল সাহেবের হুকুম মানা ছাড়া অন্য উপায়-ও ছিলো না। তাই আমায় অগত্যা থাকিতে হইলো।

হাঁসপাতালের বাইরের বাংলা সমূহেই আমাদের মেস্ ছিলো। সেখানে আমরা সকল অফিসার থাকিতাম। প্রত্যেক সপ্তাহেই এক একজনকে অর্ডারলী অফিসার হইতে হইতো। সপ্তাহ ভর সর্ব্বক্ষণ তাহাকে থাকিতে হইতো হাঁসপাতালে। খাওয়া দাওয়া-ও হাঁসপাতালে জুটিতো। আমার-ও একবার অর্ডারলী অফিসারের ডিউটি পড়িলো। অর্ডারলী অফিসারকে প্রতিদিন অতি সকালে উঠিয়া হাঁসপাতাল ষ্টাফের প্যারেড্ পরিদর্শনে যাইতে হইতো। তাহার পর তাঁহাকে হাঁসপাতাল কম্পাউণ্ডের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া দেখিতে হইতো সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছে কিনা। একদিন ঘুরিয়া সাফাই দেখিতেছি, এমন সময় কর্ণেল সাহেব সেখানে আসিয়া উপস্থিত। আমি সাধারণতঃ সাফাই দেখার পর ঘরে ফিরিয়া কামাইতাম। সুতরাং আমাকে না-কামানো অবস্থায় দেখিয়া কর্ণেল সাহেব বলিয়া উঠিলেন—Every officer must come out of his room before parade fully dressed and ready

for the whole day. কামানো-ও ড্রেসিংএর একটি অঙ্গ। সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি সম্বন্ধে এরূপ তীক্ষ্ণ নজর বলিয়াই এদের এতো উন্নতি সম্ভব হইয়াছে। আর একটি ঘটনা বলি। আমিও আর একটি অফিসার একদিন অফিস রুমে বসিয়া আছি। এমন সময় একটি গোরা সৈন্য সেখানে আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইলো। সৈনিকটি সেই দিন কামায় নাই। দাড়ি সামান্য দেখা যায়। ইংরেজ অফিসারটি অমনি চোখ রাঙ্গাইয়া বলিলো—*How dare you come before* and salute an officer unshaved? Go back to your room, get yourself properly shaved, then come and say what you have got to say. সৈনিকটিকে বিনা বাক্যব্যয়ে পুনঃ স্যালুট করিয়া ফিরিয়া যাইতে হইলো।

প্রায় প্রত্যহই সংগ্রামক্ষেত্র অভিমুখে আমাদের Convoy পাঠাইতে হইতো। এ-সব Convoy রওনা হইতো ভোর ছ-টায়। সকল অফিসারকে সে-সময় উপস্থিত থাকিতে হইতো। একদিন এ-Convoy রওনা হওয়ার ঠিক সময় আমি উপস্থিত হইতে পারিলাম না। Convoy রওনা হওয়ার একটু পরেই আমি সেখানে গিয়া হাজির হইলাম। কর্ণেল সাহেব কাছেই ছিলেন। তাহাকে দেখিয়া ভয়ে আমার বুকের মাঝে দুরু দুরু সুরু হইলো। কর্ণেল সাহেব ঘড়ি হাতে আগাইয়া বলিলেন—you are six miuates late. প্রত্যুত্তরে বলার কিছুই ছিলো না। লজ্জায় মাথা নোওয়াইয়া রহিলাম। মিনিট দুই পরে আর একজন ইংরেজ অফিসার

আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কর্ণেল সাহেব তার পানে একবার কটমটাইয়া চাহিলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না।

প্রতিদিন সকালে নয়টার সময় অফিসারদের কর্ণেল সাহেবের আফিসে সমবেত হইতে হইতো। এ-সময় অফিসারেরা কর্ণেল সাহেবকে তাহাদের অভাব অভিযোগ জানাইতো। কর্ণেল সাহেব-ও অফিসারদের যথাবিহিত নির্দ্দেশ ও আদেশ দিতেন। সেদিন সকালে আমরা যথাসময়ে অফিসরুমে উপস্থিত—এমন সময় কর্ণেল সাহেব আমার পানে তাকাইয়া শুধু বলিলেন—you belated gentleman, আর কিছুই বলিলেন না। বোধ হয় অতীত কর্ম্মনিষ্ঠার ফলেই রেহাই পাইলাম। কিন্তু দেরীতে আসা ইংরেজ অফিসারটিকে অতি রুক্ষকণ্ঠে বলিলেন—I dont know who recommended you for a commission. Neither do I know how honestly I can keep an irresponsible officer like you any more in my service. I am riging up A.D. M.S. for your immediate transfer. সেদিন বিকালেই অফিসারটি অন্যত্র বদলি হইলো। যুদ্ধক্ষেত্রে সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি-ও যে এদের অসহনীয় এবং এরূপ অপরাধের জন্য যে কোন অফিসারের নিষ্কৃতি পাওয়া অতি কঠিন, তার পরিচয় এ-ছাড়াও আমি অনেকবার পাইয়াছি। এ-রূপ ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য অকথ্য ভাষার গালি গালাজ করিতে-ও এদের মুখে বাজে না। কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এতো কড়াকড়ি বলিয়াই এদের কাজকর্ম্মে বিশৃঙ্খলা ঘটে খুব কম।

মাস দু পরেই এই কর্ণেল সাহেব ডেরাইসমাইলখাঁ হইতে বদলী হইলেন। এর স্থানে আসিলেন কর্ণেল উইলসন। ইনি লোক খুব ভদ্র ছিলেন। কিন্তু কাজকর্ম্মে আগের কর্ণেলের মত অতো পটু ছিলেন না। কর্ণেল উইলসন আসিয়াই হাঁসপাতালের সাথে একটি ল্যাবরেটারী খোলার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। নশীরাবাদে একটি ল্যাবরেটারী ছিলো। সেখানে থাকা কালীন আমি ল্যাবরেটারীর কিছু কিছু কাজও শিখিয়াছিলাম। কর্ণেল উইলসনকে সে কথা বলিলাম। তিনি আমায় ল্যাবরেটারীর ভার দিলেন। ল্যাবরেটারীর কাজের সাথে সাথে একটি ডিসেণ্টরী (আমাশয়) ওয়ার্ডের ভার-ও আমার উপর ছিলো। আমি ল্যাবরেটারীর কাজে মাতিয়া গেলাম। আমাশয়ের পোকা এ্যামিবা সম্বন্ধে অনেক কাজ-ও করিলাম। এ-বিষয়ে একটি বড় প্রবন্ধ-ও লিখিয়াছিলাম। আমাদের ডি,এ, ডি,এম,এস্ (Deputy Assistant Director of Medical Services) —নাম মনে নাই—আমার এ-কাজ খুব পছন্দ করিতেন। তিনি নিজে-ও এ্যামিবা সম্বন্ধে অনেক কিছু জানিতেন। সে-সব সম্বন্ধে মাঝে মাঝে আসিয়া আমায় উপদেশ-ও দিতেন। সকাল নয়টা হইতে আরম্ভ করিয়া বিকাল চারটা পাঁচটা পর্য্যন্ত মাইক্রোসকোপের সাহায্যে অনিমেষ নয়নে এ্যামিবাদের কার্য্যকলাপ দেখিতাম। কখনো ক্লান্তি বোধ হইতো না। বরং আনন্দ লাগিতো। এ-কাজে ধৈর্য্য ধরিয়া লাগিয়া থাকিলে হয়তো কিছু করা যাইতো। কিন্তু সদা

গড়িয়ে চলা পাথরের গায় শেওলা ধরে না। আমার অবস্থা-ও তাই হইলো।

নশীরাবাদে ট্যাংক্রীডের মতো, আকালগড়ে ক্যাপ্‌টেন্ ম্যাকেঞ্জির সাথে খুব ভাব হয়। ক্যাপ্‌টেন ম্যাকেঞ্জি ছিলেন একজন খাঁটি ইংরেজ। ইংরেজের সমস্ত দোষগুণই তাতে পূরা মাত্রায় বিদ্যমান ছিলো। তিনি বয়সে তরুণ ও দেখিতে বলিষ্ঠ ছিলেন। কাজ করিতেন আমাদের হাঁসপাতালে। থাকিতেন আমারই পাশের কামরায়। অবসর সময়ে নানা বিষয়ে তার সাথে আলাপ হইতো। তিনি ঘোড়া চড়ায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। সকালে ও বিকালে রীতিমতো ঘোড়া চড়িতেন। নিজের ঘোড়ার প্রতি তার দরদ-ও ছিলো অসীম। কর্ণেল উইলসন আকালগড়ে আসার পর, তিনি, অন্য কোনো স্থান হইতে বদলি হইয়া, সেখানে আসেন। তার আসার কিছুদিন পর সংবাদ আসে সহিসের সাথে তার ঘোড়া দড়িয়াখাঁ পৌছিয়াছে। দড়িয়াখাঁ রেলওয়ে ষ্টেশন বিশাল সিন্ধুনদীর পূর্ব্ব তীরে। এখানে নামিয়াই সিন্ধু পার হইয়া দেরাইসমাইলখাঁ যাইতে হয়। দেরাইসমাইলখাঁ নদীর পশ্চিম পাড়ে। ঘোড়া দড়িয়াখাঁ পৌছিয়াছে শোনা মাত্রই তিনি ছুটি লইয়া ঘোড়াটি আনার জন্য সেখানে গেলেন। বলিলেন—আনার ভার সহিসের হাতে ছাড়িয়া দিলে ঘোড়াটার অনেক কষ্ট হইবে। হয়তো তার উপর চড়িয়াই আসিবে। তাই তিনি নিজে গেলেন। দড়িয়াখাঁ হইতে দেরাইসমাইলখাঁ প্রায় চৌদ্দ মাইল। সন্ধ্যার পর ঘোড়াটি সহ হাঁটিয়া ক্লান্ত

অবস্থায় তিনি দেরাইসমাইলখাঁ পৌছেন। পৌছিয়াই বিশ্রাম না করিয়া গেলেন ঘোড়াটির ইলাজ করিতে। এবং গা ডলা থেকে আরম্ভ করিয়া তার সর্ব্বপ্রকার সেবা-শেষে নিজে আসিলেন বিশ্রামের জন্য। আমিতো একেবারে অবাক। ভাবিলাম—খামখা একটা জাতি বড় হয় না। বড় হওয়ার জন্য অনেক কাঠ কয়লা পোড়া দরকার।

That makes all the difference in life—বলিয়া তিনি আমায় একদিন ঘোড়া চড়া আরম্ভ করিতে বলিলেন। নিজে শিখাইতেও রাজী হইলেন। নশীরাবাদে আমি ঘোড়া চড়া শেখা আরম্ভ করিয়াছিলাম কিন্তু পাকা হইতে পারি নাই। এবার ম্যাকেঞ্জির সাথে আবার দু-বেলা চড়িতে আরম্ভ করিলাম। তার নিপুণ শিক্ষার ফলে কিছু দিনের মধ্যেই অনেকটা পাকা হইয়া উঠিলাম। আকালগড়ে তখন একটি হান্টিং ক্লাব ছিলো। প্রতি শুক্রবার বিকালে এরা হান্টিং-এ বাহির হইতো। আকালগড়ের প্রায় সকল ইংরেজ অফিসার তো এতে যোগ দিতোই—দেরাইসমাইলখাঁ হইতে-ও অনেক আসিতো। ফলে পার্টিটি বেশ জমিয়া উঠিতো। খরগোষ পাওয়া সব সময় সম্ভব ছিলো না বলিয়া এরা পেপার চেজ করিতো। একজন সওয়ার আগে একটি থলি হইতে কাগজের টুকরা ফেলিতে ফেলিতে যাইতো, আর সকলকে মাঝে-মাঝে-ফেলা কাগজের টুকরা লক্ষ্য করিয়া এর অনুসরণ করিতে হইতো—একে অবশ্য দেখা যাইতো না। বিভিন্ন অফিসার কাগজের টুকরার অন্বেষণে বিভিন্ন দিকে ছুটিতো। কারো নজরে কাগজের টুকরা পড়িলে

সে অমনি চীৎকার করিয়া উঠিতো—আর সকল ঘোড়া সেদিকে ছুটিতো। ঘোড়াগুলি-ও ঐ-চীৎকার শব্দ শোনায় অভ্যস্ত ছিলো। সাধারণতঃ খরগোসের পিছনে হাউণ্ড ছুটাইয়া দেওয়া হয়। কোনো হাউণ্ড খরগোষ দেখামাত্র জোরে চীৎকার করিয়া ওঠে। সমস্ত ঘোড়া তখন প্রাণপণ সেদিকে ছোটে। এই ছোটার সময় ঘোড়া কোনো বাঁধা বিঘ্ন মানে না। সকলের আগে চীৎকারের স্থানে পৌছার জন্য পথে বেড়া, খাল, নালা যা কেন না পড়ে লাফাইয়া পার হইতে চেষ্টা করে।

কর্ণেল উইল্‌সন্‌ আমাকে এই শিকারে যোগ দিতে বলিলেন। আমিও রাজী হইলাম। আমার ঘোড়াটি হান্টিং-এ অতি পাকা ছিলো। একবার চীৎকার শুনিলে আর সহজে বাগ মানিতো না, প্রাণপণ ছুটিতো। আমি তখন ঘোড়া চড়া অনেকটা শিখিয়াছি বটে, কিন্তু পাকা সওয়ার হওয়া যাকে বলে তাহা হই নাই। কাজেই একটু একটু ভয় হইতো। যামিনী ছিলো তখন আমার চাকর। ছুটি থেকে ফিরিয়া যাওয়ার সময় তাকে সাথে নিয়াছিলাম। সে আমাদের কলিকাতার বাসায় বহুদিন হইতে চাকর ছিলো। প্রতি শুক্রবার বিকালে পোষাক পরিয়া শিকারে রওনা হওয়ার আগে যামিনীকে বলিতাম—আজ বোধ হয় আর তাজা ফিরবো না। সে আমায় খুব ভালবাসিতো। কাঁদ কাঁদ ভাবে বলিতো—এতো বিপদ যখন, না গেলে কি হয়? কিন্তু প্রাণভয়ে না যাওয়া আমার কিছুতেই ভালো লাগিতো না। ফিরিয়া আসিয়া

দেখিতাম সে আমার পথপানে চাহিয়া আছে—তার মুখে হাসির রেখা।

এমনি করিয়া সাহেবদের সাথে মেলা মেশা ও খুব ভাব হইলো। আমিও তাদের সঙ্গ বেশ ভালোবাসিতাম। সুবিধা পাইলেই তাদের সাথে মিশিতাম। আমার আগাগোড়াই উদ্দেশ্য ছিলো এই সুযোগে ইংরেজ চরিত্রের সাথে যতোখানি সম্ভব পরিচিত হওয়া। আমাদের হাঁসপাতালে কয়েকজন ভারতীয় অফিসারও ছিলো। তাহাদের অনেকেই ইহা লইয়া আমার নানারূপ সমালোচনা করিতো। বলিতো—আমি অত্যন্ত সাহেব ঘেসা—একেবারে সাহেব বনে গেছি, ভারতীয়দের সাথে মিশি না। আমি তাদের বলিতাম—ভারতীয়দের সাথে মেশার সুযোগ সারা জীবনই পাবো, কিন্তু এদের সাথে এভাবে মিশবার সুযোগ আর হয়তো জুটবে না। তাদের আরো বলিতাম—বিকালে বসে বসে তাস খেলা ও আড্ডা দেওয়ার চেয়ে ঘোড়ায় চড়ে বেড়ানো অনেক ভালো। তাদের-ও ঘোড়ায় চড়া শিখিতে বলিতাম। কিন্তু তাসের দিকেই তাদের রোখ্ ছিলো বেশী। আমার সাহেব হওয়ার জনরব আমার ভারতীয় বন্ধু মহলে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িলো। আমার পূর্ব্ব জীবনের সাথে পরিচিত কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে উত্তীর্ণ কয়েকজন অফিসার-ও সেখানে ছিলো। তারা আমার এ-অধঃপতনের সংবাদে বিস্মিত ও দুঃখিত হইলো। ভূপেস দাসগুপ্ত, যার কথা পূর্ব্বে আরো বলা হইয়াছে, তখন দড়িয়াখাঁ থাকিতো। সে আমায় একদিন ফোনে এসব কথা বলিলো। চাকরি

ছাড়িয়া কলিকাতা আসার পর আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে তার সাথে আমার হঠাৎ এক সন্ধ্যাবেলা দেখা হইলো। ,তখন আমার মাথার চুল ছোট করিয়া কাটা, গালে দাড়ি, পরনে খদ্দর, পা খালি। সে আমায় বলিলো—আপনার সবই সাজে, সাহেবীও আপনার মানিয়েছিলো, এ-ও আপনার মানায়। আমার জীবনে ত্যাগ ও ভোগের সমন্বয় কতটুকু সম্ভব হইয়াছে জানি না কিন্তু ত্যাগ ও ভোগের সমন্বয় সাধন যে ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ তা আমি অন্তরে অন্তরে বিশ্বাস করি। অসংযত ভোগই ব্যক্তি ও জাতির পতনের কারণ—সংযত ভোগ নহে। ইংরেজের ভোগ সংযত—তাই তারা আজ অর্দ্ধ দুনিয়ার মালিক। যে ভোগ মানুষকে কর্ত্তব্যচ্যুত করে না, যে ভোগ মানুষ ছাইয়ের মুঠোর মতো মুহূর্ত্ত মাঝে ছুঁড়িয়া ফেলিতে পারে, সে ভোগই সংযত। এ-ধরণের ভোগ জগতকে উন্নতির পথে নেয়, কলুষিত করে না।

আকালগড় হাঁসপাতালে আগে সিষ্টার (নার্স) ছিলো না—এখন কয়েকজন আসিলো। আমার ঘাড়ে-ও একজন পড়িলো। এ-সব সিষ্টারদের অধিকাংশই বিলা- হইতে আমদানী, কয়েকজন ভারতীয় ফিরিঙ্গী-ও ছিলো। লম্বা মাইনে। কাজ বিশেষ কিছু করিতো না। ইংরেজ অফিসারদের সাথে প্রেম করিয়া বেড়ানোই ছিলো প্রধান কর্ত্তব্য। আমার ওয়ার্ডের জনৈক সৈনিকের সামান্য অপরাধে সিষ্টার একদিন গালে এক চাপড় মারে। রোগীটি সাধারণ গেঁয়ো নয়—সৈনিক। সে মেমসাহেবের এই চাপড়ের অপমান বরদাস্ত না করিয়া আমার

কাছে ছুটিয়া আসিয়া নালিশ জানাইলো। আমি একটু দূরেই দাঁড়াইয়াছিলাম—চাপড় দিতে-ও দেখিয়াছি। সৈনিকটি বলিলো—আমি অপরাধ করতে পারি, কিন্তু এর মারার অধিকার নাই। আপনি আমার অফিসার। আপনার কাছে আমি নালিশ করছি, বিচার চাই। আমি তাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলাম—কোনো ভয় নাই, নিজের চোখে যখন দেখেছি, যথোচিত বিচার হবেই। একটু পরে সিষ্টার আসিয়া কতকটা অভিমানের সুরে আমায় বলিলো—You are my officer, if you do not defend me, where shall I go ? আমি তাকে বলিলাম—এ যখন আমার কাছে বিচার চেয়েছে, তখন এর বিচার করতেই হবে। বিশেষতঃ তোমরা কোনো কাজই কর না, শুধু গালিগালাজ কর। সে ক্রুদ্ধ ফণিনীর মতো রাগিয়া উঠিয়া বলিলো—I hate Indians. উত্তরে আমি বলিলাম—ভারতীয়দের ঘৃণা করলে তাদের সেবা করতে আস কেন ? সে আর কোনো কথা না বলিয়া গট্‌গট্ করিয়া চলিয়া গেলো। ব্যাপারটা অনেকদূর গড়াইবে জানিয়া তখনই কর্ণেল সাহেবকে সব খুলিয়া বলিলাম। নার্সটি সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টের কাছে কাঁদিয়া কাটিয়া নালিশ করিলো। একটু পরেই সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট আমার কাছে আসিয়া উপস্থিত। সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট ধীর স্থির ও বর্ষীয়সী মহিলা ছিলেন। আমার সব কথা আগাগোড়া শুনিলেন। এর অল্প পরেই সমস্ত ব্যাপারের তদন্তের জন্য একটি কমিটি বসিলো। কমিটীর মেম্বার হইলেন কর্ণেল সাহেব ও সিষ্টার সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট। এই কমিটীতে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আমাকেও ডাকা

হইলো। এই সাক্ষ্যদানকালে আমি দুটি বিষয়ের উপরই বিশেষ জোড় দিয়াছিলাম ঃ—(১) ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গী সিষ্টারের বদলে ভারতীয় সিষ্টার নিয়োগ (২) গোরা ও কালো সৈনিকদের হাঁসপাতালে যথাসম্ভব সমান ব্যবহার। শুধু হাঁসপাতাল সম্বন্ধে কথা বলার অধিকারই তখন আমার ছিলো, তাই আর আর ক্ষেত্রের অসমান ব্যবহারের উল্লেখ করি নাই। আমার প্রথম মতটি শুনিয়া সিষ্টার সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট জিজ্ঞাসা করিলেন—সম্ভ্রান্ত ভারতীয় মহিলা এ-কাজের জন্য পাওয়া যাবে? সম্ভ্রান্ত বংশের ভারতীয় মহিলারা কর্ম্মক্ষেত্রে আগাইতে কতোটা প্রস্তুত তা আমার তখন জানা ছিলো না। কিন্তু ভারতের সম্মান বজায় রাখার জন্য আমি সজোরে ও বিনা সঙ্কোচে বলিলাম—নিশ্চয়ই যাইবে। তার ভাবভঙ্গী দেখিয়া মনে হইলো তিনি আমার কথা পূর্ণ বিশ্বাস করিলেন না। যা হোক্, এ-সম্বন্ধে তখন আর কিছু করা হইলো না। কিন্তু দ্বিতীয় মতটুকু কাজে রূপ দেওয়ার জন্য তখনই একটি কমিটী নিযুক্ত হইলো। সে কমিটীতে আমি-ও একজন মেম্বার ছিলাম। আমার ওয়ার্ডের নার্সটিকে অন্যত্র বদলী করা হইলো।

এর পরেই আকালগড় হাঁসপাতালে ভারতীয় সৈনিকদের জন্য একটি রিক্রিয়েশন হল করা হইলো। এই হলে গ্রামোফোন্ এবং ইনডোর গেম্‌সের-ও নানারকম আয়োজন করা গেলো। ঠিক হইলো প্রতিদিন বেলা দুটোর সময় ব্যারাম সেরে-আসা রোগীরা সেখানে গিয়া বিশ্রাম ও আমোদ আহ্লাদ করিবে। কিন্তু সংসারে ভোগের জন্যও শ্রম দরকার। রোগীরা বেলা

বারটা থেকে পাঁচটা পর্য্যন্ত ঘুমাইতেই ব্যস্ত। তাই রিক্রিয়েসন হলে যাওয়া তারা একটা অন্যায় অত্যাচার মনে করিতো। শেষে জোর করিয়া হাবিলদার দিয়া তাদের সেখানে রোজ নেওয়া হইতো।

আরো অনেক বিষয়ে হাঁসপাতালে রোগীদের সুবিধা করার চেষ্টা হইলো। তাদের জন্য এর আগে কোন শ্লিপারের বন্দোবস্ত ছিল না। খালি পায়েই এরা বিছানা ছাড়িয়া চলা-ফেরা করিতো। ফলে পায়ের ধূলো ও মাটিতে বিছানা অতি অল্প কাল মধ্যে ময়লা হইতো। এখন হইতে এদের চটি জুতার বন্দোবস্ত হইলো। চটি জুতা দেওয়া হইলো এই সর্ত্তে যে তার রক্ষণাবেক্ষনের জন্য এরাই দায়ী থাকিবে। হারাণোর ভয়ে ইহারা প্রথম প্রথম চটিজুতা পায়ে না দিয়া বিছানার নীচে গুঁজিয়া রাখিতো। শেষে জোড় করিয়া এদের চটিজুতা ব্যবহার করিতে বাধ্য করা হইলো। এরূপ আরো অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। ইচ্ছা করিলেই মানুষের উন্নতি কিংবা উপকার করা যায় না। নূতন নূতন সুযোগের সুবিধা নেওয়ার সামর্থ্যও তাদের থাকা চাই।

আমাদের হাঁসপাতালের অফিসারদের জন্য একটি মেস ছিলো। মেসে সকলেই আমরা এক টেবিলে বসিয়া ইংরেজী কায়দায় খানা খাইতাম। ডাইনিং হলের সামনেই এন্টিরুম। এন্টিরুমের মাঝে একখানা টেবিলের উপর সকলের পড়ার জন্য নানারকম ইংরেজী কাগজ থাকিতো। মেস হইতে এ-সব আনা হইতো না। বিভিন্ন অফিসারেরা নিজেদের কেনা কাগজ

সেখানে আনিয়া রাখিতো। আমি বরাবরই মডার্ণ রিভিউ পড়িতাম। পড়াশেষে একবার মডার্ণ রিভিউ খানা সে টেবিলের উপর রাখিয়া দিলাম। মেজর লেস্‌লি ছিলেন তখন আমাদের সহকারী অধ্যক্ষ। একদিন তিনি সে কাগজখানা খানিক পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—এ-কাগজখানা কে রেখেছে? আমি রাখিয়াছি শুনিয়া বলিলেন—এ-কাগজ এখানে রাখতে দেওয়া হবে না, এ দেশদ্রোহের ভাবে ভরা। আমি বলিলাম—এ-তো প্রকাশ্যে ছাপা হয়, গভর্ণমেন্টের তরফ থেকে এর রাখা সম্বন্ধে তো কোনো নিষেধাজ্ঞা নাই। তবু তিনি উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—এ-কাগজ এখানে কিছুতেই রাখতে দেওয়া হবে না, সরিয়ে নিতে হবে। বাধ্য হইয়া পরদিন সে কাগজখানা আমি সেখান হইতে সরাইয়া নিলাম। আর একদিন ডিনার খাই-তেছি, এমন সময় ক্যাপ্টেন্‌ ম্যাকেঞ্জি এ-দেশের দারিদ্র্য সম্বন্ধে দুঃখ প্রকাশ করিয়া অনেক কথা বলিলেন। তার কথা শুনিয়া আমি বলিলাম—এ-দেশের এ-দারিদ্র্যের জন্য ইংরেজরাই দায়ী। আমার কথা শুনিয়া কর্ণেল সাহেব বলিয়া উঠিলেন—What do you say? আমি সজোরে বলিলাম—It is you who are responsible for the poverty of this land. কর্ণেল সাহেব কিংবা আর কেউ কোন কথা বলিলেন না। নীরবে ডিনার শেষ হইলো। পরদিন দেখি সকল ইংরেজ অফিসারের মুখ সান্ধ্য আকাশের মতো গম্ভীর। কর্ণেল সাহেব তো কিছুকাল পর্য্যন্ত আমার মুখের দিকে তাকাইলেন-ই না, কথা বলাতো দূরের কথা। ইংরেজের সাথে ভারতীয়ের যতোই ভাব হোক্‌ না কেন,

তার একটা সীমা আছে এবং সে সীমা অতিক্রম করিতে গেলেই অসংখ্য গোল বাধে।

ইংরেজের সাথে সমকক্ষভাবে কাজ করাও মুস্কিল। ভারতীয় Non-commissioned অফিসারদের শিক্ষার জন্য কম্পটিতে এ-সময় একটি ট্রেনিং স্কুল খোলা হয়। এই স্কুলের শিক্ষকের পদের জন্য আমাদের হাঁসপাতাল হইতে একজন উপযুক্ত ইণ্ডিয়ান অফিসার চাওয়া হয়। ইণ্ডিয়ান অফিসারদের সংক্ষেপে বলা হয় I. O. এদের উপাধি সুবেদার মেজর, সুবেদার ও জমাদার। বৃটিশ কমিশনওয়ালা অফিসারদের সাধারণতঃ বলা হয় বি, ও। এদের উপাধি সেকেণ্ড লেফ্‌টেনেণ্ট, লেফ্‌টেনেণ্ট, ক্যাপ্টেন, মেজর, লেফ্‌টেনেণ্ট কর্ণেল, কর্ণেল ইত্যাদি। আমাদের প্রত্যেকের সাথে একজন করিয়া আই, ও ছিলো। আমাদের অধীনস্থ সিপাহীদের কার্য্যকলাপের তত্ত্বাবধানই ছিলো এদের কর্ত্তব্য। কর্ণেল সাহেব আমাদের প্রত্যেকেরই কাছ থেকে আমাদের অধীনস্থ আই, ও-দের এ-পদের উপযুক্ততা সম্বন্ধে মতামত চাহিয়া পাঠাইলেন। হাঁসপাতালের আই, ও-দের মধ্যে আমার নীচেকার আই, ও-টিই সবচেয়ে অধিক কর্ম্মনিপুণ, এ-কথা সকলেই বলিতো। সে চলিয়া গেলে আমার কাজের অসুবিধা হইবে জানিয়াও, কর্ত্তব্যের খাতিরে তার কথা সজোরে লিখিয়া পাঠাইলাম। ক্যাপ্টেন্ উইলস্ ছিলেন আমাদেরই সহকর্ম্মী। তিনি-ও এক জনের জন্য লিখিলেন। তার অনুমোদিত অফিসারটিকেই কর্ণেল সাহেব ঐ পদের জন্য বাছিলেন। আমার অধীনস্থ আই, ও-টি ঐ চাকরি না পাওয়ায়

দুঃখিত হইয়া আমায় বলিলো—একজন ইংরেজ অফিসারের অধীনে কাজ করিলে সে নিশ্চয়ই ঐ চাকরি পাইতো। আমি-ও তার কথায় সায় দিলাম। সাথে সাথে তাকে বলিলাম—পরাধীনতার এ-ই বিষম দোষ। নিজ বাসভূমে আমরা পরবাসী—তাই আমাদের কোন কথা খাটে না। সে আমার কথার যাথার্থ্য বুঝিয়া আর কোনো আপশোষ করিলো না।

প্রতিদিন সকাল নয়টায় কর্ণেল সাহেবের অফিসে আমরা সমবেত হইতাম—একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পরদিন ঐ সময়ে কর্ণেল সাহেবকে আমি বলিলাম—আপনি জানেন আমার অনুমোদিত ইণ্ডিয়ান অফিসারটি সব চেয়ে সুদক্ষ। কিন্তু সে আমার মতো একজন ভারতীয়ের অধীনে কাজ করে বলেই ঐ চাকরি পায় নাই। সাদা কালোয় এতো পার্থক্য করলে কালো অফিসারদের কাজ করাই কঠিন—কেননা, কোনো ভাল লোকই তাদের অধীনে কাজ করতে চাইবে না, সকলেই চাইবে ইংরেজের অধীনে কাজ করতে। কর্ণেল সাহেব আমত আমতা ভাবে অনেক কথা বলিয়া আমায় বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তার যুক্তির দুর্ব্বলতা তিনি নিজেই মনে মনে বুঝিয়াছিলেন। তাই বেশী কথা বলা নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া শেষে চুপ হইয়া গেলেন। আমি মনে মনে বুঝিলাম—আমরা চাকরি করি বাপ মা হীন অবস্থায়। একজন ইংরেজ অফিসারের প্রতি কোন অবিচার হইলে তা লইয়া পার্লামেণ্ট গৃহ কাঁপিয়া উঠে। কিন্তু বেচারা ভারতবাসী জোর করিয়া তাকে তাড়াইয়া দিলেই বা সে কি করিতে

পারে। কে আছে সারা দুনিয়ায় তার হইয়া একটি কথা বলে।

মেজর ব্রায়ারলী নামে আমাদের আর একজন সহকর্মী অফিসার ছিলেন। এর বিনয়-নম্র কথা ও দয়ালু ব্যবহার সকলকেই মুগ্ধ করিতো। ইনি আমাদের হাঁসপাতালের অপারেশন বিশেষজ্ঞ ছিলেন—যদিও অপারেশন বিশেষ কিছু করিতে পারিতেন না। ইংরেজ বলিয়াই তার এ-পদ প্রাপ্তি। এ-জন্য তিনি মাসে ষাট টাকা ভাতাও পাইতেন। ইনি এর ওয়ার্ডের প্রত্যেক রোগীকে প্রতিদিন এক বোতল করিয়া শ্যামপেন্ দিতেন। আমাদের কিন্তু এরূপ শ্যামপেন ব্যবস্থা করার অধিকারও ছিলো না। আমাদের ওয়ার্ডের রোগীরা অনেক সময় বলিতো—ব্রায়ারলী সাহেবের রোগীদেরই মজা। আমি দুঃখ করিয়া বলিতাম—কি করবে, অভাগা ভারতীয়ের হাতে তোমরা পড়েছো। এরূপ ঘটনা রোজই ঘটিতো। এবং ইহা লইয়া ইংরেজ ও ভারতীয় অফিসারদের মধ্যে মনোমালিন্য লাগিয়াই থাকিতো।

দেরাইলমাইলখাঁতে একটি বড় ল্যাবরেটারী ছিলো। ঐ অঞ্চলের যাবতীয় কাজ সেখানেই হইতো। একজন তরুণ আর, এ, এম, সি অফিসার এর অধ্যক্ষ ছিলেন। এ-জন্য ইনি মাসে ষাট টাকা অতিরিক্ত ভাতা পাইতেন। ব্রায়ারলী সাহেবের মতো কাজ কর্ম্মে ইনিও বিশেষ নিপুণ ছিলেন না, সাদা রং-ই ছিলো এর বিশেষ গুণ। ইনি দেড় মাসের ছুটি লইয়া কাশ্মীরে বেড়াইতে যান। আকালগড় হাঁসপাতালের

ল্যাবরেটারীতে কাজ করিয়া আমার সামান্য কিছু প্রতিষ্ঠা লাভ হইয়াছিলো। তার ফলে তার বিদায় কালের জন্য আমাকেই ঐ ল্যাবরেটারীর অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়। কাজে আমার চিরদিনই আনন্দ। নূতন কাজের সুযোগ পাইয়া আমি সর্ব্বক্ষণ ল্যাবরেটারীতেই পড়িয়া থাকিতাম। এই ল্যাবরেটারীতে বড় বড় অফিসারদের ঘন ঘন আনাগোনা ছিলো। তারা আমার নিষ্ঠা দেখিয়া প্রীত হইলেন। দেড় মাস বাদে ঐ আর, এ, এম, সি অফিসারটি ফিরিয়া আসিলে তাকে অন্যত্র বদলী করিয়া আমাকেই ঐ ল্যাবরেটারীর কাজে বাহাল করা হইলো। একজন ইংরেজের স্থলে আমাকে নিযুক্ত করায় ভারতীয় সহকর্ম্মীরা সকলেই খুসী হইলেন। আমার আর ফিরিয়া আকালগড় যাওয়া হইলো না। ডেরাইসমাইলখাঁতেই স্থায়ী ভাবে রহিয়া গেলাম।

দেরাইসমাইলখাঁয় ভারতীয় অফিসারদের একটি মেস ছিলো। সেখানেই আমি থাকিতাম। আকালগড় মেসে ইংরেজ ছিলো বলিয়া যে শৃঙ্খলা ছিলো, এখানে ছিলো তার সম্পূর্ণ অভাব। যে যার ইচ্ছা মতো পোষাক পরিয়া ডিনার টেবলে খাইতে যাইতো। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, নীরবতা প্রভৃতির দিক দিয়া ডিনার খাওয়ায় প্যারেডের কোন লক্ষণই ছিলো না। দেখিয়া আমার ভারী দুঃখ হইতো। সাহেবদের মেসের মতো শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য অনেক অনুরোধ-ও সকলকে করিলাম। কিন্তু বিশৃঙ্খলার মাঝে বাসের অভ্যাস যাদের মজ্জাগত, শৃঙ্খলার কথা শুনিলে তাদের প্রাণ শিহরিয়া উঠে। আমরা শৃঙ্খলা

মানি অনিচ্ছায়—যদি কোনো ইংরেজ জোর করিয়া তা আমাদের ঘাড়ে চাপায়। এ-দাস মনোভাবই আমায় পীড়া দিতো সবচেয়ে বেশী।

ডেরাইসমাইলখাঁ একটি জিলার প্রধান সহর। এখানে একটি সেণ্ট্রাল জেল ও হাঁসপাতাল ছিলো। সেণ্ট্রাল জেলে বারো শ কয়েদীর বন্দোবস্ত আছে। সবুজ বৃক্ষরাজীর মধ্যে বড় বড় লাল দালানওয়ালা হাঁসপাতলটি দেখিতে বেশ সুন্দর। একজন মেজর ছিলেন এদের চার্জ্জে। তিনি ছুটি লইয়া বিলাত যাওয়ায় এ-ছুটির ভার কিছুদিনের জন্য আমার উপর পড়িলো। জেলসুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট হওয়ায় দেড়শো টাকার অতিরিক্ত ভাতাও পাইতাম। জেলের কাজে যোগদানের পর প্রথমই গেলাম হাঁসপাতালে। গিয়া দেখি হাঁসপাতালের বিছানাগুলি অত্যন্ত নোংড়া। শুভ্রশ্মশ্রুসমন্বিত জনৈক খাঁ সাহেব ছিলেন জেলার। তার পানে চাহিয়া বলিলাম—Is this a pauper hospital ; can't you give them some clean sheets ? খাঁ সাহেব মৃদু হাসিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন—নিশ্চয়ই। এরপর আমি বলিলাম—বিছানা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না হওয়া অবধি আমি আর হাঁসপাতালে আস্‌বো না। পরদিন গিয়া দেখি সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—ধবধবে সাদা চাদরে সব বিছানা ঢাকা। খাঁ সাহেবকে বলিলাম—এরা কয়েদী হলেও মানুষ, মানুষের মতো সর্ব্বপ্রকার সুখ সুবিধাই এদের মিলা চাই।

তারপর গেলাম চৌকায়। জালি জানালাওয়ালা দেয়ালে-ঘেরা রান্নাঘরগুলি ধূঁয়ায় ভরা। তাদের ভিতর ঢোকা মুস্কিল।

সেখানে যে সব কয়েদী পাক করিতেছে তাদের প্রায় সকলেরই চোখে নানারকম অসুখ। ধুঁয়ার মাঝে সারাদিন বাসের ফলেই যে হতভাগ্যদের এ-দুর্দ্দশা, বুঝিতে এক মুহূর্ত্ত-ও দেরী হইলো না। জেলারকে জিজ্ঞাসা করিলাম—এর কি কোনো প্রতীকার নাই? তিনি বলিলেন—চীফ্ ম্যাডিক্যাল অফিসারের অনুমতি হ'লেই হ'তে পারে। পর দিনই তাকে নিম্ন-মর্ম্মের পত্র লিখিলাম—রান্নাঘর হ'তে ধুঁয়া বাহির হওয়ার পথের অভাবে পাচকদের প্রায় সকলেই চোখের অসুখে ভুগিতেছে। প্রতিকার দরকার। প্রত্যুত্তরে তিনি প্ল্যান চাহিলেন। এর আগে আমি আলিপুরের মতো কোন জেল্ দেখি নাই। দেখিলে তখনই প্ল্যান পেশ করিতে পারিতাম। আর সরকারী কোন কাজই সহজে শেষ হয় না। এঞ্জিনীয়ার, ওভারসীয়ার প্রভৃতি কত লোকের সাথেই পরামর্শ করিতে হয়। এঞ্জিনীয়ারের কাছে আনা গোনা করিতে আমার সময় কাটিয়া গেলো—এ-বিষয়ে আর কিছু করা সম্ভব হইলো না। জানিনা হতভাগ্যদের দুর্দ্দশার অবসান হইয়াছে কিনা? বিদেশীরা এদেশে বড় চাকরি লইয়া আসে লম্বা মাইনের খাতিরে—লোকদের ভাল-বাসিয়া সেবা করিতে নয়। তাই এ-অবস্থা এ-ভাবে চলিতে পারে। কখনো কখনো কোনো উন্নতি যে না হয় এমন নয়, কিন্তু তা ঘটে অতি ধীরে, ব্যক্তি বিশেষের মর্জ্জি অনুসারে, সাধারণ নিয়মে নহে।

তারপর আসিলো সরকারী হাঁসপাতালে যাওয়ার পালা। ঢুকিয়া দেখি বড় বড় দালানই সার—তাতে না আছে বিছানা,

না আছে রোগী। যে দু-একটি রোগী আছে তাও এমন নোংড়া ভাবে রাখা, দেখিলে প্রাণ শিহরিয়া উঠে। একখানা ময়লা কম্বলের উপর আর একখানা ময়লা কম্বলে ঢাকা রোগী কয়টি মশা-মাছির ভন্‌ভনানীর মাঝে কোন রকমে শুইয়া আছে—বিছানার দুর্গন্ধে কাছে ঘেঁসা অসম্ভব। সাথে বোধ হয় ছিলেন একজন সাব এসিস্ট্যান্ট সার্জ্জন। তাকে এ-সবের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—হাঁসপাতাল-ফণ্ডে টাকা নাই। ভাবিলাম সব টাকা খরচ হইয়াছে দালান নির্ম্মাণে! বিদেশী সরকার এ-সব বাহ্যাড়ম্বর দ্বারা দেশী লোকদের ভুলাইয়া রাখিতে চায়—তাই ভিতরের দিকে নজর এতো কম।

প্রতিদিন সকাল আটটায় যাইতাম জেলখানায়। সেখানকার কাজ সারিয়া আসিতাম ল্যাবরেটারীতে। জেলখানায় ঢোকা মাত্রই আরম্ভ হইতো বিচারের পালা—আজ এ-কয়েদী ঠিক্ মতো পাহারা দেয় নাই, কাল ঐ কয়েদী এ-ওয়ার্ডারকে গালি গালাজ করিয়াছে ইত্যাদি। অফিস গৃহে অভিযুক্ত কয়েদীদের হাজির করা মাত্রই তাদের প্রতি সহানুভূতিতে আমার হৃদয় ভরিয়া যাইতো। ফলে বিচার কালে প্রাণ আপনা আপনি এদের পানে ঝুঁকিয়া পড়িতো। মনে হইতো—হয়তো সব অভিযোগই মিথ্যা। তাই নানারূপে আমি অভিযোগকারী ওয়ার্ডারকে জেরা করিতাম—কখনো কখনো আসামী কয়েদীদের বেকসুর খালাস দিতাম। একদিন একটি কেস্ ডিস্‌মিস্ করার পর, জেলার, ডেপুটি জেলার প্রভৃতি সকলে মিলিয়া বলিলো—এ-ভাবে জেল্ চালানো অসম্ভব। উত্তরে আমি

বলিলাম—মানুষের সাথে মানুষের মতো ব্যবহার করলে জেল চলবে না এ-কথা আমি বিশ্বাস করি না। প্রত্যেক জেল অফিসারকে সর্ব্বদা মনে রাখতে হ'বে সে নিজেও একদিন কয়েদী হ'তে পারে। এবং সে নিজে কয়েদী হ'লে যেরূপ ব্যবহার কর্ত্তৃপক্ষের কাছে আশা করে, সেরূপ ব্যবহার এদের সকলের সাথে করতে হ'বে। ভবিষ্যতে এরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি সম্বন্ধে সাবধান করিয়া তাদের বিদায় দিলাম।

তার পরের সোমবার আসিলো রাউণ্ডের পালা। প্রকাণ্ড শ্বেতছত্রের নীচে জেলার, ডেপুটী জেলার ও বহু ওয়ার্ডার পরিবৃত হইয়া রাজার হালে রাউণ্ডে বাহির হইলাম। দু-দিকে সারিবদ্ধ কয়েদীরা কার্ড হাতে দাঁড়ানো। সরকার সেলাম শোনামাত্র সকলেই সেলাম দিতেছে। ওয়ার্ডে ঢুকিয়া দেখি—ঘরের দু-পাশে লাইন করা মাটির বেদী সমূহ—তাদের মাথার দিক বালিশের মতো উঁচু করা। এ-সব দ্বারা কি হয় জিজ্ঞাসা করায় জেলার বলিলো—রোগীরা শোয়। ভয়ে আমার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিলো। জেলার সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম—কয়েদী হয়ে এলে আমায়ও কি এ-সবের উপর শুতে হবে। জেলার হাসিয়া বলিলো—তা হ'বে বই কি? কিছুদিন পরে একটি সাহেব কয়েদী হইয়া জেলে আসিলো। জেলে গিয়া দেখি তার জন্য আগে থেকেই বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। কারণ জিজ্ঞাসা করায় জেলার বলিলো—এরা রাজার জাত, এদের কথা আলেদা।

গিরীশের পত্র

এ-সময় গিরীশের এক পত্র আসিলো—হাজার টাকা এখনই চাই, নইলে জেলও হইতে পারে। গিরীশের সাথে অনেক দিন দেখা নাই। তার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে শুনিয়াছি। তবু পত্র পাওয়া মাত্র প্রাণটা কাঁদিয়া উঠিলো—সে যে আমাদের অতি প্রিয়। টাকা তখন ব্যাঙ্কে কিছু জমাও ছিলো। টাকা পাঠাইতে মন বার বার উন্মুখও হইলো। কিন্তু গেল ছুটির সময় কলিকাতার ভাইদের যে বলিয়া আসিয়াছি—এক বছরের মধ্যে ছ হাজার টাকা জমাব—তাহাই সঙ্কল্প-পথ প্রচণ্ডবেগে রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইলো। মনের মাঝে শেষে ইহা লইয়া তুমুল সংগ্রাম সুরু হইলো। রাত তখন গোটাদশেক। ডিনার শেষ করিয়া বিছানায় শুইয়া আছি। অন্তরের এ-সংগ্রাম ভীষণ আকার ধারণ করিলো। বিছানায় শুইয়া থাকা অসম্ভব হইলো। বাংলা হইতে অল্প দূরেই সিন্ধু তীর। গেলাম সেখানে। জ্যোৎস্না-ধোয়া রাত। সিন্ধুর বালুকা-আচ্ছন্ন দ্বীপগুলি জ্যোৎস্নার অস্পষ্ট আলোকে অতি দূর অবধি দেখা যাইতেছে। মাঝে মাঝে নদীর ছোট বড় স্রোত আঁকিয়া বাঁকিয়া নানারকম রাগ রাগিণী তুলিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। নদীর ঠিক পাড়ে একটি ঝোপড়া গাছ ছিলো। তারই একটি মোটা শিকরের উপর বসিয়া সে নিশীথ রাতে নদীর এ-নৃত্য লীলা অনিমেষ নয়নে দেখিতে লাগিলাম। মনে পড়িলো দ্বিজেন্দ্র লালের সেই গান—মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কি সঙ্গীত ঐ ভেসে আসে। সাথে

সাথে নিজের প্রাণের চিরন্তন সুর আশ্রম প্রতিষ্ঠার কথা-ও জাগিয়া উঠিলো। মনে হইলো—স্থায়ী মঙ্গলের জন্য সাময়িক অনেক অমঙ্গলকে বরণ করিয়া লইতে হয়। গিরীশের জন্য ভারী দুঃখ হইলো। তার প্রেম-মাখা স্নিগ্ধ মুখ খানি বার বার মনে পড়িলো। কিন্তু উপায় নাই। টাকা না পাটানোই শেষে স্থির হইলো। রাত যখন প্রায় একটা, তখন এই চিন্তা লইয়া বাংলায় ফিরিলাম—চারিদিকের বন্ধু বান্ধবদের এতো অভাব, এর মাঝে টাকা মানুষ জমায় কিরূপে?

যুগলের বিবাহ

যুগল প্রাইমারী এফ, আর, সি, এস ও এম, আর, সি, পি পাশ করিয়া, শেষ এফ, আর, সি, এস-এর জন্য তৈরী হওয়ার উদ্দেশ্যে বিলাতের কোন এক হাঁসপাতালে চাকরি লয়। কিন্তু সে চাকরিতে বেশীদিন টিঁকিয়া থাকা সম্ভব হইলো না। সকলেই যুদ্ধে যাইতে ব্যস্ত। সামরিক কমিশন লইয়া সে-ও মার্শেলে গেলো। মার্শেলের একটি ফরাসী পরিবারে জনৈক ভারতীয় ইতি-পূর্ব্বেই বিবাহ করিয়াছিলো। সেই উপলক্ষে মার্শেলের ভারতীয়দের সেই বাড়ীতে আনাগোনা ছিল। যুগল ও যাইতে লাগিলো। সে বাড়ীর একটি তরুণী মেয়ের সাথে তার প্রথমের আলাপ পরে ঘনিষ্ঠ প্রেমে পরিণত হয়। যুগল তাহাকেই বিবাহ করে। যুগলের সাথে তখন আমার রীতিমতো পত্র লেখালেখি ছিলো। কিন্তু এ-বিয়ে সম্বন্ধে এ-সব পত্রে কোনো ইঙ্গিত-ও ছিলো না।

এ সময় ক্যাপ্টেন্ আয়ার নামে জনৈক মাদ্রাজী আমাদের

সহকর্মীরূপে করাচী হইতে ডেরাইসমাইলখাঁ আসে। একদিন গল্পচ্ছলে সে আমায় বলিলো—করাচীতে সে একজন বিলাত ফেরতার মুখে শুনিয়াছে, আঢ্য নামে জনৈক ভারতীয় একজন ফরাসী মহিলাকে বিবাহ করিয়াছে। ইহার পর সে—What an idiot প্রভৃতি বলিয়া—তাকে নানারূপ গালি গালাজ করিতে লাগিলো। এই আঢ্যের সাথে যে আমার পরিচয় থাকিতে পারে, এ-কথা তার মনে-ও আসিলো না। আঢ্য বিবাহ করিয়াছে শুনিয়াই আমার মনে হইলো এ-নিশ্চয়ই যুগল। অমনি আমার মন মুষড়াইলো, মুখ মলিন হইলো। আয়ার আমার মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া আমাকে বার বার জিজ্ঞাসা করিলো—আমি তাকে চিনি কি না। কিন্তু কোনো উত্তর না দিয়া সে-খান হইতে তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িয়া নিজের ঘরে গেলাম।

ঘরে গিয়াই এ-সব কথা লিখিয়া যুগলকে এক পত্র দিলাম। যথাসময়ে উত্তর আসিলো। যুগল লিখিয়াছে—সে বিয়ে করেছে সত্যি কিন্তু এতোদিন এ-সংবাদ সে দেয় নাই। কেমন করে সে লিখবে যে সে বিয়ে করেছে, বিশেষতঃ একজন বিদেশিনীকে। পত্র পাইয়া খুবই দুঃখ হইলো। অনেক দিনের পরিকল্পনা এক নিমেষে চূর্ণ হইয়া গেলো। কিন্তু যুগলকে তা জানিতে দিলাম না। তাকে লিখিলাম—বিয়ে করার জন্য আমি দুঃখিত হই নাই। আঁকা বাঁকা পথ দিয়েই মানুষকে এগোতে হবে, কিন্তু সে যেন পথ না ছাড়ে, লেখাপড়া শেষ করে বিদেশী স্ত্রী নিয়েই দেশে আসে। কিছু কাল পর সে চাকরি

ছাড়িয়া ইংলণ্ডের একটি ক্ষুদ্র সহর কারলাইলে প্র্যাকটিস্ আরম্ভ করে। এখনো সে সেখানেই আছে। পাঁচ ছ বছর আগে একবার তাকে লিখিয়াছিলাম—লণ্ডনে নিশ্চয়ই তার কোন না কোন বন্ধু আছে। তাদের কারোর মারফতে আইরিস বিপ্লব সম্বন্ধে কিছু বই কিনিয়া পাঠাইতে পারে কি না। এসব বই এখানে বড়ই দুর্লভ। উত্তরে সে লিখিলো—Friends he has none. He had them once but through his own way-wardness he had lost them and lost them for ever. প্রাণের কি বিষম দুঃখই না এ-ক্ষুদ্র চিঠিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তার বছর দুই পর সে আবার লিখিলো—Whatever others may say, I tell you Suresh, to day or to morrow I am with you. তখন কুমিল্লা আশ্রমে হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তার মতো একজন সুনিপুণ চিকিৎসক পাইলে খুবই ভাল হয়। তার ছেলে-পিলে নাই; সস্ত্রীক আশ্রমেই থাকিতে পারে, স্ত্রীরও হাঁসপাতালের কিছু কিছু কাজ করা কঠিন নয়। তাদের বাসের জন্য আশ্রমের এক প্রান্তে একখানা বাংলা তৈরী করিয়া দেওয়া অতি সহজ। এখানে তাদের থাকিতে কতোই বা খরচ লাগিবে—মাসে দুশ টাকার বেশী নয়। এ-টাকা কেন, এর চেয়ে অনেক বেশী টাকা-ও সে অতি সহজে উপার্জ্জন করিতে পারিবে। এ-সব কথা লিখিয়া তাকে আসার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়া তার এ-পত্রের উত্তর দিলাম। এ-পত্র সে পাইয়াছে কি না জানি না। এর কোন উত্তর আজ অবধি আমি পাই নাই। আমি আশাবাদী। আশায় বুক ভরিয়া

সংসারের অন্ধকার পথে আগাইতে চেষ্টা করি। এখনো আমার আশা আছে সে একদিন আমার সাথে আসিয়া মিলিবে—আমি যে তাকে ভালবাসি। হইতে পারে ইহা পাগলের প্রলাপ। কিন্তু এ-প্রলাপই ঘনঘটাচ্ছন্ন সংসার-দিগন্তে মুহুর্মুহু ফুটাইয়া তোলে আশার উজ্জ্বল বিজলী রেখা। এরপর আমার কোন কোন বন্ধু বিলাত গিয়া তার সাথে দেখা করিয়াছে। তারা বলে—যুগলের অন্তর-প্রাণ আগের মতোই স্নিগ্ধ ও সরল কিন্তু বাইরের একটা মোহ আবরণে তা চাপা পড়িয়াছে। সে এখানে আসিতে চায়। এখানে আসার জন্য তার মন খুবই ব্যাকুল কিন্তু স্ত্রীর জন্য সম্ভব হয় না। সে-মেয়েটি নাকি কতকটা ভীরু ধরণের। ভারতে আসার কথা শুনিয়াই শিহরিয়া উঠে।

দেউলী

দেরাইসমাইলখাঁ ল্যাবরেটারীতে কাজ করিতেছি। কাজে সকলেই সন্তুষ্ট। নিত্য নূতন কিছু শেখার সুযোগ পাওয়ায় আমার-ও মন উৎসাহে ভরা। সারা ভারতের সৈনিকদের সিফিলিসের রক্ত পরীক্ষার জন্য ল্যাবরেটারী ছিলো দেউলীতে। দেউলী বোম্বেরই নিকটে একটি হিল্ ষ্টেশন। সিফিলিসের রক্ত পরীক্ষার নাম Wasser-mann Reaction—সংক্ষেপে W. R.। এই W. R. এর জন্য আমি দেরাইসমাইলখাঁ ল্যাবরেটারী হইতে বহু রক্ত দেউলীতে পাঠাইতাম। ইচ্ছা হইলো এই পরীক্ষা শিখিয়া আসিয়া আমার ল্যাবরেটারীতেই

এ-কাজ করার। উপরওয়ালাদের এ-কথা বলায়, তারা সহজেই রাজী হইলো। এবং দেউলী ল্যাবরেটারীর অধ্যক্ষকে আমাকে এ-পরীক্ষা শেখানোর জন্য অনুরোধ-পত্র-ও দিলো।

এই পত্রের প্রতিলিপি লইয়া আমি দেউলী রওনা হইলাম। দউলী একটি পার্শী পল্লী। পার্শীদের হোটেলে ইহা ভরা। আমিও একটি পার্শী হোটেলে আশ্রয় লইলাম। পরদিন সকালে ল্যাবরেটারীতে গিয়া শুনি, অধ্যক্ষ কর্ণেল ফ্রষ্ট তখন সেখানে নাই—ছুটিতে কি অন্য কোন কাজে কোথা-ও গিয়াছেন। সহকারী মেজর মারে ল্যাবরেটারীর কাজ চালাইতেছেন। মেজর মারেকে সেলাম করিয়া সাথে আনা পত্রখানা দিলাম। পত্র পড়িয়া তিনি রাগিয়া উঠিলেন। বলিলেন—এ পত্র আমাদের অফিসে আগেই এসেছে বটে, কিন্তু কোন ভারতীয়কে আমরা W. R. শিখাই না। দেরাইসমাইলখাঁর কর্তৃপক্ষের এ-উদ্দেশ্যে আমাকে পাঠানো খুবই অন্যায় হইয়াছে। তবে তারা সিফিলিস্ ও গণোরিয়ার চিকিৎসা শেখায়, ইচ্ছা হইলে আমি-ও তা শিখিতে পারি। এ-কথা বলিয়াই মেজর সাহেব আপন কাজে মন দিলেন। আমি-ও নাছোড় বান্দার মতো তার পেছনে লাগিয়া রহিলাম।

এ-ভাবে কাটিলো দিন দশেক। আমি সকালে প্রাতরাশ শেষ করিয়াই ল্যাবরেটারীতে যাই। মেজর সাহেব কি কি করেন একটা পর্য্যন্ত দেখি, হোটেলে আসিয়া লঞ্চ খাইয়া আবার দু-টার সময় যাই, মেজর সাহেব চলিয়া গেলে পাঁচটায় ফিরি। মেজর সাহেব নিজে কিছু বলেন না কিন্তু তার কাজ কর্ম্ম দেখিতে

নিষেধও করেন না। মৌনকেই সম্মতির লক্ষণ মনে করিয়া আমি মাঝে মাঝে তাকে দু-একটি কথা-ও জিজ্ঞাসা করিতাম। তিনি কখনও উত্তর দিতেন—কখন-ও দিতেন না। কয়েক দিন পর, তিনি আমায় হাতে-লেখা একখানা বই দিয়া বলিলেন —এতে-ই সব লেখা আছে, পড়লেই বুঝতে পারবে। আমি সে-বই পড়ি ও ল্যাবরেটারীতে গিয়া কাজ দেখি—এ-ভাবে অনেকটা জিনিষ আয়ত্ত হইলো। শেষে আমার ধৈর্য্য দেখিয়া তিনি আমার উপর প্রীত হইলেন এবং স্বেচ্ছায় ও সানন্দে অনেক জিনিষ শিখাইতে লাগিলেন। তিনি নিজে রোজ প্রায় দেড় শ W. R. করিতেন—আমাকে-ও তার পাশে বসিয়া আট দশটা করিতে দিতেন। ঠিকমতো করা হইতেছে কি না তা-ও মাঝে মাঝে পরখ করিয়া দেখিতেন। এ-ভাবে অতি-অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত প্রক্রিয়াটি আমি শিখিয়া ফেলিলাম।

হোটেলে আছি, ল্যাবরেটারীতে যাই, বিকালে বেড়াই, নাতিশীতোষ্ণ সুন্দর আবহাওয়া—কোনো ভাবনা চিন্তা নাই। একদিন বিকালে ঝির্ ঝির্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, ঠাণ্ডাও বেশ, হোটেলের ঘরে মনটা টিকিলো না—ওভার কোটটি গায়ে চাপাইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। দেউলীর বাজারের ভিতর দিয়া যাইতেছি, এমন সময় পাশেই একজন হকার চেঁচাইয়া উঠিলো—বোম্বে ক্রনিকেল চাই সাব, বোম্বে ক্রনিকেল। দু আনা দিয়া একখানা বোম্বে ক্রনিকেল কিনিয়া পকেটে পুরিয়া সামান্য একটু ঘুরিয়া হোটেলে ফিরিলাম। ডিনার-শেষে ইজী চেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়া কাগজখানা পড়িতেছি—দেখি,

অহিংসা অসহযোগ সম্বন্ধে গান্ধীজীর বক্তৃতা। বক্তৃতাটি বিশেষ মনোযোগের সাথে পড়িলাম। কি তাতে লেখা ছিলো মনে নাই। কিন্তু তাহা পড়িয়া আমার মন চঞ্চল হইয়া উঠিলো—ভাবিলাম কি করিতেছি। মনে হইলো ইহাই অপূর্ব্ব সুযোগ। এই সুযোগে কর্ম্ম ক্ষেত্রে গা ভাসাইয়া দিতে হইবে। চাকরি, ল্যাবরেটারী, W. R. এর মোহ এক নিমেষে কোথায় উড়িয়া গেলো। প্রবল ইচ্ছা হইলো তখনই সব ছাড়িয়া ছুড়িয়া দেশ-সেবা-যজ্ঞে নিজেকে পূর্ণাহুতি দিই। নিজের এই প্রবল ভাব অন্তর-মাঝে চাপিয়া রাখা অসম্ভব দেখিয়া ভৃত্য যামিনীকে সব খুলিয়া বলিলাম। তখন সে খাওয়া পরা ছাড়া মাসে ত্রিশ টাকা মাইনে পাইতো। তাকে বলিলাম—এরপর আর এতো টাকা দেওয়া সম্ভব হইবে না। সামান্য যা-কিছু দেওয়া সম্ভব হইবে তাতেই সন্তুষ্ট হইয়া সে আমার সাথে থাকিবে কি না। সে বলিলো—আপনি যা বলবেন, তাতেই আমি প্রস্তুত। আপনি যেখানে যেতে হুকুম করবেন, সেখানেই বোচকাটি কাঁধে করে পিছনে পিছনে ছুটবো। তার এ-কথা সে আজ পর্য্যন্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছে। সব সময় তাকে রাখা সম্ভব হয় নাই কিন্তু যখনই ডাকিয়াছি, তখনই সে আসিয়া সমস্ত শক্তি দিয়া আমার জন্য খাটিয়াছে। কত গালি গলাজ করিয়াছি, তার জন্য ভ্রুক্ষেপও করে নাই। দিনের শেষে ডাকিয়া একটি মিষ্টি কথা বলিলেই সমস্ত ল্যাঠা চুকিয়া গিয়াছে—মুখে হাসিরেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

দেউলী একটি মিলিটারী ষ্টেশন। পরদিন ষ্টাফ্ অফিসে গিয়া

ষ্টাফ্-ক্যাপ্টেন্‌কে বলিলাম—আমি কলিকাতা হয়ে দেরাইসমাইল-খাঁ যেতে চাই, পাস মিলবে কি না। তিনি সম্মতি জানাইলেন। নিয়ম অনুসারে আমি দেউলী হইতে সিধা দেরাইসমাইলখাঁ যাওয়ার পাশ পাইতে পারি—কলিকাতা হইয়া নহে। কিন্তু সৈনিক বিভাগে আঢালা টাকা। আর একজন ইংরেজ কর্ম্মচারীর পক্ষে নিয়মের ব্যতিক্রমে বিশেষ কিছু আসে যায় না। নিয়মের যতো বালাই ভারতীয়দের বেলায়। পাশের বন্দোবস্ত করিয়াই আমি ল্যাবরেটারীতে গিয়া মেজর সাহেবকে বলিলাম—আমার শেখা শেষ হয়েছে; আমি এখন পরীক্ষা দিয়ে কর্ম্মস্থলে যেতে চাই। মেজর সাহেব রাজী হইলেন। কর্ণেল ফ্রষ্ট তখন সেখানেই ছিলেন। তিনি পরীক্ষক হইলেন। অতি সহজেই পাশ করিলাম। সে-দিন রাতেই কলিকাতা রওনা হইলাম।

তখনও আমাদের কলিকাতার আড্ডা নয় নম্বর বাদুড়-বাগানে। সেখানে পৌঁছিয়া সকল ভাইদের ডাকিয়া বলিলাম—এই অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে আমাদের যোগ দেওয়া উচিত। আমি আরো বলিলাম—আর কেউ যোগ দিক আর নাই দিক, আমি দেবো। এবং দেরাইসমাইলখাঁ পৌঁছিয়াই চাকরিতে ইস্তাফা দিবো। আন্দোলনে যোগ দেওয়া না দেওয়া সম্বন্ধে অনেক আলোচনা চলিলো কিন্তু আমার চাক্‌রি ছাড়া সম্বন্ধে সকলেই একমত হইলো।

১৯২০—অক্টোবর। দেরাইসমাইলখাঁ পৌঁছিয়াই চাকরি পরিত্যাগের পত্রসহ কমাণ্ডিং অফিসারের কাছে হাজির হইলাম।

হইলাম। ভারতীয় বন্ধুদের অনেকেই এই পদত্যাগের জন্য আমায় মূর্খ বলিয়া নিন্দা করিলো। দু-একজনের প্রশংসাও লাভ হইলো। লাহোর ও অমৃতসর হইয়া ২৭শে সকালে কলিকাতা পৌঁছিলাম।

সপ্তম অধ্যায়

আশ্রম—প্রতিষ্ঠা

বড় শুভক্ষণেই অসহযোগ আন্দোলন আসিলো, বড় শুভক্ষণেই এ-আন্দোলনে যোগদানের মতি আমাদের হইলো—নইলে আশ্রম-প্রতিষ্ঠা কখনো হইতো কি না সন্দেহ।

ভাইদের তখনকার অবস্থা

আমি ও প্রফুল্ল তো ইতিপূর্ব্বে চাকরি করিতেছিলাম। নিপেন সেবারই শেষ এম, বি পাশ করে। আশ্রম প্রতিষ্ঠা তখন না হইলে কটক কি আর কোথাও হয়তো প্র্যাকটিস্ আরম্ভ করিতো। একবার প্র্যাক্‌টিস্ আরম্ভ করিলে তা ছাড়িয়া পরে আশ্রমে যোগ দেওয়া সম্ভব হইতো কি না কে বলিতে পারে? হরিপদ ও অন্নদা সে-বারই রসায়ণ শাস্ত্রে এম, এস, সি পাশ করে। হরিপদ হয় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম, অন্নদা দ্বিতীয়। হরিপদ রিসার্চ স্কলারসিপের চেষ্টায় ছিলো—পাইতোও। অন্নদার বেঙ্গল মিসেলেনীতে কাজ ঠিক হইয়াছিলো, যোগ দিবে এরূপ অবস্থা। নরেন ও অরুণ এর পূর্ব্বেই এম, এ ও এম, এস, সি পাশ করিয়াছিলো। নরেন যোধপুরে শিক্ষকের কাজে নিযুক্ত ছিলো—অরুণ কি করিতেছিলো মনে নাই। ধীরেশ অর্থনীতি শাস্ত্রে এম, এ পাশ করিয়া কলিকাতার কাছে এক স্কুলে মাষ্টারী

করিতেছিলো। এ-ছাড়া আরো অনেকে কৃতিত্বের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা পাশ করিয়া নানাস্থানে চাকুরি করিতেছিলো। আশ্রমের কাজে সাক্ষাৎভাবে তারা যোগ দেয় নাই—তাই তাদের উল্লেখ এখানে করা হইলো না।

আমি, প্রফুল্ল, হরিপদ, অন্নদা, নিপেন, নরেন, অরুণ ও ধীরেশ ছাড়া যে সব ছেলে প্রথম আশ্রমে যোগ দেয় তাদের সকলের নাম আমার মনে নাই। যাদের নাম মনে আছে তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নীচে দেওয়া হইলো:—(১) দেবেন সেন—প্রেসিডেন্সী কলেজে অর্থনীতিতে এম, এ পড়িতো; (২) তারিণী দত্ত—প্রেসিডেন্সী কলেজে গণিতে এম, এস, সি পড়িতো; (৩) সুশীল পালিত—স্কটিশ চার্চ্চ কলেজে অর্থনীতিতে এম,এ পড়িতো; (৪) মৃণীন্দ্র ভট্টাচার্য্য—ঢাকা কলেজে ফিজিক্সে এম, এ পড়িতো; (৫) মাখন লাহিড়ী—প্রেসিডেন্সী কলেজে ইতিহাসে এম, এ পড়িতো; (৬) শৈলেন মল্লিক প্রেসিডেন্সী কলেজের ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র ছিলো। এ ছাড়া কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র মিহির চাটার্জ্জি, প্রফুল্লের দু ভাই ফটিক ও প্রমথ, সুশীলের দুই ভাই জগদীশ ও পাঁচু, [illegible] ছোট ভাই শশীভূষণ (পুঁটু), মৃণীন্দ্রের ছোট ভাই ক্ষিতীন, হরিপদের ছোট ভাই শিবু, দেবেনের ছোট ভাই ধীরু, তরঙ্গ দাশগুপ্ত, উপেন সেন (টুলু) প্রভৃতিও এ-সময় যোগ দেয়। তখন কলিকাতা ও কলিকাতার বাহিরে প্রায় সব কলেজেই আমাদের ছোট বড় অর্গেনিজেসন ছিলো। তাই এতো ছেলের এক সময় যোগ দান সম্ভব হইয়াছিলো। আরো অনেক

ছেলে ছিলো যারা যোগ দেয় নাই। এ সব ছেলেদের মারফতে কলেজ ও স্কুলের ছাত্রদের সাথে আমাদের সম্পর্ক খানিক বজায় ছিলো বলিয়াই ১৯২১-এ বিভিন্ন কলেজে তলে তলে আমাদের প্রচার কার্য্য চালানো সম্ভব হইয়াছিলো। এ-সব ছেলেদের প্রচার কার্য্য সেবারকার ছেলেদের স্কুল-কলেজ বর্জ্জনের অন্যতম প্রধান কারণ।

আমার কলিকাতা পৌঁছার পরই ঠিক্ হইলো যে আমি, নিপেন, অন্নদা, হরিপদ, দেবেন, যোগেন প্রভৃতি মিলিয়া প্রথম ফরিদপুরে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিব। আমার চাকরির সঞ্চিত ছয় হাজার টাকার মধ্যে এক হাজার টাকা খরচ হইলো এক বন্ধুর সাহায্যে। বাকি পাঁচ হাজার টাকায় জমি কেনা এবং যতোটা সম্ভব বাড়ী ঘর তৈরী শেষ করিতে হইবে। প্রফুল্ল মাসে দুইশ টাকা করিয়া দিবে। নিপেন ফরিদপুর সহরে প্র্যাক্‌টিস্ করিবে। তার আয়ের টাকা এবং প্রফুল্লের দুইশো টাকা দিয়া আশ্রমের যাবতীয় খরচ চালাইতে হইবে। কয়েকটি ছোট ছেলে লইয়া একটি রেসিডেন্‌সিয়াল স্কুল স্থাপন করিতে হইবে এবং ইহাই হইবে আশ্রমের প্রধান কাজ। এ-ছাড়া রাজনৈতিক কাজ ও কিছু কিছু করিতে হইবে। কিন্তু সে-টা তখনও দেশে প্রবল হইয়া ওঠে নাই এবং আমাদের মাথায়ও ভাল ভাবে ঢোকে নাই।

জায়গার খোঁজে আমি, যোগেন ও নিপেন ফরিদপুর গেলাম। রাজবাড়ী রোড্ ও যশোহর রোডের সংযোগস্থলের কাছে পনর বিঘা জমি কিনাও প্রায় ঠিক হইলো। প্রফুল্লও সেই জমি দেখিতে ফরিদপুর গেলো। জমি তারও পছন্দ হইলো।

এরপর প্রফুল্ল কলিকাতায় ফিরে। ওদিকে খুব ধুম ধামের সাথে নাগপুর কংগ্রেস শেষ হইলো। সেই কংগ্রেসে আমাদের কেউ যায় নাই। কেন—বলা শক্ত। আমার মনে হয় কংগ্রেসে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা তখনও আমরা উপলব্ধি করি নাই। নাগপুর কংগ্রেসের পর দেশবন্ধু দাশ ব্যারিষ্টারী ছাড়িয়া সর্ব্বান্তঃ-করণে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। ফলে কলিকাতার ছাত্রদের মধ্যে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। অনেক কলেজ প্রায় খালি হইলো। দেশবন্ধু দাশের তার পাইয়া মহাত্মাজী কলিকাতা আসিলেন। প্রফুল্ল মহাত্মাজীর সাথে দেখা করে। মহাত্মাজীর কথা শুনিয়া প্রফুল্লের মন চঞ্চল হইয়া উঠে। এদিকে আন্দোলনও দ্রুত আগাইতে থাকে। প্রফুল্লের আর চুপ করিয়া থাকা সম্ভব হয় না। সে আমায় লিখিলো—Events are advancing too fast. It is impossible to continue any more in the service. পরামর্শের জন্য সে আমায় কলিকাতা যাইতে লিখিলো।

এদিকে আমিও ফরিদপুরের স্থানীয় কর্ম্মী নিবারণ পাল প্রভৃতির সাথে মিলিয়া সেখানকার আন্দোলনে মাতিয়া উঠিলাম। ফরিদপুর সহরে একটি মিটিং ডাকা হইলো—প্রধান বক্তা আমি। প্রকাশ্য রাজনৈতিক সভায় এ-ই বোধ হয় আমার প্রথম বক্তৃতা। সে সভায় কি বলিয়াছিলাম ঠিক মনে নাই। তবে মাসুদদের সংগ্রামের ইতিহাসই ছিলো আমার বক্তৃতার প্রধান বিষয়। আমি সবে মাত্র মাসুদদের দেশ হইতে ফিরিয়াছি। মুষ্টিমেয় মাসুদদের বিশাল বৃটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে

বারম্বার সংগ্রামের বীরত্ব কাহিনী তখনো আমার মনে অতি উজ্জলভাবে ভাসিতেছিলো। মাস্থদ বীরদের নামও মনে ছিলো। সে-সব নাম এখন ভুলিয়া গিয়াছি। মাস্থদদের প্রধান নেতা মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে তার পুত্রের কাছ থেকে যে প্রতিজ্ঞা আদায় করিয়াছিলেন তা আমার এখনও মনে আছে। তিনি বলিয়াছিলেন—পুত্র, আমি সারাজীবন ইংরেজের সাথে যুদ্ধ করেছি। কোন প্রলোভনে কখনো ভুলি নাই। আশা করি জীবনের শেষ অবধি তুমিও স্বাধীনতার সেই সংগ্রাম চালাবে—কখনো কোন কারণে বিচলিত কিংবা পথচ্যুত হবে না। মাস্থদেরা সংখ্যায় অতি কম। ঠিক্ সংখ্যা জানি না—শুনিয়াছি পুরুষ ও মেয়ে মিলিয়া হাজার কুড়ি হইবে। সংগ্রাম ছাড়িয়া ইংরেজের তাঁবে আসিলে, ইংরেজ এদের খোরপোষের সমস্ত ভার নিতে রাজী—এ-কথা-ও আমি যুদ্ধক্ষেত্রে শুনিয়াছি। কিন্তু মাস্থদেরা কোন প্রলোভনেই ভুলে না। স্ত্রী পুত্র সহ বাড়ী ঘর ছাড়ে, কত অত্যাচার সয়, তবু সংগ্রাম ছাড়ে না—স্বাধীনতাকে তারা এতোই ভালোবাসে। এরোপ্লেনের দরুণ তাদের দুর্গতি আরো বাড়িয়াছে। ইংরেজ আকাশ হইতে বোমা ফেলিয়া তাদের বাড়ী ঘর, ধানের ক্ষেত ও গোলা পোড়াইয়া দেয়—তবু-ও তারা অচল অটল। সভায় এ-সব কথা বলিতে বলিতে আমারতরুণ প্রাণ আবেগস্রোতে এতো উছলিয়া উঠিলো যে কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসায় সব কথা বলা সম্ভব হইলো না। বসিয়া পড়িলাম। মুখ দিয়া কথা বাহির হইলো না বটে, কিন্তু শ্রোতারা আমার প্রাণের ভাব বুঝিলো।

কলিকাতার কলেজ বর্জ্জনের আন্দোলন-তরঙ্গ ফরিদপুরেও পৌঁছিলো। আমার ও নিবারণ পালের পাল্লায় পড়িয়া ফরিদপুর কলেজের পঁয়ত্রিশটি ছেলেও কলেজ ছাড়ে। কলেজে ফেরার পথ যেন সুগম না থাকে, সেজন্য তাদের কলেজ বর্জ্জনের সঙ্কল্পের কথা তাদের দ্বারা লেখাইয়া কলেজের প্রিন্সিপ্যালের কাছে পাঠানো হইলো। এ-সব কলেজ-ছাড়া ছেলেদের থাকার জায়গা ও কাজের বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারিলে হয়তো অনেককেই স্থায়ী কর্ম্মীতে পরিণত করা যাইতো। কিন্তু অর্থাভাবে তা করা সম্ভব হইলো না। ফলে ইহারা নানা দিকে ছড়াইয়া পড়িলো। অনেকে আবার বিষণ্ণ হৃদয়ে কলেজে ঢুকিলো। একথা সত্য শুধু ফরিদপুরের মুষ্টিমেয় ছেলের পক্ষেই নয়—অন্যান্য জায়গার ছেলেদের বেলায়ও।

এরপর গেলাম কলিকাতা। আমাদের সাথে শেষ পরামর্শ করিয়া প্রফুল্ল ডেপুটি ম্যাসে মাষ্টারের লোভনীয় পদ পরিত্যাগ করিলো। আন্দোলনের দ্রুত প্রসার হেতু ফরিদপুরে আশ্রম প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হইলো। ঠিক হইলো এখন বাড়ীঘর না করিয়া একটি ভাড়াটে বাড়ীতে কাজ আরম্ভ করা হইবে। স্কুল প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প-ও বাদ পড়িলো। মহাত্মাজী তখন কলিকাতায়। ঠিক হইলো মহাত্মাজীর সাথে পরামর্শ করিয়া আমাদের বর্ত্তমান কর্ত্তব্য ঠিক করা যাইবে। মহাত্মাজীর সাথে সাক্ষাতের সময়-ও ঠিক হইলো। মহাত্মাজীর সাথে সাক্ষাতের আগে আমরা সকলে মিলিয়া আশ্রমের আদর্শ ও নিয়ম সম্বন্ধে মোটামুটি একটা খসড়া তৈরী করিলাম।

সবিতা আশ্রম

রিখিয়া হইতে দেওঘর ফিরার পথে আশ্রম প্রতিষ্ঠার ভাব যে প্রথম মনে জাগে এ-কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। রিখিয়া মঠের নামে আমরা প্রথম খুব মাতিলেও, পরে ইহা আস্তে আস্তে আমাদের অন্তর হইতে লোপ পায়। ঠিক হয় বাংলার ভিতরেই কোন সুবিধাজনক স্থানে আশ্রম স্থাপন করিতে হইবে। ২/১১ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের বাড়ীতে থাকা কালে আমরা হাতে লিখিয়া একখানা মাসিক পত্রিকা বাহির করিতাম। এই পত্রিকার নাম ছিলো "সবিতা"। গায়ত্রী হইতেই সবিতা শব্দটি নেওয়া। ৩নং-এর শেষ অবস্থায় গায়ত্রী আমাদের খুবই প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলো। গায়ত্রীর দীর্ঘ দিন ব্যাপী ব্যাখ্যা-ও তিন নং-এ চলিয়াছে। তাই আশ্রমের নাম সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হওয়ামাত্রই, অনেকের নজর পড়িলো সবিতার দিকে। সামান্য তর্ক বিতর্কের পর আমাদের আশ্রমের নাম সবিতা রাখা ঠিক হইলো।

নামতো ঠিক হইলো। গোলমাল বাঁধিলো কার্য্যক্রম লইয়া। স্থায়ী দেশসেবক তৈরীই যে আশ্রমের প্রধান উদ্দেশ্য তাহা প্রথম হইতেই ঠিক ছিলো এবং তা লইয়া কোনো গোলও বাঁধিলো না। টেররিজমের আমরা চিরদিনই বিরোধী। কারণ সে পথে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের সম্ভাবিতায় আমাদের কখনও আস্থা ছিলো না। সেবার মাঝে জনগণকে স্বাধীনতার সংগ্রামের জন্য তৈরী করিতে হইবে—বিবেকানন্দের বই

পড়িয়া এ-শিক্ষাই আমরা বিশেষ ভাবে লাভ করিয়াছিলাম এবং তাঁর এ-ভাবটিই আমাদের অনুপ্রাণিত করিতো সবচেয়ে অধিক। কিন্তু জনগণের হৃদয়-দ্বার তখনো আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ। তাই আমরা ভাবিতাম দেশের বিভিন্ন অংশে জাতীয় ধরণের স্কুল-কলেজের প্রতিষ্ঠাই বোধ-হয় তাদের হৃদয়ে পৌছার প্রকৃষ্ট পথ। সে-জন্য একটি কেন্দ্রীয় আশ্রম স্থাপনের পর, সেখান হইতে ত্যাগ ও সেবামন্ত্রে দীক্ষিত কর্ম্মীদের শিক্ষকরূপে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসানো ছিলো তখন আমাদের সম্মুখে একমাত্র কর্ম্ম পন্থা। স্বাধীনতা লাভ আমাদের আদর্শ ছিলো বটে, কিন্তু তার সাথে এই কর্ম্ম পন্থার সম্পর্ক যে অস্পষ্ট ও গৌণ, সে-সম্বন্ধে-ও আমাদের কোন সন্দেহ ছিলো না। কিন্তু নাই মামার চেয়ে কাণামামা ভালো—গালে হাত দিয়া বসিয়া থাকার চেয়ে কর্ম্মসাগরে ঝাঁপাইয়া পড়া সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ, ঝাঁপাইয়া পড়িলে কূল একদিন মিলিবেই—প্রথম হইতেই কেহ আর ঘোড়ায় চড়িতে পারে না, ঘোড়ায় চড়িতে চড়িতেই ঘোড়া-চড়া আসে, এ-আসার পথে দু-একবার হয়তো ঠ্যাংও ভাঙ্গিতে পারে—এ-সব ভাবিয়া এই অস্পষ্ট কর্ম্ম-পদ্ধতিকেই আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে বরণ করিয়া লইয়াছিলাম। এবং এ-পথে চলার মূল্য স্বরূপ আমাদের অদেয় ছিলো না কিছুই। কিন্তু মহাত্মাজীর গণ-আন্দোলনের কথা আমাদের কাছে এক নূতন পথ খুলিয়া ধরিলো—যাহা এতো কাল অস্পষ্ট ছিলো, তাহা এক মুহূর্ত্তে স্পষ্ট হইলো—যে গণ-হৃদয় এতোকাল আমাদের নাগালের বাহিরে ছিলো, তাহা যেন এক যাদুমন্ত্রে

মুঠোর মধ্যে আসিয়া পড়িলো। মহাত্মাজীর আন্দোলনের অন্তর্নিহিত ভাব এবং আমাদের এতোদিনের সাধনার মাঝে গণ-সেবা সম্বন্ধে পূর্ণ সামঞ্জস্য ছিলো বলিয়াই মহাত্মাজীর আন্দোলনকে আমাদের অনেকের পক্ষে এতো সহজে সর্ব্বান্তঃকরণে বরিয়া লওয়া সম্ভব হইয়াছিলো।

বিবেকানন্দের দ্বারা আমরা অনুপ্রাণিত হইলেও, রামকৃষ্ণ মিশনের সাথে রাজনীতির কোন সম্পর্ক না থাকায়, সে মিশনে যোগদান আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। গবর্ণমেণ্টের সাথে সংশ্লিষ্ট বলিয়া পুনা ফারগুসন কলেজও যে আমাদের অন্তর-প্রাণকে বেশী আলোড়িত করিতে পারে নাই, সে-কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ১৯১৪-এর আগে শান্তিনিকেতনেও আমরা কয়েক বার গিয়াছি কিন্তু সেখানকার আবহাওয়ার সাথে আমাদের মনের খাপ খাওয়ানো কিছুতেই সম্ভব হয় নাই। যাগযজ্ঞ প্রভৃতি বিদ্‌ঘুটে ব্যাপার আমাদের প্রাণকে খানিক ক্লিষ্ট করিলেও, হরিদ্বারের গুরুকুলই ছিলো তখন আমাদের অনেকটা আদর্শ স্থানীয়। মহাত্মাজীর সাথে মনের অনেকখানি মিল হওয়ায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত সবরমতি আশ্রমই এখন আমাদের আকৃষ্ট করিলো সবচেয়ে অধিক। যোগেনের কাছে সে আশ্রমের মুদ্রিত নিয়মাবলীও ছিলো। সেই নিয়মাবলীর অনুকরণে আমরাও আমাদের আশ্রমের নিয়মাবলী তৈরী করিলাম। ঠিক হইলো আশ্রমের উদ্দেশ্য হইবে—Self-realisation through the service of the motherland. Self এর মানে পরে অনেক জায়গায় ভগবান করা হইয়াছিলো

বটে, কিন্তু তখন আমাদের কাছে তার মানে ছিলো উপনিষদের আত্মা—যে আত্মা অনির্ব্বচনীয়, যার কোন বর্ণনাই সম্ভব নয়, অবিরাম সংগ্রাম দ্বারা যাহার অনুভূতির পথে অগ্রসর হইতে হয় কিন্তু সেই সংগ্রামে জয়ের চেয়ে পরাজয়ের সম্ভাবনাই অধিক। বিবেকানন্দের ভাষায় বলিতে গেলে—সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয়, তাহা না ডরাক্ তোমা। এই আত্মার কথাই তখন আমাদের মনে ছিলো। আমরা ধ্যান ধারণা, শাস্ত্র পাঠ ও প্রার্থনার বিরোধী ছিলাম না। কিন্তু যা আশ্রমের সকলের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য ছিলো তাহা হইতেছে স্বদেশ সেবা—Service of the motherland. এই স্বদেশ সেবাই ছিলো আমাদের সাধনার প্রধান অঙ্গ এবং এই সেবার মানেও আমাদের কাছে ছিলো অতি স্পষ্ট। এই সেবা দ্বারা আমরা দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য সংগ্রামই বুঝিতাম। কারণ আমরা মনে করিতাম দেশ স্বাধীন না হইলে দেশের দুর্দ্দশা কখনো দূর হইবে না। সুতরাং স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামই সর্ব্বপ্রধান দেশ সেবা।

এই ক্রীড্ কিংবা আদর্শ সবরমতী আশ্রমের নিয়মাবলী হইতে গৃহীত নহে। অতীতে আমরা যে পথে চলিতেছিলাম ইহা তাহারই বিকশিত পরিণতি মাত্র। কিন্তু নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞাগুলির প্রায় সবই সবরমতী আশ্রম হইতে নেওয়া।

আশ্রমের প্রতিজ্ঞাবলী

১। অভয় প্রতিজ্ঞা—Vow of fearlessness. সত্যছাড়া আর কিছু ভয় না করা।

(২) সত্য প্রতিজ্ঞা—Vow of truth।

(৩) সত্য সংশুদ্ধি প্রতিজ্ঞা—Vow of purity।

(৪) অস্তেয় প্রতিজ্ঞা—Vow of nonstealing।

নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনো জিনিষ ব্যবহার না করা।

(৫) বীর্য্য প্রতিজ্ঞা—Vow of activity।

(৬) প্রেম প্রতিজ্ঞা—Vow of love।

(৭) স্বদেশী প্রতিজ্ঞা—Vow of Swadeshi।

এরপর সে-দিন কার্য্যক্রম সম্বন্ধেও একটি খসড়া তৈরী হইলো। কার্য্যক্রমের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, চিকিৎসা, চরকা, তাঁত প্রভৃতিরও উল্লেখ ছিলো।

মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ

পরদিন সকাল ছয়টায় মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাতের সময় নির্দ্দিষ্ট ছিলো। মহাত্মাজী থাকিতেন দেশবন্ধুর বাড়ীতে রসা রোডে। আমরা থাকিতাম নয় নম্বর বাদুড় বাগান লেনে। আমরা অতি সকালে সকলে মিলিয়া হাঁটিয়া সেখানে গেলাম। সাথে বাহিরের-ও দু চারজন ছিলেন। দেশবন্ধুর বাড়ীর দোতলার উত্তর দিকের প্রকাণ্ড হলে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইলো। হলটি লোকে ভরিয়া গেলো। মহাত্মাজীর সাথে কথা বলার ভার আমার উপরই পড়িলো। সবিতা নাম শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া তিনি বলিলেন—Your aim is to make the Ashram what is sun to the world. I am too humble

to have such an ambitious project. এসম্বন্ধে সামান্য আলোচনার পর আমিই তাকে একটি নাম ঠিক করিয়া দিতে বলিলাম। তিনি একটু ভাবিয়া বলিলেন—তোমাদের প্রথম প্রতিজ্ঞা অনুসারে তোমাদের আশ্রমের নাম রাখ না কেন? সকল ধর্ম্মের মূলেই নির্ভীকতা। ভীতিগ্রস্থ এই জাতির পক্ষে বর্ত্তমানে নির্ভীকতারই সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন। আমরা এই প্রস্তাব সানন্দে মানিয়া লইলাম। ফলে সবিতা আশ্রম-এর বদলে অভয় আশ্রমই আমাদের আশ্রমের নাম রাখা ঠিক হইলো।

এরপর উঠিলো আদর্শের কথা। আমাদের নির্দ্দেশিত আদর্শ—Self realisation through the survice of the motherland-ই তিনি মানিয়া লইলেন। কিন্তু সাথে যোগ করিলেন—Where by service of the motherland is meant service of god and truth and absence of injury to other lands. আমাদের প্রথম মুদ্রিত পুস্তিকাতে মহাত্মাজী কর্ত্তৃক যোগ করে দেওয়া আদর্শের এই অংশটুকু ছিলো। কিন্তু পরে মুদ্রিত আশ্রমের বার্ষিক বিবরণ সমূহে এই অংশটুকু আর রাখা হয় নাই। তাই আমাদের নির্দ্দেশিত প্রথম অংশটুকুই আশ্রমের স্থায়ী আদর্শরূপে পরিণত হইয়াছে। এর মানে ইহা নহে যে এ অংশটুকুতে নিহিত ভাব আমরা মানি না। আশ্রমের প্রতিজ্ঞা সমূহের অন্তর্নিহিত ভাব হইতে এই অংশটুকুর ভাব আপনা আপনিই আসে। তাই ইহা রাখার প্রয়োজন পরে আর অনুভূত হয় নাই।

প্রতিজ্ঞা সমূহের মধ্যে প্রেম প্রতিজ্ঞা লইয়াই বিশেষ আলোচনা হইলো। তিনি এই প্রতিজ্ঞা পড়িয়াই হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন—I see you have intentionally omitted non-violence. আমি এ-সম্বন্ধে মহাত্মাজীকে দুটি কথা বলিলাম। প্রথম—অহিংসা প্রতিজ্ঞা আমরা পূরাপূরি গ্রহণ করিতে পারি না। আমরা বাঙ্গালী। মাছই আমাদের প্রধান খাদ্য। বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে মাছ না খাইয়াও চলে, কারণ বিহারীদের প্রধান খাদ্য আটা প্রোটীডে ভরা। শুধু একমাত্র আটা থেকেই তাহারা রোজ প্রায় দু হাজার ইউনিট্ ক্যালরী (উত্তাপ) পায়। কিন্তু আমাদের প্রধান খাদ্য ভাতে প্রোটীড্ নাই বলিলেও চলে। মাছ সমেতও বাঙ্গালীর প্রতিদিনের খাদ্যে দু হাজার ক্যালরী (উত্তাপ) হয় না। তাই বাঙ্গালী এতো দুর্ব্বল, অধিক শারীরিক শ্রমে অসমর্থ। মাছ ছাড়িলে বাঙ্গালীর খাদ্যে প্রোটীডের অংশ আরো কমিবে। ফলে বাঙ্গালী আরো দুর্ব্বল, নিস্তেজ ও জীবন সংগ্রামে অসমর্থ হইবে। নদী বহুল বাংলা মাছে ভরা। মাছই বাঙ্গালীর ঈশ্বর অভিপ্রেত স্বাভাবিক খাদ্য। মাছের মগজে ফসফরাস খুব বেশী। তাই বাঙ্গালী এতো বুদ্ধিমান। মাছ না খাইলে বাঙ্গালীর শরীরের শক্তির সাথে সাথে মনের শক্তিও কমিবে। ফলে বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশ ঘটিবে। আমার একথা শুনিয়া মহাত্মাজী আর বিশেষ কোনো আপত্তি করিলেন না। বলিলেন—তবে তোমরা মাছ খেয়ো। তাই আশ্রমে বরাবরই মাছ মাংস খাওয়া চলিয়া আসিতেছে। অহিংসা সম্বন্ধে মহাত্মাজীকে আরো বলিলাম—অহিংসার চেয়ে

প্রেমকেই আমি বড় মনে করি। বাংলার প্রাণ চৈতন্যদেব প্রেমের প্রাধান্যই প্রচার করেছেন। গীতায়ও আছে—

যস্য নাহঙ্কৃত ভাবর্বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমান্ লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥

ভিতরে প্রেম থাক্‌লে বাইরের হিংসাও অহিংসায় পরিণত হয়। ভিতরে প্রেমের অভাবে বাইরের অহিংসা হিংসা হয়ে দাঁড়ায়। মা ছেলেকে ভালবাসে ব'লে, মার তাড়না ও ভর্ৎসনা হিংসা নয়, প্রেমেরই রূপান্তর মাত্র। কৃষ্ণের প্রাণ প্রেমে পূর্ণ ছিলো। তাই তিনি হাসতে হাসতে শিশুপাল প্রভৃতিকে মারতে পেরেছেন। সুতরাং এই প্রেমকে আমি অহিংসার চেয়ে বড় মনে করি। তিনি আমার এ-কথা নীতি হিসাবে মানিলেও কার্য্যতঃ মানিলেন না। তবে ইহা লইয়া আর বিশেষ আলোচনা হইলো না—আলোচনার প্রয়োজনও ছিলো না। ১৯২১-এর জানুয়ারীতে এই আলাপ হয়। আজ ১৯৩৩-এর ২৪শে অক্টোবর। প্রায় তের বৎসর হইয়া গেলো। অনেক আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক ইহা লইয়া এ-সময়ের ভিতর হইয়াছে। এ-সম্বন্ধে আমিও অনেক ভাবিয়াছি। এখনো আমার মত— হিন্দুধর্ম্ম অতি উদার ও মহৎ; এর কোন ক্রীড্ (Creed) কিংবা নির্দ্দিষ্ট গতি-পথ নাই; ক্রমবিকাশ ও সৃষ্টিই এর অন্তরের কথা। ইহাকে কোন গণ্ডীর মধ্যে টানিয়া আনার চেষ্টা বৃথা। আজ রাজনৈতিক কারণে এ-ধর্ম্ম অনেক খানি মলিন ও নিষ্প্রভ হইয়াছে বটে, কিন্তু ভারত স্বাধীন হইলে এর সার্বভৌমত্ব একে বিশ্বধর্ম্মে পরিণত করিবে। হিন্দুধর্ম্ম বিশ্বমুখী, তাই

হিন্দুর পক্ষে কোরাণ, বাইবেল, কিংবা অন্য কোন ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িতে বা বুঝিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদের হিন্দুধর্ম্মের গ্রন্থ-সমূহ পড়া ও বোঝা ততো সহজ নয়।

কাজ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া মহাত্মাজী আমাদের চরকা কাটিতে এবং দেশবন্ধুর আদেশের প্রতীক্ষায় থাকিতে উপদেশ দিলেন।

ঢাকায় প্রথম আশ্রম

বর্ত্তমানে স্থায়ী আশ্রম করা হইবে না, ঠিক হওয়ার পর হইতেই অস্থায়ী আশ্রমের জন্য ফরিদপুর ও ঢাকা বাড়ী খোঁজা আরম্ভ হইলো। ফরিদপুরে ভাড়াটে বাড়ীর সংখ্যা অতি কম। তাই সেখানকার চেয়ে ঢাকাই সকলের অধিক পছন্দ হইলো। দু-একদিনের চেষ্টায় ঢাকার ১০নং মালীটোলার বাড়ীটি পাওয়া-ও গেলো। ইহার পর আমরা ক্রমশঃ ঢাকার এই ভাড়াটে বাড়ীতে গিয়া জুটিতে লাগিলাম। সেখানে আমাদের জীবনধারা নিম্নরূপ ছিলো। সকলকেই নির্দ্দিষ্ট সময়ে উঠিতে ও শুইতে হইতো। সকালে প্রতিদিন প্রার্থনা হইতো। এ-প্রার্থনায় যোগদান সকলের পক্ষেই বাধ্যতামূলক ছিলো। এ-বিষয়ে কোনরূপ বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথাই উঠিতে পারিতো না। ইহাকে আশ্রম জীবনে প্যারেডের সমান মনে করা হইতো। সকালে কি বিকালে, যখনই হোক্, প্রত্যেককে দিনে এক ঘণ্টা করিয়া চরকা কাটিতে হইতো। ইহা ঢাকায় তখন ছিলো একটি অভিনব ব্যাপার। এই চরকা কাটা দেখিতে আশ্রমে তখন—

শুধু শিক্ষিত নয়—সাধারণ জনগণও অনেক আসিতো। ইহা তাহারা বিশেষ মনোযোগের সাথে দেখিতো এবং এ-সম্বন্ধে অনেক প্রশ্নও তাহারা করিতো। এই চরকা কাটার ভিতর দিয়াই জনগণের মাঝে আন্দোলনের ভাব অনেকটা ছড়াইয়া পড়ে। বিনা কাজে বসিয়া গল্প গুজবে সময় কাটানো আশ্রমের নীতি বিরুদ্ধ ছিলো। তাই যখন অন্য কাজ থাকিতো না, সকলকেই পড়িতে হইতো। বিকালে সকলে মিলিয়া রমণার মাঠে বেড়াইতে যাইতাম। চাকর বাকরের কোন বালাই ছিলো না। পাক করা, বাসন ধোয়া, কাপড় কাচা, ঘরদোর ঝাঁট দেওয়া, হাট বাজারে যাওয়া প্রভৃতি কাজ নিজেদেরই করিতে হইতো। পাক করার পালা ছোট বড় সকলেরই পড়িতো।

ঢাকায় যাওয়ার কিছুদিন পরেই সীতেশ বোস, পরিমল দত্ত, শিশির চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি কয়েকটি ছেলে কলেজ ছাড়িয়া আমাদের সাথে যোগ দেয়। এরা আমাদের সাথে দশ নম্বরে থাকিতো না। কিন্তু আমাদেরই তত্ত্বাবধানে, আমাদেরই নিয়ম মানিয়া কায়েতটুলীর আর একটি বাড়ীতে থাকিতো। আমাদের ঢাকা যাওয়ার কিছুদিন পর, কলিকাতা হইতে ধীরেন মুখার্জ্জি প্রভৃতি তিনটি ছেলে এবং কুমিল্লা হইতে রমেশ মজুমদার ও চন্দ্রোদয় ভট্টাচার্য্য ঢাকার আশ্রমে আসে। এর পর আসে ফরিদপুরের প্রদ্যোত সেন ও চাঁদপুরের ননীগোপাল গুহ রায়। প্রদ্যোতের সাথে ফরিদপুরে থাকা কালেই আমার পরিচয় হয়। আমাদের ঢাকা আসার সময় সে প্রেসিডেন্সী কলেজে বি, এস, সি পড়িতো।

দেশবন্ধুর ঢাকায় আগমন

কিছুদিন পর দেশবন্ধু ঢাকায় আসেন। আমাদের অনুরোধে, তিনি একদিন আশ্রমেও আসিলেন। আমাদের বিশ্বাস ছিলো, আমাদের ভাবী কাজ সম্বন্ধে তিনি কোন নির্দ্দেশ দিবেন। মহাত্মাজীর উপদেশে এই আশায়ই আমরা এতোদিন বসিয়া ছিলাম। আশ্রমে তিনি প্রায় দু-তিন ঘণ্টা কাটান। মহাত্মাজীর আধ্যাত্মিকতা ও বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তাও তাঁর সাথে হয়। কিন্তু কাজ সম্বন্ধে কোন কথাই তিনি আমাদের বলেন না। তাঁর যাওয়ার পর আমরা ভাবিলাম দেশবন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিলে চলিবে না। এভাবে বসিয়া থাকা সম্ভবই বা কতোদিন? নিজেদেরই একটা পথ খুঁজিয়া লইতে হইবে।

এরপর আমরা ঢাকার কংগ্রেসের কাজে যোগ দিতে চেষ্টা করিলাম। সাধারণ নির্ব্বাচন আসিলো। এ নির্ব্বাচনে অনেক টানা হেঁচড়া ও মন কষাকষির পর তিনজন সম্পাদকের মধ্যে নিপেনকে একজন করা গেলো। আমি, প্রফুল্ল, কালু প্রভৃতি কয়েকজন কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য হইলাম। অনুশীলন সমিতির তখন ঢাকায় খুব প্রাধান্য। কংগ্রেসে এদের দলই ভারী। শ্রীশ চাটার্জ্জি এদের প্রধান মুখ পাত্র। শ্রীশ বাবু ঝানু রাজনীতিক। আমাদের মতো আনাড়ীদের তার সাথে আঁটিয়া ওঠা দায়। অনুশীলন সমিতির সাথে আমাদের অসদ্ভাবও অনেক দিনের পুরাণো। তাই এদের সাথে আমাদের সংঘর্ষ চলিতেই

লাগিলো। কাজ কিছুই এগোয় না—শুধু মিটিংএর পর মিটিং, ঝগড়ার পর ঝগড়া। নিপেন সম্পাদক হইলো নামে মাত্র। কংগ্রেস অফিসে সে কোন পাত্তা পাইতো না—ভিতরের সংবাদ জানা তো দূরের কথা। এই অনর্থক সংগ্রামে অল্পকাল মধ্যেই আমরা হাঁপাইয়া পড়িলাম। তাই এ-সব সহুরে ঝগড়া ছাড়িয়া গ্রামে যাওয়া ঠিক হইলো।

মালিকান্দ আশ্রম

সুযোগও জুটিলো। প্রফুল্লদের বাড়ী মালিকান্দা। মালিকান্দা ঢাকার সদর মহকুমার অধীনে দোহার থানায় একটি গ্রাম। প্রফুল্লদের জ্যাঠতুত দাদা হেমচন্দ্র ঘোষ ঢাকার কোনো জমিদারের অধীনে কাজ করেন। তিনি প্রতি বৎসর তার বাড়ীতে রামকৃষ্ণের জন্ম উপলক্ষে উৎসব করেন। তার বাড়ীও মালিকান্দায়। তার সাথে আমাদের খুব ভাব ছিলো। তিনি এই উৎসব উপলক্ষে আমাদের তার বাড়ীতে যাইতে অনুরোধ করিলেন। আমরাও রাজী হইলাম। নির্দ্দিষ্ট দিনে ঢাকা আশ্রমের প্রায় সব, প্রথম গহনায় ও পরে পায় হাঁটিয়া, মালিকান্দা পৌঁছি। প্রফুল্লের বাপ মা কেউ জীবিত ছিলেন না। তাহার বাড়ীতেই আশ্রয় লইলাম।

উৎসব শেষ হইলো। ঠিক হইলো আমরা কয়েকজন মালিকান্দা থাকিয়া কাজ আরম্ভ করিবো—বাদ বাকী সব ঢাকা ফিরিয়া যাইবে। মেঘুলা বাজারে প্রথম সভা ডাকা হইলো। মেঘুলা মালিকান্দারই অতি কাছে। সভায় বেশ লোক হইলো—

বেশীর ভাগই মুসলমান। সভায় যাওয়ার পরই মহাত্মাজীর একটি কথা মনে পড়িলো। কিছুদিন আগে, ফরিদপুরের নেতাদের এ-আন্দোলনে অত্যন্ত ঔদাসীন্য দেখিয়া, কলিকাতায় গিয়া মহাত্মাজীকে বলিয়াছিলাম—মহাত্মাজী, আপনার এই আন্দোলন কেউ গ্রহণ করবে না। বলিয়া আমি ফরিদপুরের বড় বড় উকীলদের কথা বলিলাম। মহাত্মাজী আমার ডান হাতের শিরা ধরিয়া বলিলেন—I am feeling the pulse of India—বড়লোকদের ছেড়ে দিয়ে জনগণের কাছে যাও, যদি তারা তোমার কথা না শোনে, তবে ফিরে এসো। এ-মিটিং-এ আসিয়া বুঝিলাম মহাত্মাজীর নাম বিচিত্র আকারে বাতাসে ভাসিয়া জনগণের কাণে ইতিপূর্ব্বেই পৌছিয়াছে। মহাত্মাজী সম্বন্ধে এদের ধারণা অতি অদ্ভুত। কেউ বলিলো—মহাত্মাজী একই সময় বাইশ জায়গায় বক্তৃতা দিতে পারেন। কেউ বলিলো—তার লক্ষ লক্ষ সৈন্য, ইংরেজ রাজত্ব তিনি কেড়ে নিলেন বলে। মোটের উপর মহাত্মাজীর উপর এদের বিশ্বাস অসীম। এবং মহাত্মাজীর নামে কোনো কথা বলিলে তা এরা বিনা দ্বিধায় গিলে। ধারণা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে দীর্ঘস্থায়ী হয় না। তা দ্বারা কোনো বিপ্লব-সাধন অসম্ভব। তাই এই আন্দোলনে স্বাধীনতা লাভ হইবে না, এ-জ্ঞান অল্প সময়েই হইলো। সাথে সাথে ইহাও বুঝিলাম, এই আন্দোলন দেশকে অনেক দূর আগাইয়া নিবে।

এরপর একমাস কাটে দোহার থানার বিভিন্ন ইউনিয়ানে মিটিং ও কংগ্রেস কমিটী স্থাপন করিতে। গণতান্ত্রিক

প্রতিষ্ঠানের নিয়ম অনুসারে গাঁয়ের লোকদেরই এ-সব কমিটির প্রেসিডেণ্ট, ভাইস প্রেসিডেণ্ট, সেক্রেটারী ও সভ্য করা হইতো। কংগ্রেসের মেম্বার হওয়ার ফী বাবদ পাওয়া বিশ-পঁচিশ টাকা ঐ কমিটির সম্পাদকের কাছেই জমা থাকিতো। স্বরাজ্য ভাণ্ডারে কিছু আদায় হইলে, তাও তাদের কাছে রাখিতাম, নিজেরা কিছুই নিতাম না। আমাদের সব খরচই, যাতায়াত শুদ্ধ, পূর্ব্বোক্ত পাঁচ হাজার টাকা হইতে চলিতো।

দোহার থানার কাজে ব্যস্ত, এমন সময় হরিপদ ও দেবেন সন্ন্যাসী সাজিয়া আশ্রম ছাড়িয়া চলিয়া যায়। হরিপদ তখন নবাবগঞ্জে কংগ্রেসের কাজ করিতে ছিলো। কেন যে তারা সন্ন্যাসী হইয়াছিলো এখনো বুঝিতে পারি নাই। তবে তাহারা কতক পায়ে হাঁটিয়া—কতক নৌকা, ষ্টীমার ও ট্রেন যোগে—কৃষ্ণনগর হইয়া নবদ্বীপ অবধি যায়। হাতে পয়সা ছিলো না, অথচ প্রাণ বৈরাগ্যে ভরা, তাই তাহারা গয়নার মাঝিকে কেরায়া স্বরূপ নিজেদের একমাত্র সম্বল কম্বল দু-খানা দান করে। তাহারা প্রায় পনর দিন এ ভাবে ঘোরে। ইতিমধ্যে আমার দোহার থানার কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিলো। তারিণীকে মালিকান্দার কাজের চার্জ্জ দিয়া ঢাকা যাইবো ভাবিতেছি, এমন সময় একদিন বিকালে সন্ন্যাসীবেশে হরিপদ ও দেবেন মালিকান্দা আসিয়া উপস্থিত। আমার অনুরোধে দেবেন সন্ন্যাস ছাড়িয়া সেখানেই থাকিতে রাজী হইলো। কিন্তু হরিপদ রাজী হইলো না। সে সন্ধ্যার আগেই আবার চলিয়া গেলো।

লক্ষীপুর মালিকান্দা হইতে পাঁচ ছয় মাইল দূরে একটি গ্রাম। পরদিন সকালে, আমি ও দেবেন একটি মিটিং করিতে সেই গ্রামে যাইতেছি, পথের পাশের এক জঙ্গল হইতে হরিপদ ফস্ করিয়া হাসিতে হাসিতে বাহির হইলো। তাহাকে এ-ভাবে বাহির হইতে দেখিয়া আমার ভারী হাসি পাইলো। সাথে সাথে মনে পড়িলো বিল্বমঙ্গল নাটকে ভিক্ষুকের সেই চিরপরিচিত গান—

বসেছিল বঁধু হেঁসেলের কোনে।
বল্লে না ফুটে খামকা উঠে
হামা দিয়ে সেঁধুল বনে।

এরপর, সে আমাদের সাথে সাথে লক্ষীপুর অবধি যায়। সে দিন বিকালে লক্ষীপুরে একটি সভা ছিলো। সে সভায় সে বক্তৃতা দেয়—অতি সুন্দর বক্তৃতা। হরিপদের বক্তৃতা এর আগে কখনো শুনি নাই। সে যে এতো সুন্দর বক্তৃতা দিতে পারে তা আমার কল্পনার-ও অতীত ছিলো। তার মনের আবেগ-উছল ভাব সমূহ যেন প্রতি কথায় জীবন্ত আকারে ঝরণা বেগে বাহির হইতে লাগিলো। আমার সারাদিনের অনুরোধ, উপদেশ, ঠাট্টা ও বিদ্রূপের চাপে সে গেরুয়া ছাড়িতে রাজী হইলো।

নবাবগঞ্জ আশ্রম

লক্ষীপুর থেকে সে আমায় নবাবগঞ্জ লইয়া যায়। অজানা নূতন পল্লীতে এতো অল্প সময়ের মধ্যে তার এতো অধিক প্রতিষ্ঠা লাভ আমায় মুগ্ধ করিলো। তার অনুরোধে কলা-

কোপার এক জনসভায় বক্তৃতা-ও দিলাম। কলাকোপা নবাবগঞ্জের পার্শ্ববর্ত্তী একটি ধনী পল্লী। ধনীদের সকলেই সাহা। এদের মধ্যে আবার ছ জনই প্রধান। এরা কিছুতেই কংগ্রেসের মেম্বার হইতে চাহিতেছিলো না। মেম্বার করিতে গেলে বলিতো—চার আনা পয়সা দিতে রাজী আছি কিন্তু নাম লিখতে পারবো না। পুলিসের ভয়। আমার সভায় এরা সকলে উপস্থিত হইলো। দেশ স্বাধীন হইলে ব্যবসায়ীদেরই বেশী লাভ হইবে, সুতরাং তাদেরই স্বাধীনতার এই আন্দোলনে অগ্রণী হওয়া উচিত—ইহাই ছিলো আমার বক্তৃতার প্রধান বিষয়। সভায় অনেক তর্ক বিতর্ক হইলো। আমার বিপক্ষে-ও কেহ কেহ বলিলো। কিন্তু তখন আমি তরুণ—অন্তর ভাবে ভরা—কথা বলি প্রাণের সমস্ত শক্তি দিয়া। তাই শেষ অবধি কেউ টিঁকিতে পারিলো না। পরদিন এরা ছ জনই কংগ্রেসের সভ্য হয়। আমিও এরপর নবাবগঞ্জ হইতে গয়নায় ঢাকা যাই। পথে, গয়নায় শুইয়া, শুধু মনে হইলো এদের ছয় জনের মেম্বর হওয়ার কথা। আমি তখন পর্য্যন্ত শুধু স্বাধীনতাই বুঝিতাম। ভাবিতাম স্বাধীনতা লাভের জন্য মানুষের প্রাণ আপনা আপনিই লাফাইয়া ওঠে। স্বাধীনতা লাভের আগ্রহের পিছনে যে আর কোন কারণ থাকিতে পারে সে-কথা কখনো মনে ঠাঁই-ও পাইতো না। কিন্তু এখন দেখিলাম মানুষের এই স্বাধীনতা লাভের পিছনে-ও একটি অতি বাস্তব কারণ আছে এবং সেই কারণটি হইতেছে আর্থিক স্বার্থ। জগতের আদি যুগ হইতে এ-পর্য্যন্ত যত লড়াই হইয়াছে খতাইয়া দেখিলেও বুঝা

যায়, তাদের অধিকাংশের পিছনেই এই বাস্তব কারণটি বিদ্যমান। তথা-কথিত আধ্যাত্মিকতার মোহে আচ্ছন্ন আমরা এতো দিন এ-কারণটির দিকে তাকাই নাই, তাই আমাদের এই বর্ত্তমান পরাধীনতা।

ঢাকায় প্রফুল্লর সাথে ভাবী কাজ সম্বন্ধে অনেক আলাপ হইলো। দোহার থানার এক মাসের কাজের অভিজ্ঞতাকে ঢাকার অন্যত্র রূপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে ঠিক হইলো ইহার পর আমি যাইবো নারায়ণগঞ্জ, প্রফুল্ল মুন্সীগঞ্জ। নারায়ণগঞ্জে যাওয়ার অল্প পরেই এক সাধারণ সভায় আমাকে মহকুমা কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক করা হইলো। এর আগে শ্রীশ বাবুর দলের জনৈক তরুণ সম্পাদক ছিলো। নারায়ণগঞ্জ একটি বাণিজ্য বহুল বন্দর। এখানকার পাটকল সমূহে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার মজদুর কাজ করে। এ-সভায় ইহাদের অনেকে উপস্থিত ছিলো। ইহাদের অনেকেই হিন্দুস্থানী। তাই আমায় ভাঙ্গা হিন্দীতে বক্তৃতা দিতে হইলো। ১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলন সত্যি গণ-আন্দোলন ছিলো। সমাজের সমস্ত স্তর এ-আন্দোলন তরঙ্গে আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছিলো। এ-সব শ্রমিকেরা শুধু সভায়-ই আসিতো না—মুক্তহস্তে চাঁদাও দিতো। একবার সভায় বলিলেই হইতো—প্রত্যেক শ্রমিককে এতো করিয়া চাঁদা দিতে হইবে—নির্দ্দিষ্ট সময়ে গিয়া দেখিতাম সকলে পয়সা হাতে হাজির, কে কার আগে দিবে তা লইয়া ঠেলাঠেলি লাগিয়াছে, চাঁদার খাতায় নাম প্রভৃতি লিখিয়া ওঠা দায়। কাজের এতো অপূর্ব্ব সুযোগ অথচ নিজেদের

ভিতরকার দলাদলির ফলে সব কাজ মাটি হইয়া যাইতো। কুলীরা এতো অধিক সংখ্যায় চাঁদা দিতেছে দেখিয়া, ঢাকা হইতে বিপক্ষদলের লোকেরা আসিয়াও মাঝে মাঝে চাঁদা আদায় করিয়া লইয়া যাইতো। পরে আমি গিয়া বেকুব বনিতাম—কুলীরাও তাহাদের ভুল বুঝিতো। সাথে সাথে তাহাদের মনে উপ্ত সন্দেহের বীজ ক্রমশঃ বিরাট অবিশ্বাসের আকারে বাহিরে প্রকাশ পাইত। ফলে কাজের গোড়াই শুধু দুর্ব্বল হইলো না। এখানকার জীবনও বিষময় হইয়া উঠিলো। এ-জন্য এ জায়গা ছাড়িয়া চলিয়া যাইব ভাবিতেছি—এমন সময় অন্য স্থল হইতে আপনা-আপনি কাজের আহ্বান আসিলো।

চাঁদপুর কুলী রিলিফ

কাগজে তখনো কিছু বাহির হয় নাই, কিন্তু লোকমুখে শুনিতে লাগিলাম, চাঁদপুরে চা-বাগানের বহু কুলী আসিয়া সমবেত হইয়াছে—তাদের উপর একদিন গুর্খাদের বেয়নেটও চলিয়াছে। চাঁদপুর হইতে দু-চারটি কুলীও আসিয়া নারায়ণগঞ্জে হাজির হইলো। তাদের মুখেও সেই এক কথা। প্রাণ বড় চঞ্চল হইয়া উঠিলো। চাঁদপুর আমার অতি প্রিয় স্থান। শৈশবের অনেক দিন সেখানে কাটিয়াছে। কৈশোরে লেখা-পড়াও শিখিয়াছি সে জায়গায়। তাই পরের দিনের ষ্টীমারেই চাঁদপুর রওনা হইলাম। সেখানে পৌছিয়া দেখি ভয়াবহ অবস্থা। কুলীরা নানাস্থানে ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পড়িয়া আছে। তাদের মধ্যে

প্রচণ্ড আকারে কলেরা দেখা দিয়াছে। চিকিৎসার কোন ভাল বন্দোবস্ত নাই। রেলওয়ের একটি ছোট ডিস্‌পেনসারীতে কয়েকটি কুলীর চিকিৎসা চলিতেছে। বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্য বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টার ডাক্তার ব্যাট্রা কয়েকজন সহকারীসহ সেখানে উপস্থিত আছেন, কিন্তু কাজ কিছুই হইতেছে না। সরকার ও চা-বাগানের কর্তৃপক্ষ কুলীদের ফিরাইয়া নিতে ব্যস্ত—কংগ্রেসের নেতারা সরকারের এই কাজে বাধা দিতেছেন। উপস্থিত কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে অখিলবাবুই প্রধান। সেনগুপ্ত তখনো আসেন নাই—দু একদিনের মধ্যেই আসিবেন। আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ষ্ট্রাইক তখনো সুরু হয় নাই—ষ্ট্রাইকের জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। চাঁদপুরে পূর্ণ হরতাল বিদ্যমান। স্কুল, কাচারী, হাট বাজার সব বন্ধ। আমার দাদা সেখানে সরকারী উকীল ছিলেন। তিনিও কাচারীতে যান না। সরকার পক্ষের আনাগোনা তার কাছে চলিতেছে। সরকার পক্ষ বলে তারা নিরপরাধ—দাদার সহযোগীতা তারা চায়। কিন্তু দাদা সহযোগীতা দানে নারাজ। বলেন—তোমরা নিরীহ কুলীদের উপর গুর্খাদের লেলিয়ে দিয়েছ, কোনো সহানুভূতি তোমাদের জন্য আমার প্রাণে নাই, কোন সাহায্য আমার কাছ থেকে তোমরা আশা করতে পার না। সরকারের পক্ষে চাটগাঁর কমিশনার মিষ্টার কে, সি, দে ও কুমিল্লার ম্যাজিষ্ট্রেট্ সেখানে হাজির। চাঁদপুরের মহকুমা হাকিম সুশীল সিং তো আছেনই। কে, সি, দে বাঙ্গালী। তাই তিনি নামে মাত্র কর্ত্তা। সত্যিকার কর্ত্তা কুমিল্লার ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট।

চা বাগানের কুলী

আসামের চা বাগানের কুলীদের উপর মালিকদের অত্যাচার কাহিনী, নানারঙ্গে রঞ্জিত হইয়া, আমাদের শুধু কানে পৌঁছে নাই—চাঁদপুর আসামের পথে বলিয়া, সে অত্যাচারের করুণ দৃশ্য দেখার দুর্ভাগ্যও আমাদের বহুবার ঘটিয়াছে। আসামের চা বাগানে এখন মজুরের অভাব নাই। তাই এখন বাহির হইতে আর নূতন মজুর বড় বিশেষ আমদানী করিতে হয় না। কিন্তু আমাদের ছোট কালে আড়কাঠীরা বিলাসপুর, ছোটনাগপুর প্রভৃতি অঞ্চল হইতে দলে দলে মজদুর আসামে আমদানী করিতো। নিজেদের দেশে খাওয়া জোটে না, তাই আর-কাঠীদের প্রলোভনে পড়িয়া ইহারা বাড়ীঘর ছাড়িয়া স্ত্রী-পুত্রসহ আসামে যাইতো। ইহাদের ভাবী দুর্দ্দশার কথা ভাবিয়া, ব্যাঙ্গচ্ছলে চাঁদপুরের কেহ যদি ইহাদের জিজ্ঞাসা করিতো 'কাঁহা যাতা হায়'—তবে বুকটান করিয়া উহারা অমনি জবাব দিতো —'কাছাড় যাতা হায়'। ইহাদের দেশে খাদ্যাভাব বটে, কিন্তু স্বাস্থ্য ভাল—জ্বর নাই। কিন্তু আসাম তখন ছিলো ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের ডিপো। ইহাদের অনেকেই কিছুদিন সেখানে থাকার পর, ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর লইয়া পেট টিন্‌টিন্‌ অবস্থায় চাঁদপুরে ফিরিতো। মৃত্যুর অতি সন্নিকটবর্ত্তী এইরূপ অনেককে চাঁদপুরের কেউ কেউ ঠিক আগেরই মতো ব্যাঙ্গ করিয়া বলিতো—কাঁহাসে আয়া হায়। কুলীর আগেকার আর সেই স্বাভাবিক তেজ নাই। তাহার শীর্ণ দেহ এখন মাথা সহ মাটির

দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। তাই সটান বুকের সতেজ উত্তরের বদলে, এখন শুধু বাহির হইতো অতি ক্ষীণ কণ্ঠে উচ্চারিত—নীচের করুণ কথা কয়টি—বাবু, খানা নাহি মিলা, ভুখা মর রহা হুঁ।

অত্যাচার শুধু ম্যালেরিয়া, কালাজ্বরেরই নহে। ইহারা বাগানে যে-সব লাইনে বাস করে, তাহা জনসমাগম হইতে বহুদূরে। তা ছাড়া বাগানের চৌকিদারের কড়া নজর এড়াইয়া কোনো কুলীর বাহিরে যাওয়া কিংবা কোন বাহিরের লোকের ভিতরে আসা অতি কঠিন। তাহার উপর বাগানের মালিকদের আপসে এরূপ বন্দোবস্ত ছিলো যে এক বাগানের কুলীকে অন্য বাগানের কাজে লাগানো হইবে না। ফলে চা বাগানের কুলীদের যেখানে ইচ্ছা সর্বোচ্চ দরে নিজেদের শ্রম বেচাও অসম্ভব ছিলো। তাই তাহারা একই বাগানে গোলামী করিয়া সারা জীবন কাটাইতে বাধ্য হইতো। এ-সব কারণে চা বাগানের কুলীদের মধ্যে কোনো ট্রেড ইউনিয়ানের সংগঠন কিংবা সুনিয়ন্ত্রিত শ্রমিক আন্দোলনের বিকাশ সম্ভব হয় নাই।

তাই বলিয়া চা বাগান সমূহের কাজ নির্বিবাদে চলিতে-ছিলো ভাবা-ও ঠিক হইবে না। অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষের মাথা আপনা আপনিই খাড়া হইয়া ওঠে। অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষের মনের এই স্বাভাবিক বিদ্রোহ-ভাব সুনিয়ন্ত্রিত সঙ্ঘ দ্বারা চালিত হইলে ক্রমশঃই অধিক সফলতার দিকে অগ্রসর হয়। এরূপ সঙ্ঘের অভাবে এই বিক্ষোভ সাময়িক অশান্তি ও মারপিটের আকার ধারণ করে।

এ-সব অনিয়ন্ত্রিত উত্তেজনার অবশ্যম্ভাবী ফল—অবসাদ ও প্রতিক্রিয়া।

সুনিয়ন্ত্রিত ট্রেড্ ইউনিয়ন আন্দোলনের বিকাশের সুযোগের অভাবে, এ ধরণের অত্যাচার, উত্তেজনা ও অবসাদের মাঝেই আসামের চা-বাগানের শ্রমিকদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছিলো। এমন সময় মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের ধাক্কা তাহাদের পরাণে লাগে। তখন তাহাদের আর্থিক অবস্থাও অতি শোচনীয়। যুদ্ধের পর সকল জিনিষের দাম বাড়িয়াছে, যে মাইনে তাহারা পায় তাহাতে তাহাদের খরচ চলে না, তাই তাহারা কিছু বেশী মাহিনা দাবী করিলো। এই দাবী লইয়া ১৯২০-এ আসামের বিভিন্ন চা-বাগানে হরতাল এবং মারামারি হয়। ১৯২১-এর প্রারম্ভ হইতেই চা-বাগানের নিকটবর্ত্তী গ্রাম ও সহরসমূহে অসহযোগ আন্দোলন উপলক্ষে মিটিং হইতে থাকে। এই সব মিটিং-এ চা-বাগানের শ্রমিকেরাও যোগ দিতো। ফলে তাহাদের অসন্তোষের উত্তাপ আরো বাড়ে। মহাত্মাজী ও কংগ্রেসের উপর তাহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জন্মে। তাহাদের দুঃখের জীবন অবসন্ন প্রায়, সুখের দিন আসিলো বলিয়া—এ-ধরণের ভাবনা তাহাদের অন্তরে উঁকি ঝুঁকি মারিতে থাকে। অত্যাচারিতের প্রাণে মুক্তির এ-আশাই বিপ্লবের অগ্রদূত।

মুক্তির আশার এই তরঙ্গে যখন তাদের দীর্ঘ দিনের অবসন্ন মন উদ্বেল—ঠিক সে-সময়, যে কোন প্রকারে হোক, এই বাণী তাহাদের কানে পৌঁছে—মহাত্মাজীর হুকুম, সকলকে তখনই

চাবাগান ছাড়িয়া পুত্রকন্যা সহ আপন গ্রামে চলিয়া যাইতে হইবে। এই বাণী কানে পৌছা মাত্র তাহারা যেন ক্ষেপিয়া উঠিলো। তাহাদের অনেকে দু-তিন পুরুষ যাবত সেখানে আছে—জায়গা-জমি, গরুবাছুর করিয়াছে। সে-সব জলের দরে বেচিয়া কিম্বা অমনি বিলাইয়া দিয়া, তাহারা যে যাহা পারে সাথে লইয়া রওনা হইলো। বাগানের মালিকেরা তাহাদের ফিরাইতে অনেক চেষ্টা করিলো। কিন্তু কে শুনে তখন তাহাদের কথা। তীর্থ যাত্রীর নূতন উদ্যমে তাহারা আগাইয়া চলিলো।

করিমগঞ্জ সবচেয়ে নিকটের রেলওয়ে ষ্টেশন। সেখানে গিয়া তাহারা সমবেত হইলো। কিন্তু তাহাদের ট্রেনের টিকেট দেওয়া হইলো না। স্থানীয় কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ চাঁটগায় শ্রীযুত জে, এম্, সেনগুপ্তের কাছে তার করে। তার পাইয়া সেনগুপ্ত করিমগঞ্জ যান। এবং তারই চেষ্টায় কুলিরা ট্রেনের টিকেট পায় এবং চাঁদপুর পর্য্যন্ত পৌছে।

চাঁদপুর হইতে প্রথম একদলকে ষ্টীমারে গোয়ালন্দ যাইতে দেওয়া হয়। কিন্তু চা বাগানের মালিকদের প্ররোচনায় গভর্ণমেণ্ট আর কুলিদের ষ্টীমারে উঠিতে দেয় না। গুর্খা সৈন্য আগে হইতে আমদানি করা হইয়াছিলো, কুলিরা ষ্টীমারে উঠিতে চেষ্টা করিলেই গুর্খারা তাহাদের বাধা দিতো। গুর্খাদের এই বাঁধা ঠেলিয়াই তাহারা একদিন ষ্টীমারে উঠিতে চেষ্টা করে কিন্তু সফল হয় না। সে-রাত্রে স্ত্রীপুত্রসহ তাহারা ষ্টেশনের কাছে মাঠে শুইয়া আছে, এমন সময় হঠাৎ ষ্টেশনের বাতি সমূহ নিবাইয়া

২২

দেওয়া হয়। পরে গুর্খারা বেয়নেটসহ কুলিদের আক্রমণ করে। এই আক্রমণের ফলে অনেক শ্রমিক আহত তো হয়ই—কারণ আহতদের অনেককে আমি আপন চোখেই দেখিয়াছি—অনেকে হত হয় বলিয়াও প্রকাশ। জনগণের ধারণা হতদের পাথরের সহিত ছালায় ভরিয়া মেঘনায় ডুবানো হইয়াছে।

এই সংবাদ শুনা মাত্র সেনগুপ্ত চাঁদপুর আসেন। তাঁহার চাঁদপুর আসার দু-এক দিনের মধ্যেই আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের শ্রমিকেরা হরতাল করে। এ হরতাল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক নহে—যদিও পরে ইহাতে অর্থনৈতিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছিলো। আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের শ্রমিকদের কোনো সুসংগঠিত ইউনিয়ান ছিলো না। তবু হরতালের সিদ্ধান্ত চাঁদপুরে গৃহীত হওয়া মাত্র বিদ্যুৎবেগে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে এবং সকল জায়গায় ভারতীয় শ্রমিকেরাই ইহাকে সানন্দে বরণ করিয়া লয়। ফলে দেখিতে দেখিতে দু-একদিনের মধ্যেই আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের সকল ষ্টেশনের কাজ বন্ধ হয়, ট্রেণের যাতায়াত অসম্ভব হইয়া পড়ে। পূর্ব্বে চাঁদপুরের বিশাল ষ্টেশন সন্ধ্যা হইতে না হইতেই বিদ্যুৎ আলোয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতো—তাহা এখন সারারাত অন্ধকার-আচ্ছন্ন থাকিতে লাগিলো। কর্ম্মচঞ্চল চাঁদপুর ষ্টেশনের অসাড় নীরবতার পানে তাকাইলেই ভারতময় সর্ব্বত্র এরূপ অবস্থা আনয়ন সম্ভব হইলে কি দশা দাঁড়ায়, সে কথা মনে হইতো।

ষ্টীমার লাইনেও হরতালের চেষ্টা চলিলো। নারায়ণগঞ্জ,

গোয়ালন্দ, কিংবা বরিশাল হইতে চাঁদপুরে কোনো ষ্টীমার আসিলেই তাদের সারেঙ্গ ও খালাসীদের হরতালের কথা বলা হইতো। প্রথম প্রথম তাহাদের এ-কথা বলিতে খুবই দ্বিধা বোধ হইতো। ভয় হইতো—হয়তো তাহারা এ-কথা মানিবে না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, শোনা মাত্রই উৎসাহ সহকারে তাহারা আমাদের কথায় রাজী হইতো এবং ষ্টীমারের ঘাটে পৌছার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই কাজ সারিয়া ষ্টীমার ছাড়িয়া পারে চলিয়া যাইতো। আমরা এ-কাজ খুবই গোপনে করিতাম বটে, তবু-ও ইহার সংবাদ গবর্ণমেণ্টের কাণে পৌছিলো। আমরা যেন এ-কাজ আর না করিতে পারি, সেজন্য চাঁদপুরের মহকুমা হাকিম পর্য্যন্ত ষ্টীমারে আসিয়া আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেন। একদিন আমি জনৈক সরেঙ্গের সাথে এ-সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলিতেছি, এমন সময় মহকুমা হাকিম অনারেবল মিষ্টার সুশীল সিং পিছন হইতে চুপে চাপে আসিয়া খপ করিয়া আমার ডান হাত ধরিয়া ফেলেন। পরে বলেন—It does not become you, I arrest you. তিনি আমায় পূর্ব্ব হইতেই চিনিতেন। তিনি আমাদের চাঁদপুরের বাসায় প্রায়ই যাইতেন। তাই আমি যে চাঁদপুরের গভর্ণমেণ্ট প্লীডার নলিনী নাথ ব্যানার্জ্জির ভাই, তা তাহার জানা ছিলো। হাতে ধরিয়া তিনি আমায় ষ্টীমার হইতে সিঁড়ি দিয়া পাড় পর্য্যন্ত লইয়া গেলেন। ষ্টীমার ও ঘাটের অসংখ্য লোক আমার পানে হয়তো সম্মানের চোখেই চাহিয়া ছিলো। কিন্তু আমি কোন প্রকাশ্য কাজে নহে, গোপন কাজ করিয়া ধরা

পড়িয়াছি, এজন্য আমার ভারী লজ্জা হইতে লাগিলো। মিঃ সিং তীরে দাঁড়াইয়া কি জানি কি খানিক ভাবিলেন—পরে আমায় ছাড়িয়া দিলেন। ইহার পরও আমি এ-ধরণের কাজে যাইতাম বটে কিন্তু বাঁধ বাঁধ ঠেকিতো। ষ্টেশনে পৌছিয়াই চারিদিকে তাকাইয়া দেখিতাম—মিঃ সিং ষ্টেশনে আছেন কি না। কিন্তু এরপর তাকে আর কখনো ষ্টেশনে দেখি নাই। এভাবে একে একে বাজার্ড ছাড়া সকল ষ্টীমারের সারেঙ্গ ও খালাসীরাই হরতাল করে। ফলে গোয়ালন্দ, বরিশাল, নারায়ণগঞ্জ ও চাঁদপুরের মধ্যে—শুধু মানুষের নহে—মালেরও চলাচল বন্ধ হয়।

চাঁদপুরে তখন দোকান হাট বন্ধ ছিলো বটে, কিন্তু কংগ্রেস অফিস হইতে টিকেট লইয়া কেহ কোন জিনিষ কিনিতে গেলে, দোকানদার তাহার কাছে সে জিনিষ বেঁচিতে পারিতো। চাঁদপুরে হিন্দু মুসলমান সকলেই কংগ্রেস অফিস হইতে টিকিট লইয়া বাজারে যাইতো। কাজেই তাহাদের জিনিষ পত্র কেনা সম্বন্ধে কোনো অসুবিধা ছিলো না। মিশন হাউসের পাদ্রীরাও দু-চার দিনের ইতঃস্ততের পর কংগ্রেস অফিস হইতে টিকিট লইতে লাগিলো। ফলে তাহাদেরও অসুবিধা দূর হইলো। মুস্কিল বাঁধিলো সরকারী চাক্‌রে ও পাটের আফিসের সাহেবদের লইয়া। সরকারী চাক্‌রের পক্ষে তো কংগ্রেসের নির্দ্দেশ মানা অসম্ভবই। পাটের আফিসের সাহেবেরা, সরকারী চাক্‌রে না হইলেও, বিদেশী বণিক। ভারতগভর্ণমেণ্টের ইস্পাতের কাঠামো ঠিক্ রাখা হয় এই বিদেশী বণিকদের স্বার্থের সংরক্ষণের

জন্য। সুতরাং এরাই বা কংগ্রেসের নির্দ্দেশ মানে কিরূপে? অথচ কংগ্রেসের টিকিট ছাড়া তখন ছোট বড় কোনো দোকান কিংবা রাস্তাঘাটের কোন লোক হইতে কোন জিনিষ কেনা অসম্ভব। সেখানকার সকলের প্রাণই তখন স্বাধীনতা-সংগ্রামের সুরে বাঁধা। সাধারণ লোকের কথা তো সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বিভাগীয় কমিশনার-এর পর্য্যন্ত কোনো দোকানে গিয়া কোনো জিনিষ কেনা সম্ভব হয় নাই। তাই গভর্ণমেণ্ট অফিসার ও পাটের আফিসের সাহেবদের জন্য বাহির হইতে জিনিষ পত্র আনা ছাড়া গত্যন্তর ছিলো না। এ-কাজ বাজার্ড ষ্টীমার দ্বারা কতক সম্পন্ন হইতো বটে, কিন্তু বেশী সম্পন্ন হইতো পুলিস লঞ্চগুলি দ্বারা।

তাই আমাদের দৃষ্টি পড়িলো ইহাদের দিকে। গভর্ণমেণ্ট অফিসার ও পাটের আফিসের সাহেবদের অনাহারে মারার উদ্দেশ্য আমাদের কখনো ছিলো না। এরূপ নিষ্ঠুরতা মহাত্মাজী প্রবর্ত্তিত কোন আন্দোলনের মূলনীতির বিরোধী। আমাদের শুধু উদ্দেশ্য ছিলো ইহাদের কংগ্রেসের নির্দ্দেশ মানিতে বাধ্য করা। পুলিস লঞ্চগুলি ডাকাতিয়া নদীতে রাত্রে বিশ্রাম করিতো। আমরা গভীর রাত্রে, সারা সহর নিস্তব্ধ হইলে পর, ছোট ডিঙ্গী বাহিয়া লঞ্চে গিয়া খালাসীদের সাথে আলাপ করিতাম। খালাসীরা আমাদের যুক্তির সারবত্তা, স্বাধীনতার সংগ্রামে যোগ না দেওয়া যে অন্যায়—একথা বুঝিতো। কিন্তু সরকারের চাকরে তাহারা, হরতাল করিলে চাকরি যাইবে, এই ভয়েই আমাদের কথা মানিতে রাজী হইতো না। তাই রাতের পর

রাত—ইহাদের সাথে অনেক কথা কাটাকাটির পর নিরাশ হৃদয়ে আমাদের ফিরিতে হইতো। প্রতিদিন বিকালে চাঁদপুরের নীরোদ পার্কে বড় বড় সভা হইতো। এ-সব সভায় সেনগুপ্ত, অখিল দত্ত, নৃপেন ব্যানার্জ্জি, বসন্ত মজুমদার প্রভৃতি বক্তৃতা দিতেন। আমি এ-সব সভায় কখনো যাইতাম না। ভাল লাগিতো না। কুলীদের মাঝে কলেরা ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিতেছিলো—আমার দৃষ্টি ছিলো সে-দিকে। ইহাদের চিকিৎসার তখন পর্য্যন্ত কোনরূপ সুবন্দোবস্ত ছিলো না। রেলওয়ে এবং সরকারী হাঁসপাতালে প্রথম আহতদের, পরে কলেরা আক্রান্তদের, কোন রকমে চিকিৎসা চলিতেছিলো বটে, কিন্তু এখন শেষোক্তদের সংখ্যা অত্যধিক হওয়ায় এ-বন্দোবস্ত একেবারেই অকেজো হইয়া পড়িল। তাই ডাক্তার ব্যাট্রা নদীবক্ষে ষ্টীমারের উপর হাঁসপাতাল করার প্রস্তাব করিলেন। এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া আমি কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষকে বলিলাম—নদীর মাঝে কলেরা হাঁসপাতাল হইলে,এ-ব্যামো সারা সহরে ও নদীর দুপাশে বহুদূর অবধি গ্রামে ছড়িয়ে পড়বে। বেশীর ভাগ কুলী এখন নদীর দক্ষিণ পাড়ে আমজাদ আকণের পাটের গুদামে ছিলো। সে গুদামের কাছে একটি মাদ্রাসা এবং ছোট খাট আরো কয়েকখানা ঘর ছিলো। আমি বলিলাম—এ-সব ঘরেই রোগীদের রাখা যেতে পারে। কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ আমার এ-প্রস্তাবে সহজেই রাজী হইলেন এবং কুলীদের এবং হাঁসপাতালের ভার আমার উপরই দিলেন। আমজাদ আকণের গুদাম আমাদের ক্যাম্পে পরিণত হইলো।

বিশপ ওয়ালশ্

হাঁসপাতাল স্থাপিত হওয়ার পরের দিন সকালে ক্যাম্পে গিয়া দেখি মধ্য বয়সের জনৈক ইংরেজ মেঝেতে পা ছড়াইয়া বসিয়া কুলীদের সাথে আলাপ করিতেছেন। কুলীরা বিশেষ আগ্রহের সহিত তাঁহার কথা শুনিতেছে। তিনি কে এবং কি করিতেছেন জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন—আমি আসামের বিশপ, নাম ওয়ালশ্। কুলীদের বিষাদ-মলিন জীবনে একটু আনন্দ দানই আমার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যেই দিনের বেলা এদের সাথে কাটাই, এদের নানারকম কথাবার্ত্তা বলি—রাত্রে ম্যাজিক ল্যানটার্ন দেখাই। কি বিষয়ে ম্যাজিক ল্যানটার্ন দেখান—আমার এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেন—যীশু সম্বন্ধে। আমি বলিলাম—যীশুর বিরুদ্ধে আমার কিছু বলার নাই। আমি তাঁকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করি। তাঁর উপদেশ আমার খুবই ভাল লাগে। অনেকবার বাইবেল পড়েছি, এখনও পড়ি। কিন্তু কোন ভারতীয়ের খৃষ্টান হওয়ার আমি ঘোর বিরোধী। কারণ জিজ্ঞাসা করায় আমি বলিলাম—খৃষ্টান হ'লে ভারতীয়েরা বিজাতীয় হ'য়ে যায়, দেশের সম্বন্ধে মোটেই ভাবে না। এর প্রমাণ স্বরূপ আমি তাকে স্থানীয় খৃষ্টানদের পানে তাকাইতে অনুরোধ করিয়া বলিলাম—তারা বিলাতী কাপড় পরে, কোন স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেয় না। এ-সত্য হলে বড়ই দুঃখের বিষয় বলিয়া তিনি বলিলেন—এদের খৃষ্টান করা আমার উদ্দেশ্য নয়, এদের একটু আনন্দ দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য। অন্য কোন ছবি নাই বলে আমি এদের যীশুর ছবি দেখাচ্ছি, আপনি কি

আমায় আর কোন ছবি দিতে পারেন ? তখন পর্য্যন্ত ম্যাজিক ল্যান্টার্নের ব্যবহার আমাদের মধ্যে প্রচলিত হয় নাই, তাই আর কোন ছবি দেওয়া সম্ভব হইলো না। খৃষ্টান করিবেন না তাঁহার এই আশ্বাস বাণীতে আশ্বস্ত হইয়া আমি সানন্দে যীশুর ছবি দেখানোর পক্ষে সায় দিলাম। বিদায়ের পূর্ব্বে আরো নানাবিষয়ে আমাদের আলাপ হইলো এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই আমরা দুজনে নিবিড় প্রীতির সম্বন্ধে আবদ্ধ হইলাম।

সেদিন বিকালে চাঁদপুর গির্জ্জায় স্থানীয় ইংরেজ ও ভারতীয় খৃষ্টানদের এক সভায় তিনি বক্তৃতা দেন। সেই বক্তৃতা প্রসঙ্গে আমার কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন—সকল খৃষ্টানেরই এই নির্য্যাতীত ও ব্যাধিগ্রস্ত কুলীদের সেবা করা উচিত। চাঁদপুর মিশনের তখনকার বড় পাদ্রী ছিলেন রেভারেণ্ড্ গ্রোভ। পরদিন সকালে হাঁসপাতালে গিয়া দেখি তিনি সেখানে উপস্থিত। আমায় দেখা মাত্র গুড্ মরণিং বলিয়া অভিবাদন করিয়া তিনি বলিলেন—আমি হাঁসপাতালে কাজ করতে এসেছি, কি করতে হবে বলুন, প্রতিদিন সকালে আটটা হ'তে দশটা পর্য্যন্ত আমি এখানে হাজির থাকতে পারি। সে অবধি তিনি আমার নির্দ্দেশ মতো হাঁসপাতালের কাজ করিতে লাগিলেন।

মিসেস্ ওয়াশ্

পুরুষ ও মেয়েদের আলেদা হাঁসপাতাল ছিলো। মিসেস্ ওয়ালশ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা অবধি মেয়েদের হাঁসপাতালে কাটাইতেন। তিনি রোগীদের ঔষধ দিতেন না, পথ্য

খাওয়াইতেন না, মলমূত্র সাফ্ করিতেন না। কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা হতভাগিনীদের জড়াইয়া ধরিয়া পাশে শুইয়া থাকিতেন। দেশবন্ধুর সাথে বাসন্তী দেবীও চাঁদপুর আসিয়াছিলেন। বাসন্তী দেবী একদিন ক্যাম্প দেখিতে আসেন। রোগীর বিছানায় মিসেস ওয়ালসকে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি বলিলেন—এরাই দেবী। আমি বলিলাম—আপনিও তো আসতে পারেন। তিনি বল্লেন—নিশ্চয়ই আসব। এর পর দু-তিন দিন তাঁকে আসার কথা বলিয়াছিলাম কিন্তু নানাকারণে তাঁর আসা সম্ভব হয় নাই।

ক্যাম্পে আমার ছোট একটি আপিস ঘর ছিলো। খাওয়ার সময় ছাড়া দিনরাত আমি সেখানেই কাটাইতাম। আপিসে আমার সহকারী ছিলো আশুতোষ চক্রবর্ত্তী। সে চাঁদপুরেই থাকিতো, একাজের উপলক্ষেই তার সাথে আমার প্রথম পরিচয়। সে সর্ব্বক্ষণ আমার কাছেই থাকিতো এবং অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে আমার সব আদেশ পালন করিতো। একদিন আপিসে বসিয়া আছি, সে আসিয়া বলিলো—আশু দাশগুপ্ত এসেছেন, হাঁসপাতালে আছেন। অনুশীলন সমিতিতে আশু দাশগুপ্ত ছিলেন পুলিন দাসের দক্ষিণ হস্ত। তাহার নাম বহুদিন হইতেই আমার জানা ছিলো। মনে মনে আমি তাকে যথেষ্ট ভক্তি এবং শ্রদ্ধা-ও করিতাম। তাই আমি ছুটিয়া হাঁসপাতালে গেলাম। গিয়া দেখি, শ্মশ্রুল মুখ, বলিষ্ঠ দেহ জনৈক প্রৌঢ় হাসি মুখে একটি রোগীর পাশে বসিয়া সেবা করিতেছেন। আমি তাঁকে দেখিয়া বলিলাম—আপনি আমার গুরুস্বরূপ, আপনাকে

কোন কাজ করিতে বলা আমার পক্ষে কঠিন, হৃদয় সঙ্কুচিত হইয়া আসে। তিনি হাসিয়া বলিলেন—এতোকাল এতো লোকের নেতৃত্ব করে আজ যদি আপনার অধীনে কাজ না করতে পারি, তা হলে আমার নেতৃত্ব করাই যে বিফল হয়েছে। আমি আর কোন কথা না বলিয়া আপিসে ফিরিয়া আসিলাম।

হাঁসপাতালের কাজ অনেকটা সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিলো। ক্রমশঃই চারিদিক হইতে কর্ম্মী ও ভলান্‌টীয়ার আসিয়া এ-কাজে যোগ দিলো। এদের মধ্যে কালীকিশোর ঘোষ ও জিতেন সেনের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কালীকিশোর বাবু নোয়াখালীর অন্তর্গত সন্দীপে কবিরাজী করিতেন। অতিশয় অমায়িক ও সেবাপরায়ণ লোক। তিনি রোগীদের মার মতো সেবা করিতেন বলিয়া তাকে আমারও মার মতো মনে হইতো —কখনো কখনো মা-ও বলিতাম। লোকটি রোগাটে কিন্তু কাজ করার শক্তি ছিলো তার অসীম। দিনরাতই খাটিতেন। জিতেন সেনের বাড়ী খুব সম্ভব পালং। দেখিতে অনেকটা বাবুর মতো। গায়ে পাতলা সিল্কের জামা, চোখে পিঁস নে চশমা। তার সেবার ক্ষমতার সম্বন্ধে প্রথম ভ্রান্ত ধারণা হওয়া খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু তার অসীম সেবাপরায়ণতা ও অন্তহীন কষ্ট সহিষ্ণুতা দেখিয়া দু-একদিনের মধ্যেই সে ধারণা দূর হইলো। কুলী রিলিফের পর তার খোঁজ নেওয়ায় অনেক চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কোন খবরই আজ অবধি পাই নাই। কেহ কেহ বলিয়াছে তিনি আর বাঁচিয়া নাই।

ভলান্‌টীয়াদের সংখ্যা ক্রমশঃ তিনশর কোঠায় দাঁড়াইলো।

তাদের ডিউটী বাঁটিয়া দেওয়া হইলো। ইচ্ছা করিলে এ-সময় আশুবাবু, কালীকিশোর ঘোষ ও জিতেন সেন একটু বিশ্রামও করিতে পারিতেন কিন্তু বিশ্রাম ভোগের প্রবৃত্তিই যেন এদের ছিলো না। সকাল হইতে রাত বারোটা অবধি হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিয়াও আশুবাবু শুইতে যাইতেন না। হাঁসপাতালের বারান্দায় থামে ঠেস দিয়া একখানা বেঞ্চের উপর বসিয়া থাকিতেন। শুইতে যাইতে বলিলে বলিতেন—ভলান্টীয়াররা সব সময় ঠিক মতো কাজ করে না, কখনো কখনো ঘুমিয়ে পড়ে, রোগীরা জল জল বলে চেঁচিয়েও জল পায় না, কাছে থাকলে একটু জল-ও তো দিতে পারি। দু-মাস অবধি রিলিফ চলিয়াছিলো। দু মাসই তিনি এমনিভাবে কাটাইয়াছেন—কখনো বিছানায় শুইতে দেখি নাই।

প্রথমে কথা ছিলো, সহরের ডাক্তাররা পালাক্রমে আসিয়া কাজ করিবে কিন্তু তারা তাদের বাইরের কাজবশতঃ সব দিন ঠিক সময় আসিতে পারিতো না। তাই আমাকে প্রায় সব সময়ই ক্যাম্পে থাকিতে হইতো। এমনও অবস্থা হইয়াছে, সারাদিনে খাইতে যাওয়ার সময় পর্য্যন্ত জোটে নাই। এ-ভাবে বেশীদিন চলা অসম্ভব। নৃপেনকে আসিতে তার করিলাম। নৃপেন তখন ঢাকা ছিলো, তার পাইয়াই আসিলো, আমিও একটু সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলাম। প্রথম রোগীদের স্তালাইন ইন্‌জেক্‌সন দিয়া চিকিৎসা করিতাম। কিন্তু রোগীর সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলায়, প্রতিকারের চেয়ে প্রতিষেধের দিকেই বেশী নজর দিলাম। তখন কলেরার প্রতিষেধক ওষুধ পাওয়া এখনকার মতো এতো সহজ

ছিলো না, একমাত্র গভর্ণমেণ্ট ল্যাবোরেটরীতেই পাওয়া যাইতো। বিশপ ওয়ালশকে এ-কথা বলা মাত্র তিনি সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগে এই ওষুধের জন্য তার করিলেন। যথা সময়ে ওষুধ আসিলো। আমি ও নৃপেন দিনরাত ইন্‌জেকসান দিতে লাগিলাম। তিন চারদিনের মধ্যেই তিন চার হাজার লোককে ইন্‌জেকসান দেওয়া হইলো। ফলে কলেরারও প্রকোপ-কমিলো।

আমজাদ আকণের তিন চারটি গুদাম ঘরে তিন চার হাজার লোক অতি কষ্টে ঠাসাঠাসি করিয়া থাকিতো। বর্ষাকাল। বাইরে জলকাদা। তাই ঘরেই এদের রান্না করিতে হইতো। ফলে ঘর ধোঁয়ায় ভরিয়া যাইতো, কুলীদের অত্যন্ত কষ্ট হইতো। আমজাদ আকণের গুদামের উত্তরে নদীর ঠিক পাড়ে মার্কেন্‌টাইল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার প্রকাণ্ড বড় গুদাম। সে গুদামটি পাইলে খুব সুবিধা হয় এই কথা বলা মাত্র বিশপ ওয়ালশ ঐ ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষের কাছে জরুরী তার করিলেন। প্রত্যুত্তরে ঐ গুদাম ব্যবহারের অনুমতি আসিলো কুলীদের দুঃখের অনেকখানি লাঘব হইলো।

এসময় দেশবন্ধু দাশও গোয়ালন্দ হইতে নৌকাযোগে চাঁদপুর আসিলেন। আসিয়াই ধর্ম্মঘট চালানোর ঔচিত্য সম্বন্ধে আমাদের সাথে পরামর্শ করিলেন। বাইরের লোকদের ধর্ম্মঘটীদের স্থানে কাজে যোগ না দেওয়ার উপরই ধর্ম্মঘটের সফলতা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। বাইরের কোন লোক ধর্ম্মঘটীদের কাজে যোগ দিবে কি না সে সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া

পড়িলেন। রেভারেণ্ড এণ্ড্রুজ তখন চাঁদপুর ছিলেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে তিনি অনেক ধর্ম্মঘট চালাইয়াছেন। সুতরাং ধর্ম্মঘট সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতা খুব বেশী। সেই অভিজ্ঞতার শক্ত ভূমির উপর সজোড়ে দাঁড়াইয়া তেজের সহিত তিনি বলিলেন—অনেক হরতালের অভিজ্ঞতা আমার আছে, এ-হরতাল কিছুতেই সফল হতে পারে না, সুতরাং ধর্ম্মঘটীদের বিনা বিলম্বে কাজে যোগ দেওয়া উচিত। এণ্ড্রুজের এই কথা শুনিয়া দেশবন্ধুর চিন্তা আরো বাড়িলো। তিনি একদিন আমায় নিভৃতে ডাকিয়া এ-সম্বন্ধে আমার মত জানিতে চাহিলেন। স্বাধীনতার এই দেশ-ব্যাপী সংগ্রামে কেউ যে বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারে, এ-কথার তখন আমার প্রাণে স্থান পাওয়াও কঠিন। তাই নিঃসঙ্কোচে আমি তাঁহাকে বলিলাম—দেশের এ-অবস্থায় কেউ যে এদের চাকরি নিবে এ আমি বিশ্বাস করি না। ইনি আমার মুখ পানে অতি গম্ভীর ভাবে খাণিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—আপনি সত্যি মনে করেন কেউ যোগ দিবে না? আমি বলিলাম—হাঁ, কেউ যে এতো নীচ হবে, তা আমি কল্পনাও করতে পারি না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এর দু-চার দিনের মধ্যেই সংবাদ আসিলো নোয়াখালী হইতে শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা চাটগাঁ গিয়া এই সব চাক্‌রির প্রার্থী হইয়াছে। অন্ন সমস্যা বড় সমস্যা বটে, কিন্তু দেশের স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা অন্ন সমস্যার চেয়েও প্রাণে প্রবল না হইলে, কোনও জাতির পক্ষে স্বাধীনতা লাভ কিংবা স্বাধীনতা রক্ষা অতি কঠিন।

ধর্ম্মঘটীদের অবস্থা ক্রমশঃই শোচনীয় হইয়া উঠে। রেলের

কোয়ার্টার হইতে তাদের চলিয়া যাইতে বলা হয়। তারাও ষ্টেশন ছাড়িয়া সহরের নানা স্থানে আশ্রয় লয়। এদের খাওয়ানোর সমস্যাই এখন প্রবল হইয়া উঠিলো। টাকার জন্য আবেদন করা হইলো। অনেক টাকাও আসিলো। কিন্তু এতো লোকের খরচ চালানো তো সহজ কথা নয়। আমাদের চাঁদপুরের বাসার বৈঠক খানার ঘরে বসিয়া দাশ মহাশয় এ সম্বন্ধে আমাদের সাথে আলাপ করিতেছেন, এমন সময় সাইকেল ডাক যোগে সেনগুপ্তের চিঠি আসিলো—পঞ্চাশ হাজার টাকা চাই। তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারে তখন প্রায় দুই তিন লক্ষ টাকা জমিয়াছিল। সেই টাকা হইতেই এই পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে আমি দাশ মহাশয়কে অনুরোধ করিলাম। দাশ মহাশয়ও রাজী হইলেন।

ধর্ম্মঘটের জন্য তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারের টাকা খরচ হইতেছে, এ-সংবাদ কলিকাতা পৌছা মাত্র, সেখানকার কোন কোন নেতা উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। জাতীয়তাবাদী ইংরেজী কাগজ সমূহের মধ্যে সার্ভ্যাণ্টই (servant) তখন সব চেয়ে অধিক প্রভাবশালী। শ্রীযুক্ত শ্যাম সুন্দর চক্রবর্ত্তী ইহার সম্পাদক। দাশ মহাশয়ের এ-কাজের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া তিনি তার কাগজে মন্তব্য প্রকাশ করেন। বাইরের লোকের কাজে যোগ দেওয়ায় ধর্ম্মঘটের মেরুদণ্ড আগেই অনেকটা দুর্ব্বল হইয়াছিলো, কংগ্রেস ক্যাম্পে এই মতদ্বৈধে ইহা এখন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। এই রেলওয়ে ধর্ম্মঘট অসহযোগ আন্দোলনেরই একটি অংশ। তাই তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারের টাকা এ-বাবদ খরচ

করায় কোন অন্যায় হইয়াছে বলিয়া আমি তখনও মনে করি নাই, এখনও করি না। অসহযোগের পথেই ভারতের স্বাধীনতা আসিবে এবং শেষ সংগ্রামের সময় সারা ভারতময় এরূপ ধর্ম্মঘট হইবে। আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ধর্ম্মঘট গোয়ালন্দ ও বরিশাল অবধি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সকলে মিলিয়া চেষ্টা করিলে ইহাকে ই, বি, আর ; বি, এন, আর ; ই, আই, আর প্রভৃতি রেলপথে প্রসারিত করা যাইতো বলিয়াই আমার বিশ্বাস। এ-ভাবে ইহা হয়তো সারা ভারতে ছড়াইয়া পড়িতো এবং সাথে সাথে আনুষঙ্গিক আরো বহু জিনিষ আসিয়া জুটিত। তখন ভারতের অবস্থা যে কি হইত কে বলিতে পারে?

কুলীদের মাঝে কলেরা অনেকটা কমিয়া আসিলো। এ-ব্যামোতে শিশু ছেলে-মেয়ে রাখিয়া অনেক কুলী মেয়ে মরিয়াছে। এই ছেলেমেয়েদের লইয়া মুস্কিলে পড়িলাম, এদের রাখি কোথায়? সহরে জানাশোনা অনেক মহিলা ছিলো। এদের পালনের ভার তাদের লইতে বলিলাম কিন্তু কেউ রাজী হইলো না। নারী জাগরণ ভারতে তখনও ভালভাবে আরম্ভ হয় নাই। আমার এ-অসুবিধার কথা শুনিয়া, মিষ্টার গ্রোভ আসিয়া বলিলেন তার স্ত্রী এই শিশুদের ভার নিতে রাজী আছেন। আমি বলিলাম—আমি তার হাতে এদের সঁপে দিতে পারি যদি ইনি এদের খৃষ্টান না করেন এবং রিলিফ-শেষে আমায় ফিরিয়ে দেন। মিসেস গ্রোভ ইহাতেই রাজী হইলেন। ফলে তেরটি ছেলেমেয়ের ভার আমি তাকে সঁপিয়া দিলাম। তিনি এসব নোংড়া শিশুদের দু-এক দিনের মধ্যেই

ঘসিয়া মাজিয়া সাফ করিয়া এবং পরিষ্কার কাপড় পড়াইয়া সুন্দর করিয়া তুলিলেন। আমি মাঝে মাঝে এদের দেখিতে যাইতাম। দেখিয়া আনন্দ হইতো। ভক্তি ও শ্রদ্ধায় মিসেস গ্রোভের পায়ের তলায় মাথা নুইয়া পড়িতো—ভাবিতাম, এরূপ না হইলে কি একটা জাতি এতো বড় হইতে পারে? কুলীদের আর আমি চাঁদপুর আটকাইয়া রাখা যুক্তিযুক্ত মনে করিলাম না। ষ্টীমার তখনো চলিতে আরম্ভ করে নাই। তাই এদের দলে দলে নৌকায় গোয়ালন্দ পাঠাইতে লাগিলাম। এভাবে এক এক নৌকায় দশ পনর জন করিয়া পাঠাইতে দেরী হইতে লাগিলো। কলিকাতা হইতে মিষ্টার এস, আর, দাশ, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কুমার মিত্র প্রভৃতি মিলিয়া এদের গোয়ালন্দ নেওয়ার জন্য একে একে দুখানা ষ্টীমার পাঠাইলেন। প্রথম ষ্টীমারের ডাক্তার রূপে নৃপেন চলিয়া যায়, দ্বিতীয় ষ্টীমারে বাদ বাকী সব কুলী পাঠানো হয়।

এখন বাকী রহিলো শুধু পিতৃ-মাতৃহারা তেরটি অনাথ শিশু। এদের লইয়া চাঁদপুরে আমি একটি অনাথ আলয় খুলি। শৈশব হইতে এরূপ অনেক শিশুকে চাঁদপুরে আমি খৃষ্টান হইতে দেখিয়াছি। ফলে এরূপ একটি অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা বহুদিন হইতেই ছিলো। ইচ্ছা হইলো এই অর্ফেনেজটিকে ভিত্তি করিয়াই একটি স্থায়ী অনাথ আশ্রম গড়িয়া তুলি কিন্তু তখন দেশ ব্যাপী তুমুল আন্দোলন চলিতেছে, অরাজনৈতিক কাজে আটকিয়া থাকিতে মন চাহিলো না। তাই এদের কলিকাতা লইয়া যাওয়া ঠিক করিলাম। দশটি

শশু সহ আমি ও আশুবাবু বরিশালের পথে কলিকাতা রওনা হইলাম। গোয়ালন্দের ষ্টীমার তখনও চলে না। তিনটি শিশু অসুস্থ ছিলো, তাই গ্রোভ সাহেবের কাছে তাদের রাখিয়া গেলাম। কিছু দিন পরেই আমার জেল হয়। জেলে গ্রোভ সাহেবের এক পত্র পাই—শিশু তিনটি সুস্থ হয়েছে, আমার পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে আমি এদের রাখতে পারি না, অনুগ্রহ করে এদের অন্যত্র নেওয়ার ব্যবস্থা করুন। হরদয়াল বাবুকে পত্র দিলাম—কোন ফল ফলিলোনা। শিশু তিনটি এখন খৃষ্টান হইয়া বড় হইয়াছে।

বি, পি, সি, সি-র মিটিং

কলিকাতা পৌঁছিয়াই শুনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির নব নির্ব্বাচিত সভ্যদের সাধারণ সভা। বি, পি, সি, সি-র মিটিং এর আগে কখনও দেখি নাই। দেখিতে ইচ্ছা হইলো, গেলাম। প্রথমেই অতিরিক্ত সভ্য নির্ব্বাচন (কো-অপসন্) অরম্ভ হইলো। প্রতি জেলা হইতে এক এক জন নির্ব্বাচিত হইবে। ফরিদপুর জেলা হইতে আমার নাম প্রস্তাবিত হইলো। আমার বিরুদ্ধে খাড়া করা হইলো প্রতাপ চন্দ্র গুহ রায়কে। দাশ মহাশয় আমার চাঁদপুরের কাজের প্রশংসা করিয়া কয়েকটি কথা বলায়, আমার দিকেই বেশী হাত উঠিলো। ঢাকা হইতে পুলিন দাসকে হারাইয়া প্রফুল্ল নির্ব্বাচিত হইলো। অতিরিক্ত সভ্যদের নির্ব্বাচনের পর, বীরেন শাসমল বিনা বাধায় সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইলেন। এরপর

প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচনের পালা। দাস মহাশয় এ পদের জন্য শ্যামবাবুর নাম প্রস্তাব করিলেন। দাশ মহাশয়ের এ প্রস্তাব যে মনের স্বাভাবিক অবস্থা হইতে উদ্ভূত নহে, এর পিছনে যে অনেক মান অভিমান আছে, এবং চাঁদপুরের হরতাল সম্বন্ধে শ্যাম বাবুর এড্ভান্সে লেখা মন্তব্যই যে এই মান অভিমানের কারণ, তা বুঝিতে উপস্থিত সভ্যদের এক মিনিটও দেরী হইলো না। আগতপ্রায় ঝড়ের আশঙ্কায় সকলের প্রাণই উদ্বিগ্ন, এমন সময় শ্যামবাবু দাঁড়াইয়া, বাব্‌ড়ির মতো কাঁধ অবধি ঝোলা চুল দু হাতে ধরিয়া টানিতে টানিতে, চোখ রাঙ্গাইয়া সজোড়ে কয়েকটি কথা বলিয়া, সভা ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। ফলে সভাগৃহের বায়ুমণ্ডল ঝড়ের আগেকার আকাশের মত থম থম করিতে লাগিলো। এরপর দেশবন্ধুকে সভাপতি হওয়ার জন্য অনেক সাধ্য সাধনা করা গেল কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজী হইলেন না। বলিলেন—আগে কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হোক্, পরে দেখা যাবে। সভ্যদের দ্বারা নির্ব্বাচিত ষাট জন মেম্বার লইয়া কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইবে। সকলেই বুঝিল, দেশবন্ধুর মনমতো ৬০ জন সভ্য না হইলে, তিনি সভাপতি হইবেন না। তিনি সভাপতি হইতে রাজী না হওয়ায় আমি চোখের সামনে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। মনে হইলো পৃথিবী যেন পায়ের তলা হইতে সরিয়া যাইতেছে।

পর দিন সকালে আমি ও প্রফুল্ল দেশবন্ধুর বাড়ী গেলাম। সেখানে নানা জেলার বহু নেতা উপস্থিত। তাদের সকলের

সাথে এ সম্বন্ধে আলাপ করিলাম—সকলেই দেশবন্ধুর মন মতো সভ্য নির্ব্বাচনের পক্ষপাতী। ইহার পর সভ্য নির্ব্বাচনের ভার দেশবন্ধুর উপরই ছাড়িয়া দেওয়া হইলো এবং তিনি প্রেসিডেন্ট হইলেন। গোলমাল বাহ্যতঃ মিটিলো বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে রহিয়াই গেলো। এ দলাদলি বাংলার রাজ-নীতি ক্ষেত্রে আজও আছে।

সেদিন দুপুরে দেশবন্ধুর বাড়ীতেই খাইলাম। দেশবন্ধু তখন প্র্যাক্‌টিস করেন না। তাহার জমা কোন টাকা-ও নাই—বরং কয়েক লক্ষ টাকা কর্জ্জ আছে। তবু পঁচিশ-ত্রিশ খানা পাত পড়িলো। এদের সকলের জন্যই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পোলাও মাংসের ব্যবস্থা। আমি তো একেবারে অবাক্। দেশবন্ধুর সাথে এ-সম্বন্ধে পরে আলাপ করিয়া দেখিয়াছি, এরূপ খাওয়ানোয়ই তাহার আনন্দ। এ শুধু দেশবন্ধুরই বৈশিষ্ট্য নহে। বাঙ্গালী মাত্রেরই মনোভাব কতকটা এ-ধরণের। এরূপ বেপরোয়াভাবে টাকা খরচ করা যুক্তি-যুক্ত কি না, এ সম্বন্ধে অনেক ভাবিয়াছি। কিন্তু কোন কূল কিনারা পাই নাই। মহাত্মাজীর মতো প্রত্যেকটি পয়সা হিসাব করিয়া খরচ করাই বিধেয়, না দেশবন্ধুর মতো দরাজ প্রাণে কাল কি হইবে না ভাবিয়া খরচ করিয়া যাওয়া ভাল—এ আজ-ও আমার কাছে একটি সমস্যা। যুক্তি যতো দ্বিধাই প্রাণে জাগাক না কেন, প্রাণ স্বতঃই লুটাইয়া পড়ে দেশবন্ধুর ভাবনাহীন চিত্ততলে।

নড়িয়া

কলিকাতা হইতে নড়িয়া যাই। আন্দোলনের ব্যাপকতা ও গভীরতার সাথে সেখানে নূতন পরিচয় ঘটে। মালিকান্দায় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় খুব কম, কাজেই সেখানে স্থানীয় ভলানটীয়ার পাওয়া খুব শক্ত। কিন্তু এ-অঞ্চল স্কুল বহুল, প্রতি দু-তিন মাইল অন্তরই একটি স্কুল। আন্দোলনের ফলে অনেক ছেলেই স্কুল ছাড়িয়া কাজে লাগিয়াছে। তাই প্রায় প্রতিগ্রামেই বড় বড় ভলান্‌টীয়ার বাহিনী। মুসলমানেরাও এখানে বিশেষ অগ্রণী। মুসলমানদের মধ্যে তিনজনই প্রধান—একিম বক্স, আহেদবক্স, কিফাতালী। আমার গ্রামে পৌঁছা মাত্র এদের উৎসাহ আরো বাড়িলো এবং এরা আরো জোরে আমার সাথে কাজে লাগিয়া গেলো। এখানে আমার কাজ ছিলো তিনটি। প্রথমতঃ—চাঁদা তোলা। কোনো কাজের জন্য গ্রামে সাধারণতঃ চাঁদা আদায় করা খুব কঠিন। লোকের যে টাকা নাই এমন নহে, টাকা আছে অনেকেরই, বাজে কাজে খরচও হয় যথেষ্ট, কিন্তু এ... কাজে দিতে এদের প্রাণ যেন ছিড়িয়া যায়। তবুও এবার অপেক্ষাকৃত সহজে কিছু বেশী টাকা আদায় হইলো। দ্বিতীয় কাজ—কংগ্রেসের সভ্য করা। প্রায় বাড়ীরই একজন করিয়া সভ্য হইলো। ধনী, গরীব এতে কারো বড় বিশেষ আপত্তি দেখি নাই, বরং বেশীর ভাগই সভ্য হইয়াছে স্বেচ্ছায়, উৎসাহের সাথে। দুপুর রাতে ঘুম ভাঙ্গাইয়া বিছানা হইতে টানিয়া তুলিয়াও সভ্য করা হইয়াছে, তবু-ও কারো মুখে কোন বিরক্তির

লক্ষণ দেখা যায় নাই। মাদবরদের বাড়ী গেলেই তারা জিজ্ঞাসা করিতো—বাবু, ট্যাক্স বন্ধ হবে কবে? হুকুম তো এখনও আসে নাই—আমার এ-জবাব শুনিয়া তাহারা বলিতো —শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর আসবে তো? কৃষক, শ্রমিক, সকলের প্রাণেই অদ্ভুত সাড়া, সকলেই উৎসুক স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য। তৃতীয় কাজ—প্রচার। প্রায় প্রতি বিকালেই কোথায় না কোথায় সভা হইতো। হাট, বাজার, মন্দির, মসজিদ—কোন জায়গা বাদ পড়িতো না। শুক্রবারের নমাজের পর মসজিদে গিয়া পর্য্যন্ত মুসলমানদের স্বরাজমন্ত্রে দিক্ষীত করিতাম। মসজিদে এই সব সভার বন্দোবস্ত মুসলমানেরাই করিতো। তাহারাই নৌকা করিয়া আমাদের লইয়া যাইতো। হিন্দু মুসলমানের সমবেত এতো ব্যাপক আন্দোলন ভারতে আর কখনো হইয়াছে কিনা সন্দেহ।

নড়িয়া অঞ্চলের হিন্দু কর্ম্মীদের মধ্যে শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ রায় ঘটক চৌধুরীর নামই বিশেষ করিয়া মনে আসে। ইনি পূর্ব্বে উল্লিখিত হরিপ্রসাদ বাবুর বড় ছেলে। চিন্তাহরণ বাবুকে ছোট-কাল হইতেই আমরা শ্রদ্ধার চোখে দেখিতাম। ইহার গুণও ছিল অনেক। ইনি বহু ভাষা জানিতেন, ভাল বাংলা লিখিতে পারিতেন, সীন্‌ আঁকিতেন, গান রচনা করিতেন, গ্রামের অনেক নাটকে সুখ্যাতির সহিত অভিনয়ও করিয়াছেন। গ্রামেই এর জীবনের বেশীর ভাগ সময় কাটিয়াছে। ফলে নিজের স্বাভাবিক প্রতিভার বিকাশের সুযোগ পান নাই। তাই এতো গুণ থাকা সত্ত্বেও কোন ক্ষেত্রেই স্থায়ী কীর্ত্তি অর্জ্জন তার পক্ষে

সম্ভব হয় নাই। এর কথা মনে হইলে এ-কথাটি সজোড়ে পুনঃ পুনঃ মনে আসে—সুযোগের অভাবে কতো মুকুলই না অবিকশিত অবস্থায় শুকাইয়া ঝড়িয়া পড়ে।

গ্রামে কংগ্রেসের কাজে ইনি প্রায় সব সময়ই আমার সাথে থাকিতেন। শ্রাবণ মাস। বৃষ্টি প্রায় লাগিয়াই আছে। চারিদিক জলে ডোবা। গ্রামের কাঁচা পিছল পথ অনেক জায়গায় ভাঙ্গা, উঁচুনীচু—মাঝে মাঝে পাশের মান্দার গাছ হইতে পড়া কাটায় ভরা। তারই উপর দিয়া চলিয়া অনেক দিন রাত দশটা এগারটা অবধি কংগ্রেসের মেম্বার করার উদ্দেশ্যে বাড়ী বাড়ী ঘুরিতে হইতো। চিন্তাহরণ বাবু বৈষ্ণব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। কিছু কিছু গাহিতেও পারিতেন। অন্ধকার রাতে এরূপ কণ্টকাকীর্ণ পিছল পথে চলিতে চলিতে তিনি অনেক সময় গান ধরিতেন—

হইলে আঁধার রাতি
অঙ্গণেতে কাঁটপাতি
করিতাম আনাগোণা
আমায় যে যেতে হবে।
অঙ্গণে ঢালিয়া জল
করি তা অতি পিছল
করিতাম আনাগোণা
আমায় যে যেতে হবে।

আমার নড়িয়া যাওয়ার অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই একিম বক্সকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। সে এ-পথে নূতন ব্রতী। সংসারী লোক। গ্রেপ্তারের পর বণ্ড দিতে বাধ্য করার জন্য

নানারকমের পুলিশ জুলুমও তাহার উপরে চলে। তাই তাকে নিজে গিয়া মাদারীপুর পৌঁছাইয়া দিয়া আসি। বিচারে তার ছয় মাস জেল হয়। এর পর আহেদ বক্সও এক বছরের জন্য জেলে যায়। একিম ও আহেদ উভয়েই পূর্ণ দণ্ড ভোগ করে। ইহাদের কারাদণ্ডের পর মুসলমানদের মধ্যে অপূর্ব্ব সাড়া পড়ে। তাহারা দলে দলে জেলে যাওয়ার জন্য আগাইয়া আসে। গভর্ণমেণ্ট এই গণ-আগ্রহকে দাবানোর জন্য লম্বা শাস্তির ব্যবস্থা করে। তাই ইহার পর অনেকেরই দুই বছর আড়াই বছরের জেল হয়। এতোদিন জেলে থাকা অসম্ভব মনে করিয়া ইহাদের অনেকেই বণ্ড দিয়া জেল হইতে বাহির হইয়া আসে।

একদিন একটি সভা উপলক্ষে আমি পালং যাই। আমাদের গ্রাম চিকন্দী মহকুমার অন্তর্গত। চিকন্দী সরকারী মহকুমা নহে—কংগ্রেস মহকুমা। তখন পালং ছিলো এই কংগ্রেস মহকুমার প্রধান কেন্দ্র—প্রভাস বসু সম্পাদক। পালং গিয়া দেখি প্রকাণ্ড বড় বাড়ীতে কংগ্রেস-আফিস ও ক্যাম্প। ভাঁড়ার স্থানীয় বাজার হইতে তোলা নানারকম খাদ্যদ্রব্যে ভরা। আপিস নানা গৃহ ও বিভাগে বিভক্ত। ভলান্টীয়ারে সারা বাড়ীটা কিল্ কিল্ করিতেছে। বিকালে কংগ্রেস আফিসের সম্মুখের প্রাঙ্গণে ভলান্টীয়ারদের একটি সভা হয়। মহকুমার বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে আসা প্রায় পাঁচ শ ভলান্টীয়ার সে সভায় উপস্থিত ছিলো। সকলের অনুরোধে কংগ্রেসের ক্রীড্ সম্বন্ধে এদের কাছে আমায় কিছু বলিতে হয়। এই বক্তৃতার ফলেই পরে ফরিদপুরে আমি গ্রেপ্তার হই।

এর কিছুদিন পর ফরিদপুর যাই। গিয়া দেখি ফরিদপুরে কংগ্রেসের বাৎসরিক সভা। সভায় মৌলবী তমিজ উদ্দিন সাহেব জেলা কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। তমিজ উদ্দিন সাহেব আমার পুরাতন বন্ধু। আমরা উভয়ে একই সময়ে কুচবিহার কলেজে পড়িয়াছি। সভার পরই তিনি একবার সারা জেলাটা ঘোরা ঠিক করিলেন। আমায়ও সাথে যাইতে বলিলেন। আমি রাজী হইলাম।

শান্তিসেনা।

প্রথম যাই ভাঙ্গা। সেখানে গিয়া দেখি শান্তিসেনার বিরাট ক্যাম্প। ক্যাম্পের অধ্যক্ষ যতীন ভট্টাচার্য্য সংগঠনে অতি নিপুণ শক্তিশালী কর্ম্মী। আমি ও মৌলবী সাহেব ক্যাম্পের কাজ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম। ক্যাম্পের নিয়ম অতি কঠোর। সামান্য অপরাধেও স্বয়ং সেবকদের কঠিন শাস্তি পাইতে হয়। ক্যাম্পের যাবতীয় ব্যবস্থায় মোটের উপর সুখীই হইলাম। ভাঙ্গা হইতে যাই গোপালগঞ্জ। সেখানেও শান্তিসেনার একটি সুনিয়ন্ত্রিত ক্যাম্প ছিলো—অধ্যক্ষ বামণ চক্রবর্ত্তী। শান্তিসেনা বাহিনী ষ্টেশনে আমাদের মিলিটারী কায়দায় অভ্যর্থনা করে। গোপালগঞ্জ নমঃশূদ্র প্রধান। সেখানে শুনিলাম খৃষ্টান মিশনারীদের প্রচারের ফলে নমঃশূদ্রদের বেশীরভাগই এই আন্দোলনের বিরোধী। সেখানকার খৃষ্টান মিশনারীদের মধ্যে ডাক্তার মিডের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গোপালগঞ্জের নমঃশূদ্রদের কেন্দ্রস্থল ওড়াকান্দি। সেখানে ডাক্তার মিড্ মিশন প্রতিষ্ঠা

করিয়া প্রায় চল্লিশ বৎসর যাবৎ নমঃশূদ্রদের সেবা করিতেছেন। ফলে তাদের অনেকেই তার অনুগত। এ সব শুনিয়া আমারও ইচ্ছা হইলো অবিলম্বে গোপালগঞ্জে একটি আশ্রম খোলার। স্থানীয় নেতাদের সাথে এ সম্বন্ধে আলাপও করিলাম। দেখিলাম তারা সকলেই একাজে উৎসাহী। তাদের সাথে সঙ্কল্পিত আশ্রমের জন্য একটি জায়গাও খুঁজিলাম। পছন্দসই জায়গাও জুটিলো। হিসাব করিয়া দেখা গেল, জায়গার দাম সমেত আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথমেই প্রায় বার হাজার টাকা দরকার।

মাদারীপুরের ষ্টীমারে চলিতে চলিতে দেখি প্রতি ষ্টেশনেই শান্তিসেনার সেবকেরা বাক্স হাতে চাঁদা আদায়ে ব্যস্ত। ষ্টীমার ষ্টেশনে পৌঁছামাত্রই বন্দেমাতরম্ ধ্বনিদ্বারা ইহারা যাত্রীদের উৎসাহিত করে। পরে বাক্সে যে যা দেয় সানন্দে নেয়। হিসাব করিয়া দেখিলাম এভাবে প্রতিদিন কম আদায় হয় না। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাস এই শান্তিসেনা বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সেনাপতি।

ফরিদপুর ফিরার অল্প পরেই মৌলবী সাহেবের সাথে কলিকাতা যাই। মহাত্মাজী তখন সেখানে ছিলেন। মহাত্মাজীর সাথে মৌলবী সাহেবের পরিচয় নাই, পরিচয় করাইয়া দিতে হইবে। এ-উদ্দেশ্যেই এবার বিশেষভাবে কলিকাতা যাওয়া। দু-জনে এক সাথেই মহাত্মাজীর কাছে গেলাম। মহাত্মাজী দেশবন্ধুর বাড়ীতে ছিলেন। আমি নমঃশূদ্রদের কথা তুলিলাম এবং বলিলাম সামাজিক মিলন ছাড়া কংগ্রেসের দিকে তাদের টানা অসম্ভব। আমার কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন—You will

have to bridge up the gulf between the two Communities by eating at the same time in the house of Brahmins and of the Namasudras. গোপালগঞ্জে আশ্রম স্থাপনের কথাও উঠিলো। একথা শুনিয়া তিনি খুবই উৎসাহিত হইলেন এবং প্রথম নিজেই বার হাজার টাকা দিতে রাজী হইলেন। পরে একটু ভাবিয়া বলিলেন —দেশবন্ধু বাংলার নেতা, তার কাছেই প্রথম এ-টাকাটা চাওয়া উচিত, তিনি না দিলে আমি নিশ্চয়ই দিব। দেশবন্ধু তখন বাড়ীতেই ছিলেন, তাকে একথা বলিলাম। নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র তখন কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষ। ফোনে তার সাথে আলাপ করিয়া তিনি এ-টাকা দিতে রাজী হইলেন। দু-শ টাকা তখনই দিলেন এবং ঠিক হইলো গোপালগঞ্জ গিয়া সব ঠিক করিয়া ফিরিয়া আসিলেই বাকী টাকা পাইব।

পীর বাদশাহ মিঞা

গোপালগঞ্জ যাওয়ার পথে ফরিদপুর পৌছিলাম। পৌছিয়াই শুনি পীর বাদশা মিঞা গ্রেপ্তার হইয়াছেন এবং ফরিদপুর জেলে আছেন। সহরে ইহা লইয়া বিশেষ হুলস্থূল ও উত্তেজনা চলিতেছে। পীর সাহেবের বাড়ী ফরিদপুর জেলায়। তিনি প্রায় ষাটলক্ষ মুসলমানের ধর্ম্মগুরু। সেদিন বিকালে ফরিদপুর সহরে এ-সম্বন্ধে বিরাট সভা হয়। সভায় আমাকে সভাপতি করা হইলো। মৌলবী সাহেব বিরাট জনতার সম্মুখে বিদেশী বস্ত্রে তৈরী নিজের উকীলের পোষাক, চাপকান, গাউন

প্রভৃতি পোড়েন। বিপুল উৎসাহের মাঝে সভার কাজ শেষ হয়।

পরদিন সকালে আমি ও মৌলবী সাহেব পীর সাহেবের সাথে দেখা করিতে জেল-গেটে যাই। পীরসাহেবকে আগে কখনো দেখি নাই। এই প্রথম দেখা। তার সুন্দর মূর্ত্তিখানি দেখিয়া আমার প্রাণ মুগ্ধ হইলো। তখনই অন্তর-প্রাণে ভগবানকে ডাকিয়া বলিলাম—প্রভু, আজই যেন আমার জেল হয়। এই প্রার্থনা অহেতুক নয়। এর কারণও আছে। ফরিদপুর পৌঁছিয়াই শুনি খান বাহাদুর প্রভৃতি পুনঃ পুনঃ জেলে গিয়া খেতাব, জায়গীর প্রভৃতির লোভ দেখাইয়া পীরসাহেবকে মুচলেকা দিয়া বাহিতে আসিতে পীড়াপীড়ি করিতেছেন। শুনিয়া প্রাণটা যেন কেমন করিয়া উঠিলো। ভাবিলাম, ইনি এরূপ হীনতা স্বীকার করিয়া বাহির হইয়া আসিলে, এ-জেলার আন্দোলনের মেরুদণ্ডই ভাঙ্গিয়া যাইবে। সে-দিন দুপুরে এক বাসায় খাওয়ার নিমন্ত্রণ ছিলো। খাইতে বসিয়া শুনি পুলিশ আমার খোঁজ করিতেছে। আহার শেষে গিয়া দেখি—কয়েক জন কনেষ্টবল সহ দারোগা হাজির। গ্রেপ্তারের পরোয়ানা হাতে দিয়া অতি বিনীত ভাবে নমস্কার করিয়া দারোগা সাহেব বলিলেন—চাকরির খাতিরে সবই করতে হয়, মাপ করবেন।

ফরিদপুর জেল

সন্ধ্যার ঠিক্ প্রাক্কালে জেলের এক নিভৃত সেলে আশ্রয় মিলিলো। জেলে কর্তৃত্ব করা ও থাকা এক নয়। তাই কিছুকাল

জেলের সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্টের কাজ করা সত্ত্বেও জেলের সত্যিকার অবস্থার সাথে পরিচয় ঘটে নাই—সব কিছুরই জ্ঞান আছে, কিন্তু ভাসা ভাসা। বহুদিন অবধি রাত্রে দু-তিনবার জল খাইতে হয়। রাত্রে জল খাইয়া দেখি—কষাটে। পরদিন সকালে উঠিয়া দেখি জল লাল—লোহার পাত্রটি মরচে পড়া। জেলের সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট নৃপেন বসুর সাথে আগে হইতেই বিশেষ পরিচয় ছিলো। পীরসাহেবের সাথে এক ঘরে থাকা সম্ভব কিনা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—নিশ্চয়ই। সে-দিন বিকালেই পীর সাহেবের ঘরে আমায় সরানো হইলো। অল্প আলাপের ফলেই তাহার সাথে আমার ভাব জমিয়া উঠিলো। তিনি অতি সাদাসিধে মানুষ। মন অতি খোলাসা-তাতে কোন ঘোর প্যাচ নাই। তিনি রীতিমত পাঁচবার নমাজ ও কোরাণ পড়িতেন। আমিও তাঁর সাথে সাথে দিনে পাঁচ বার গায়ত্রী জপিতে ও গীতা পড়িতে লাগিলাম। ফলে ভাব আরো জমিলো। তাহার মুচলেকা দেওয়া সম্বন্ধে বাহিরে শোনা গুজবের কথা লইয়াও সামান্য আলোচনা হইলো বটে কিন্তু তখন তার বিশেষ প্রয়োজন ছিলো না—একত্র থাকার ফলে তাহার মন আপনা আপনিই দৃঢ় হইয়া উঠিলো। বিচারে তাহার এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। দণ্ডদানের পরদিনই তাহাকে জাঁতায় আধমন ডাল ভাঙ্গিতে দেওয়া হইলো। তিনি ভাঙ্গিলেনও। জেল কর্ত্তৃপক্ষ আমায় বলিলো—আপনার শরীর যেরূপ সুস্থ ও সবল, আপনাকে বোধ হয় ঘানি দিবে। এ-সব ব্যাপারে জেল কর্ত্তৃপক্ষের কোন হাত ছিলো না—ম্যাজিষ্ট্রেট্

নিজেই কাকে কি কাজ দিতে হইবে লিখিয়া পাঠাইতেন। ঘাণি ঘুরাইতে রাজি না হইলে মেথরের কাজ করিতে হয়—একথাও জেল কর্ত্তৃপক্ষের কাছে শুনিলাম। ঘাণি ঘুরানো অসম্ভব ভাবিয়া মেথরের কাজ শিখিতে লাগিলাম। জেলে গেলে সব কাজই করিতে হইবে—এ-ই ছিলো তখন আমাদের ধারণা।

বিচারে আমারো এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হইলো। কোর্টে প্রফুল্লর সাথে দেখা—আমার বিচার উপলক্ষে সে ঢাকা হইতে ফরিদপুর আসিয়াছে। ঠিক সন্ধ্যার সময় কোর্ট হইতে জেলে ফিরি। ফিরার পরই জাঙ্গিয়া, কুর্ত্তা, ও গলায় লোহার হাসলী পরিতে হইলো। হাসলী পরার প্রথা তখন ছিলো—ইহার সাথেই টিকেট ঝুলানো থাকিতো। তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করানোর পর জেলার সাহেব বলিলেন—আজি আপনাদের কল্‌কাতা যেতে হবে। গাড়ী ছাড়ে রাত নয়টায়। ইহার পরই পীরসাহেবের বাঁ হাত ও আমার ডানহাত মিলাইয়া কড়া লাগানো হইলো। জেলের ফাটক পার হওয়ার পরই দেখি আমাদের জন্য তৈরী ঘোড়ার গাড়ীর সমুখে, উপরে ও পিছনে বন্দুকধারী পুলিশ। গাড়ীতে ওঠামাত্রই দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইলো। ষ্টেশনের পথে কিছু দেখিতে পাইলাম না বটে, কিন্তু বুঝিলাম সারা সহর লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে। ষ্টেশনে পৌঁছিয়াই দেখি দারুণ ভীড়। ট্রেণে প্রফুল্লর সাথে আবার দেখা হইলো। তখনও আমাদের হাতে হাতকড়ি। প্রফুল্লকে বলিলাম, হাতকড়ির এ-সংবাদ কাগজে

দিতে, ইহা লইয়া হিন্দু-মুসলমানের মিলন সম্বন্ধে হয়তো আন্দোলন চলিতে পারে। সে সম্মতি জানাইলো। তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—এ-আন্দোলনে স্বরাজ মিলবে কিনা। সে বলিলো—না। শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম। তখন সবে মাত্র অগাষ্টের প্রথম। আন্দোলন পূর্ণ উদ্যমে চলিতেছে। আমাদের চারিদিগের জনতার চোখ-মুখ আশা ও আনন্দের দৃপ্তিতে উজ্জ্বল। তবুও কি জানি কেন মনে হইতো—এ-আন্দোলনেও স্বরাজ লাভ হইবে না, স্বাধীনতা লাভের জন্য আরো অনেক কাঠ কয়লা পোড়া দরকার। তবে ইহাতে দেশ অনেক আগাইয়াছে, আরো আগাইবে, স্বরাজের পথ প্রশস্ত হইবে। এ-ভাব হৃদয়ে বহিয়াই প্রথম অবধি এ আন্দোলন চালাইয়াছি। ভ্রান্ত ধারণা হৃদয়ে পুষিয়া কোন লাভ নাই। বাস্তবকে খোলা চোখে পূর্ণরূপে দেখিতে দেখিতেই সমুখ-পানে অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ-ভাবে চলিলে মনে কখনো অবসাদ আসে না—সারাজীবন পূর্ণ উদ্যমে কাজ করা সম্ভব হয়। পরে শুনিয়াছি আমাদের হাত কড়ির সংবাদ কাগজে বাহির হইয়াছিলো এবং ইহা লইয়া শুধু বাংলায় নয়, বাংলার বাহিরেও নানা স্থানে, তুমুল আন্দোলন চলিয়াছে। এ-সম্বন্ধে আমাদের অঞ্চলে অনেকে কবিতা এবং ছড়াও লিখিয়াছিলো। ইহাদের দু-একটি আমার চোখেও পড়িয়াছে।

ট্রেণে আমাদের জন্য তৃতীয় শ্রেণীর একটি ছোট কামরা রিজার্ভ করা হইয়াছিলো বটে, কিন্তু আমরা দুজন হাতকড়ি আঁটা অবস্থায় সারারাত বসিয়া কাটাইলাম। ঘুমাইলো

পাহাড়ায় নিযুক্ত দু জন ছাড়া বাকী কনেষ্টবলের দল। শেষ রাত্রে নমাজের জন্য হাতকড়ি একবার খোলা হয় বটে কিন্তু নমাজ শেষে তাহা আবার পরান হইলো। সকালে ট্রেণ হইতে নামিয়া হাতকড়ি বাঁধা অবস্থায় ঘোড়ার গাড়ীতে আলীপুর সেণ্ট্রাল জেলে পৌছিলাম।

আলিপুর জেল

জেলে পৌছার অল্প পরেই আফিসে সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট ডাঃ য়্যাসের সাথে দেখা হইলো। ডাঃ য়্যাস্ পূর্ব্বে ফরিদপুরের সিভিল সার্জ্জন ছিলেন। তিনি আমায় জানিতেন। তাই আমার জন্য প্রায় প্রস্তুত হইয়াই বসিয়া ছিলেন। প্রাথমিক আলাপের পর তিনি বলিলেন—If you like, you both can be classed as European prisoners. পীর সাহেব ইংরেজী জানিতেন না। সব কথা আমাকেই বলিতে হইলো। উত্তরে আমি বলিলাম—I am an Indian, why should I be classed as a European—ভারতীয়দের ক্লাশেই আমাদের ভর্ত্তি করে নিন্। ভারতীয় কয়েদীদের তখন শ্রেণী বিভাগ ছিলো না। সকলেরই একরকম পোষাক, কাজ-কর্ম্ম ও খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা ছিলো। আমি ও পীর সাহেব উভয়েই সাধারণ কয়েদী হইলাম।

ষ্টেট্-ওয়ার্ডের দু টি সেলে আমাদের স্থান দেওয়া হইলো। আলিপুর জেলে সব সমেত তিনটি ষ্টেট্ ওয়ার্ড আছে। পিছনের দুটি দোতলা, সামনেরটি একতলা। তিনটি ওয়ার্ডই

আন্দামান ফিরত বৈপ্লবিক কয়েদীতে প্রায় ভরা ছিলো। সামনেরটিতে দুটি সেল খালি ছিলো, তাতেই আমাদের স্থান জুটিলো।

বৈপ্লবিক কয়েদীরা খুব ভদ্র ও সেবাপরায়ণ। আমাদের দেখিয়া আমাদের ওয়ার্ডের বাসিন্দারা খুব খুশী হইলো। নিজেরাই ঘর ঝাড়িয়া, বিছানা পাতিয়া, আমাদের যতোটা সম্ভব সুখ-সুবিধা করিয়া দিলো। আস্তে আস্তে এদের অনেকের সাথেই আলাপ হইলো। দীর্ঘদিন আন্দামানে থাকায়, এদের অনেকের স্বাস্থ্যই ভাল ছিলো না বটে, কিন্তু মুখে হাসি ও প্রাণে আনন্দের অভাব ছিলো না। জেলে এদের অনেকে বই বাঁধা, ছবি আঁকা, চেইন তৈরী প্রভৃতি নানারূপ কাজও শিখিয়াছিলো।

সাধারণ কয়েদীদের মতো আমাদেরও ধরা বাঁধা নিয়মে দিন কাটাইতে হইতো। ভোর হইতে না হইতেই সার্জেণ্ট আসিয়া দরজা খুলিতো। ইহার পর তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুইয়া, প্রার্থনা ও গীতাপাঠ শেষ করিয়া লপ্‌সী খাওয়ার জন্য তৈরী হইতে হইতো। তারপর ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত চলিতো বাগানের কাজ—৯টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত কম্বলের উপর সারি বাঁধিয়া বসিয়া এন্‌ভেলাপ তৈরী। প্রতিদিন প্রত্যেককে দু-হাজার এন্‌ভেলাপ তৈরী করিতে হইতো। স্নান আহারের পর ১২টার সময় আবার সেলে ঢুকিয়া ১টা পর্য্যন্ত আটক থাকিতে হইতো। এ সময় না ঘুমাইয়া প্রার্থনা করিতাম ও গীতা পড়িতাম। একটা হইতে চারটা পর্য্যন্ত কাটিতো সকালের

মতো এন্‌ভেলাপ তৈরীতে। ৪টার আগে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ এন্‌ভেলাপ তৈরী শেষ হইলেও আসন ছাড়িয়া ওঠার জো ছিলো না। আসনে বসিয়া অবশ্য বই পড়া যাইতো। ৪টার পর খাওয়া দাওয়া ও বেড়ানো শেষ করিয়া সন্ধ্যার সময় আবার সেলে ঢুকিতে হইতো। সেলে বাতির বন্দোবস্ত ছিলো না। কাজেই অন্ধকার গৃহে মশারীহীন অবস্থায় সকলকে মাঝ রাত অবধি বসিয়া মশার কামড় খাইতে হইতো। সৌভাগ্যক্রমে আমার সেলের সামনে বারান্দায় একটি বড় বাতি ছিলো। গরাদের ভিতর দিয়া হাত বাহির করিয়া সেই বাতির সাহায্যে বই পড়া যাইতো। আমি সে-ভাবেই পড়িতাম। এখনকার মতো তখন জেলে বিশেষ কোন বই-এর ব্যবস্থা ছিলো না। আমার সাথে কেবল মাত্র দু-খানা বই ছিলো—নিউ টেষ্টামেণ্ট ও য়্যানী-বেসাণ্টের দু-আনা দামের একখানা গীতা। গীতা দিনে পড়িতাম —বাইবেল রাত্রে। রাত প্রায় এগারটা। গরাদের ভিতর হাত গলাইয়া বই পড়িতেছি, সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট আসিয়া উপস্থিত। রাগের সুরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—What are you doing ? আমি বলিলাম—I am reading the New Testament. তিনি অবাক্ হইয়া খাণিক ভাবিলেন, পরে বলিলেন—Dont you know it is against the jail rule to keep after ten. আমি বলিলাম—জানি, কিন্তু কি কোরব, মশার কামড়ে যে ঘুম আসে না। আরো অনেক কথাবার্ত্তার পর আমি বলিলাম—Can you give me a copy of Old Testament ? পরদিন একটি বাল্‌ব (bulb) ও একখানা Old Testament

২৪

সহ সার্জ্জেণ্ট হাজির। বইখানা আমায় দিয়া, বাল্‌বটি ঘরে লাগাইয়া, সে চলিয়া গেলো।

এ-ভাবে কাটে নভেম্বরের শেষ অবধি। এই দিন গুলির কথা মনে হইলে এখনো প্রাণ আনন্দে ভরিয়া ওঠে। এমন শান্তিপূর্ণ জীবন আর কখনো কাটাই নাই। জেলের এক বৎসর এ-ভাবে কাটাইতে পারিলে খুবই ভাল হইতো কিন্তু তা হইলো না। ১৯২১-এর ১৭ই নভেম্বর প্রিন্স অফ ওয়েলস্ ভারত ভ্রমণ উপলক্ষে জাহাজ হইতে বোম্বাই নামেন। কংগ্রেস পক্ষ হইতে ঐ দিন ভারতের সর্ব্বত্র হরতাল ঘোষণা করা হয়। কলিকাতায় এই দিনের হরতাল এতো সফল হয় যে গভর্ণমেণ্টের তাক্ লাগে। গভর্ণমেণ্ট ভয়ে ১৯শে নভেম্বর বাংলায় ভলান্‌টীয়ার সংগঠন বে-আইনী ঘোষণা করে। গভর্ণমেণ্টের এই আদেশ অমান্য করিয়া দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক কারাবরণ করে। ফলে, দেখিতে দেখিতে আলিপুর জেল ভরিয়া গেলো। দেশবন্ধুও গ্রেপ্তার হইলেন। বিচারের অপেক্ষায় তাকে প্রেসিডেন্সী জেলে রাখা হইলো। আকস্মিক এতো লোকের আগমনে জেলের সমস্ত শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া গেলো, হৈ চৈ সুরু হইলো। নবাগত ভলান্‌টীয়ারেরা প্রথম দিন বাগানে কাজ করিতে গিয়া আমাদের তৈরী গাছগুলি উপড়াইয়া ফেলে। পরদিন যেখানে সেখানে আঠা লাগাইয়া ইহারা দশ হাজার এন্‌ভেলাপ নষ্ট করে। ফলে সকলের কাজ বন্ধ হইলো—আমাদেরও।

ডিসেম্বরের রাত। কন্‌কনে শীত। আগের দিন বিকালে প্রায়

দু-শ ভলান্টীয়ার আসিয়াছে। ইহাদের বিছানা ও কম্বলের কোন বন্দোবস্ত করা হয় নাই। ফলে শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে ইহারা বন্দেমাতরম্ করিতে থাকে। ইহাদের বন্দেমাতরম্ শুনিয়া অন্যান্য ব্যারাকের সাধারণ কয়েদীদেরও ঘুম ভাঙ্গে। তাহারাও বন্দেমাতরম্ আরম্ভ করে। ফলে জেলময় দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পরদিন ভোরে সাধারণ কয়েদীরা পর্য্যন্ত কাজ করিতে অস্বীকার করে। ডাঃ য়্যাস নিজে গিয়া তাদের কাজ করিতে বলেন। কিন্তু তখন কে শোনে তার কথা। তাদের চোখে-মুখে কথায়-বার্ত্তায় বিদ্রোহের ভাব। বিব্রত হইয়া ডাঃ য়্যাস আমার কাছে ছুটিয়া আসিলেন। পূর্ব্বে পরিচয় ছিলো, তাই ঠেকা পড়িলে এরূপ প্রায়ই আসিতেন। আগের রাতের ব্যাপারে আমারও মেজাজ তখন গরম। আমি তাকে বলিলাম—I was feeling like shooting you last night. তিনি তো একেবারে অবাক। আমি আরো বলিলাম—আপনার-ও তো ছেলেপুলে আছে, আপনি কি বুঝতে পারেন না, ডিসেম্বরের শীতে এ-ভাবে রাত কাটানো কতো কঠিন। আপনি এদের বাপ মা। আপনার উচিত এদের সাথে এসে থাকা। তিনি বলিলেন—কি কোরব, সন্ধ্যা বেলা হঠাৎ এসে পড়েছে। আমি বলিলাম—আপনি এদের নিলেন কেন? বন্দোবস্ত নেই বলে ফেরত পাঠালেই তো পারতেন। আর কল্‌কাতার মতো বড় সহরে তিন শ লোকের কম্বলের বন্দোবস্ত করতেই বা কত সময়ের দরকার? গেলো আফগান যুদ্ধে তো গভর্ণমেণ্ট ছয় লক্ষ লোকের যাবতীয়

বন্দোবস্ত এক সপ্তাহেই করেছিলো। য়্যাস সাহেব আর কোন কথা না বলিয়া চলিয়া গেলেন। এরপর তিনি আর কখনো আমার কাছে আসেন নাই—রাগ হওয়ায় সব ভাব ছুটিয়া গিয়াছিলো। কিছু দিন পর ইনস্‌পেক্টার জেনারেল জেল পরিদর্শনে আসিলেন। য়্যাস সাহেব তাহার কাছে আমাকে হাজির করিয়া, আমি তাহাকে গুলি করিতে চাহিয়াছি, এই অভিযোগ করিলেন। ইনস্‌পেক্টার জেনারেল আগা গোড়া সব শুনিলেন কিন্তু কিছু বলিলেন না। ব্যাপারটা এ-ভাবেই চাপা পড়ে।

কোনো লোকসানই অবিমিশ্র নয়। জেলের নিয়ন্ত্রণ-সুন্দর জীবনের অবসান হইলো বটে, কিন্তু বই সম্বন্ধে আগের কড়াকড়ি দূর হওয়ায়, অনেক বই মিলিলো। এবার ঝোঁক গেল সাংখ্য, বেদান্ত ও মহাভারতের দিকে। এ-সব বই পড়াতেই এরপর সারাদিন ও রাতের বেশীর ভাগ কাটিতো। জনৈক হিন্দুস্থানী একখানা তিলকের গীতা দিলেন। বার বার তাহাই প'ড়লাম। কাশীরাম দাসের মহাভারত এর আগে বহুবার পড়িয়াছি, কিন্তু কালী প্রসন্ন সিংহের মহাভারত পড়ার সুযোগ এর আগে কখনো জোটে নাই। এ মহাভারত পড়িয়া বুঝিলাম অতীত যুগে হিন্দু ধর্ম্ম কত উদার ছিলো। কোনো বিধি-নিষেধের গণ্ডীর মধ্যেই ইহাকে ধরিয়া রাখা যাইতো না। বিভিন্ন ঋষি বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। সব মতই ইহার বিশাল বুকে স্থান পাইয়াছে, কোনো মতকেই ইহা একান্ত ভাবে গ্রহণ করে নাই, কোনো মতকেই সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া পায়ে ঠেলিয়া ফেলে নাই।

ফলে বিশ্বমুখী একটি বিশাল কৃষ্টি ব্যাপক ও মজবুত করিয়াছে ইহার মূল ভিত্। বিবাহ, খাওয়া, দাওয়া প্রভৃতি ব্যাপার এখনকার মতো সংকীর্ণ সীমার মাঝে নিবদ্ধ ছিলো না। তাই হিন্দু সমাজের অবাধ বিস্তৃতি সম্ভব হইয়াছে। এ-সময় "পৌত্তলিকতা মহাপাপ" এবং "অবাধ প্রেম" শীর্ষক দুইটি প্রবন্ধও লিখিয়াছিলাম।

কিছুদিন পরেই দেশবন্ধু আলিপুর জেলে আসিলেন। আসা মাত্রই তাঁর সাথে দেখা করিতে গেলাম। দেখিলাম তাঁর মুখ গম্ভীর। বিরক্তির সাথে তিনি বলিলেন—মহাত্মাজী গোল-টেবিল বৈঠকে মত না দিয়াই সব মাটি করিয়াছেন। চৌরীচোরা এবং বরদৌলীর কথাও উঠিলো। আলী ভাইদের জেলে আটক রাখিয়া, প্রাদেশিক সায়ত্বশাসন সম্বন্ধে আলোচনার জন্য গোলটেবিল বৈঠকে বসা যে শুধু বিড়ম্বনা নয়, দেশের পক্ষে অহিতকর ও, এ-সম্বন্ধে আমার ধারণা প্রথম হইতেই অতি স্পষ্ট ছিলো। কিন্তু মনে সন্দেহ ছিলো বরদৌলী লইয়া। চৌরিচোরার মতো একটা সামান্য ঘটনার জন্যই যদি ভারত-জোড়া এতো বিরাট একটা আন্দোলন বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, তবে ভবিষ্যতে এ-পথে মুক্তির আশা কোথায়? গ্রেপ্তারের ঠিক আগে কি বিশাল আন্দোলনই না দেখিয়া আসিয়াছি। সর্ব্বত্র ভলান্টিয়ার-বেশে হাজার হাজার ছাত্রের দল, অসীম জন-সমাগম, অপূর্ব্ব উদ্দীপনা। হিন্দু-মুসলমানের পূর্ণ মিলন। এতো বড় আন্দোলন ভারতে অতীতে তো হয়ই নাই, ভবিষ্যতেও হওয়া কঠিন। আন্দোলনের এই ব্যাপকতা ও গভীরতা দেখিয়া গভর্ণমেণ্ট ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলো, কি যে

করিবে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলো না। মহাত্মাজী সত্যাগ্রহ আন্দোলন চালাইতে বর্দ্দোলী যাইবেন শুনিয়া কি আশাই না আমাদের বুকে জাগিয়া উঠিয়াছিলো। চৌরিচোরার পর নিরাশার কালো ছায়ায় সারা বুক ছাইয়া গেলো। কিন্তু মহাত্মাজীর প্রতি তখন আমার অনুরাগ অসীম। নিজে মনে মনে তাহার সমালোচনা করিলেও, অন্যের মুখে তাহার সমালোচনা সহ্য হইতো না। বুকে তীরের মতো বিঁধিতো। তাই দেশবন্ধুর কথা আমার মোটেই ভাল লাগিলো না। অথচ তিনি সবে মাত্র কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া এ-জেলে আসিয়াছেন। এ-জন্য তাহার প্রাণে কোন ব্যথা দেওয়ার ইচ্ছাও তখন ছিলো না। তাই বিনীত ভাবে দু-চারটি কথা বলিয়াই সে দিন বিদায় লইলাম।

চাটগাঁ প্রাদেশিক সম্মেলন।

১৯২২-এর এপ্রিল। ঠিক হইলো প্রাদেশিক সম্মেলন চাটগাঁয় হইবে—সভানেত্রী বাসন্তী দেবী। বাসন্তী দেবীর অভিভাষণে কাউন্সিল-প্রবেশের উল্লেখ থাকিবে, এ-ধরণের একটা গুজব সম্মেলনের অধিবেশনের কিছু পূর্ব্বেই জেলে প্রবল হইয়া উঠিলো। আরো শোনা গেলো, দেশবন্ধুর সম্মতি অনুসারেই নাকি কাউন্সিল-প্রবেশের কথা সভানেত্রীর অভি-ভাষণে স্থান পাইবে। ঠিক সংবাদের জন্য মন চঞ্চল হইলো। দেশবন্ধুর অনুগতদের এ-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াও স্পষ্ট জবাব পাওয়া গেলো না। ফলে সন্দেহ, সাথে সাথে উত্তেজনা, আরো বাড়িলো। সম্মেলনের অধিবেশনের পূর্ব্বেই অভিভাষণের কপি

জেলে পৌঁছিলো। গুজব সত্য—কাউন্সিলে প্রবেশের ইঙ্গিত এতে আছে। অসহযোগী কয়েদীরা দেখিতে দেখিতে দুই দলে বিভক্ত হইলো। একদল গান্ধীপন্থী—কাউন্সিল প্রবেশের বিরোধী। অপর দল দেশবন্ধুর অনুযায়ী—ইহারা কাউন্সিলে ঢুকিয়া সেখানেও অসহযোগ চালানোর পক্ষপাতী। দেশবন্ধুর পক্ষীয়দের মধ্যে বীরেন শাসমল, সুভাস বসু, হেমন্ত সরকার, প্রতাপ গুহের নামই বিশেষ উল্লেখনীয়। অপর দলে শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, জিতেন ব্যানার্জ্জি, পীর বাদশা মিঞা, নৃপেন ব্যানার্জ্জি প্রভৃতি প্রধান। আমি অবশ্যি শেষের দলে। দিনরাত কথা কাটাকাটি চলিতে লাগিলো। মতান্তর মনান্তরে পরিণত হইলো। হাতাহাতিও বাকী রহিলো না। আমার মুক্তির দিন ঘনাইয়া আসিলো। বাহির হইয়া কি করিবো সে-সম্বন্ধে মনে নানারূপ প্রশ্ন উঠিলো। অনেক জল্পনা কল্পনার পর গোপালগঞ্জ গিয়া নমঃশূদ্রদের মাঝে কাজ করাই ঠিক করিলাম।

বাহির হইয়াই দেখি প্রফুল্ল, নৃপেন ও কালু কলিকাতায় আসিয়াছে। ইহাদের কলিকাতা আসার উদ্দেশ্য—মুক্তি পাওয়া মাত্র আমায় বলা—আশ্রমের আর্থিক অবস্থা অতি শোচনীয়, টাকার বন্দোবস্ত না হইলে আশ্রম চালানো অসম্ভব, তাই অন্য কোন কাজে হাত দেওয়ার আগে আমায় আশ্রমের জন্য টাকা তুলিতে চেষ্টা করিতে হইবে। আমার মুক্তির পর গোপালগঞ্জ গিয়া কাজ করার সঙ্কল্পের কথা তাহাদের কানে ইতি পূর্ব্বেই পৌঁছিয়াছিলো। তাই এই চাপ। কথায় কথায় স্থায়ী আশ্রম প্রতিষ্ঠার কথাও উঠিলো। এজন্য একটি জায়গা কিনা দরকার

এবং ঢাকা, কুমিল্লা ও চাঁদপুরে জায়গা দেখা হইয়াছে, এ-কথাও শুনিলাম। গোপালগঞ্জে কাজ করার ইচ্ছা আমার বহুদিনের। এ-সম্বন্ধে জেলে ফরিদপুর জেলার কর্ম্মীদের সাথে আলাপ করিয়াছি—অনেককে এ-বিষয়ে কথা এবং আশ্বাস-ও দিয়াছি। তাই এই ব্যাপারে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একটু চিন্তিত হইলাম। কিন্তু ক্ষণিকের জন্য মাত্র, কারণ সহকর্ম্মীদের সিদ্ধান্তই আমার চিরদিন শিরোধার্য্য, এখনও সে সিদ্ধান্তই মানিতে হইবে। তাই গোপালগঞ্জে আশ্রম প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হইলো। টাকা সংগ্রহের চেষ্টায় এবং অন্যান্য কাজে কয়েকদিন কলিকাতা কাটাইয়া, কুষ্টিয়া ও রাজবাড়ী হইয়া, ফরিদপুর পৌঁছিলাম। কলিকাতায় মহম্মদ আলী পার্কে পীর সাহেব ও আমাকে সম্মিলিত ভাবে অভ্যর্থনা করা হয়। এ অভ্যর্থনায় মুসলমানেরাই ছিলো বিশেষ উদ্যোগী। হিন্দু মুসলমানে তখনো মিলনের ভাব অতি নিবিড়। ফরিদপুর ষ্টেশনে আমি ও পীর সাহেব এক সাথেই নামি। ষ্টেশনে দারুণ লোক সমাগম ও বিরাট অভ্যর্থনা। রাস্তার দু-পাশের লোকের ভিড়ে আমাদের গাড়ী অতি কষ্টে সহরে পৌছে। পরদিন বিকালে এক বিরাট সভায় আমাদের উভয়কে ফরিদপুরবাসীদের পক্ষ হইতে মানপত্র দেওয়া হয়। উপস্থিত জনতার বেশীর ভাগই ছিলো মুসলমান। পীর সাহেব যখন তাদের বলেন—তোমরা আমায় পীর বল কিন্তু আমার কথা মান না—তখন জনতা ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলো। পীর সাহেব তাদের বিলাতী বস্ত্র ছাড়িয়া দেশী কাপড় পরিতে বলিলেন। তাহার কথা মতো

অনেকে পরণের বিলাতী কাপড় ত্যাগ করে কিন্তু বাজারে গিয়া আবার বিলাতী কাপড়ই কেনে। অজ্ঞতাই ইহার কারণ। বর্ত্তমান যুগে, অজ্ঞদের লইয়া রাজনৈতিক যুদ্ধে জয়ী হওয়াও কম কঠিন নয়।

ঠিক ছিলো পীর সাহেবের সাথে ফরিদপুর হইতে ঢাকা যাইবো। কিন্তু একিম্ বক্স আসিয়া জেদ ধরিলো—আমায় প্রথম নড়িয়া যাইতে হইবে। তাই নড়িয়া গেলাম। বাড়ী পৌছিয়াই দেখি, একজন জল-অচল পুরাতন বন্ধু ছ মাইল দূর হইতে আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য আসিয়াছে। মা তাকে রান্না ঘরে আমারই পাশে খাইতে দিলেন, বলিলেন—এ তোকে দেখতে এসেছে, তোর ভাই, কাজেই আমার ছেলে। কি করে একে বাইরে খেতে দিই। তার একথা শুনিয়া, একটু অবাক্ হইয়া, আমি বলিলাম—জেলে একজন নমঃশূদ্র কয়েদী আমাদের কাজ করতো, সেই আমাদের ভাত দিতো, তার ছোঁয়াটা অনেক দিন খেয়েছি, কোন অন্যায় করেছি কি? তিনি বলিলেন—না, মোটেই না, তোর এতে কোনই পাপ হয় নাই, না খেলেই বরং পাপ হোতো। আমাদের মনে পাপ, তাই আমরা এ-সব করতে ভয় পাই। মার কথা শুনিয়া অবাক্ হইলাম—কারণ মা বাবা চিরদিনই গোঁড়া। ভাবিলাম—হাজার কথা বলিয়াও একে এ-সব বোঝানো যাইতো না। আন্দোলনের প্রবল বন্যায় অনেক পাপ-পঙ্ক সমাজ-অঙ্গ হইতে ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে। তাই এতো দিনের আবছা বিষয়গুলিও এখন দিবালোকের মতো সাফ হইয়া উঠিয়াছে।

বিকালে অনেক মুসলমান নেতা আমার সাথে দেখা করিতে আসে। এদের অনেকেরই দু-বছর আড়াই বছর জেল হইয়াছিলো। বণ্ড দিয়া আসিয়াছে। তাহারা আপনা হইতেই তাদের কাজের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলো—বাবু, আমরা গৃহস্থ মানুষ, দীর্ঘ দিন আমাদের জেলে থাকা কঠিন। ছ-মাস হলে থাকতাম, কিন্তু দু-বছর অসম্ভব। এদের কথা শুনিয়া তখনও বুঝিয়াছিলাম, এখন আরো ভাল করিয়া বুঝিয়াছি—কোন গণ-আন্দোলনই দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে না। দু, চার, দশ দিনের মধ্যেই যা হোক্ একটা হওয়া চাই। নইলে গণ-আন্দোলন আস্তে আস্তে মিয়িয়ে যাইতে বাধ্য।

ঢাকা আশ্রমের অবস্থা

নড়িয়া হইতে ঢাকা যাই। গিয়া দেখি আশ্রমের অবস্থা অতি শোচনীয়—খাওয়া দাওয়া কোন গতিকে চলে। যে পাঁচ হাজার টাকা জমা ছিলো, তাহা সম্পূর্ণ খরচ হইয়া কিছু কর্জ্জও হইয়াছে। ঢাকার জনৈক বন্ধু মাসে এক শ টাকা দিতো, জয়চন্দ্র বয়নাগার হইতে অন্নদা মাসে চল্লিশ টাকা ভাতা পাইতো, আশ্রমে খদ্দর বুনিয়াও কিছু আয় হইতো। এ-ভাবে মাসে মোটে ১৫০৲ কি ১৬০৲ টাকা আয় ছিলো। আশ্রমে তখন প্রায় পনর জন লোক থাকিতো। বাড়ীভাড়া ৪০৲ টাকা দিয়া, ১২০৲ টাকায় আশ্রমের যাবতীয় খরচ চালাইতে হইতো। কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত খরচ ইহা হইতেই চলিতো। এ-জন্য ভাল খাওয়া তো দূরের কথা, আশ্রমীদের পক্ষে দু-বেলা পেট ভরিয়া

খাওয়াও কঠিন ছিলো। পাছে কেহ বেশী খায়, এ-জন্য প্রমথ অনেক সময় ইচ্ছা করিয়া খারাপ পাক করিতো। প্রমথ আমাদের কলিকাতার বাসার পুরাতন চাকর। আশ্রম প্রতিষ্ঠার অল্প পরেই সে ঢাকা আসে। মফঃস্বলের কোন কর্ম্মী আসিয়া আশ্রমে অতিথি হইলে এ-সময় বড়ই মুস্কিলে পড়িতে হইতো।

সকাল বিকাল দু বেলা প্রার্থনা ও অবসর সময়ে অধ্যয়ন ছাড়া তখন দিনে সাত আট ঘণ্টা তাঁত বোনাই ছিলো আশ্রমবাসীদের প্রধান কাজ। প্রতিষ্ঠার কিছু পর হইতেই ঢাকা আশ্রমে তাঁত বোনা হইতো—প্রথমে অর্দ্ধখাদি, পরে পূর্ণখাদি। পূর্ণ খদ্দর বোনার জন্য তখন আশ্রমের বেশ প্রতিষ্ঠা ছিলো। বাংলার আশ্রম সমূহের মধ্যে পূর্ণ খাদি বোনা সম্বন্ধে অভয় আশ্রমই পথ-প্রদর্শক। তাঁত বোনা ছাড়া আশ্রমে আর কোন কাজই নাই, এ আমার মোটেই পছন্দ হইলো না। আমাদের আদর্শের অনুকূল নূতন কি করা যায় ভাবিতে লাগিলাম। আমি কখনও তাঁত বুনি নাই। ভারতের পূর্ণস্বাধীনতা লাভই ছিলো আমার আগাগোড়া প্রধান কাম্য। নীতি হিসাবে তাঁত বোনা যতোঃ বড় হোক্ না কেন, স্বাধীনতা লাভের সাথে এর কোন সাক্ষাৎ সম্পর্ক না দেখিয়া, এতে অনুপ্রাণিত হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব হইলো। তাই আমার বেশীর ভাগ সময় কাটিতো পড়ায় এবং কখনো কখনো সবিতার জন্য প্রবন্ধ লেখায়। হাতে-লেখা মাসিক সবিতা তখনও রীতিমতো ঢাকা আশ্রম হইতে বাহির হইতো।

তখনকার আশ্রমবাসীদের মধ্যে নিম্নলিখিতদের নামই আমার মনে আছে— কালু, নিপেন, অন্নদা, নলিনাক্ষ লাহিড়ী,

প্রদ্যোৎ, শীতেশ, পরিমল, তরঙ্গ, পুটু, রমেশ, জগদীশ, সুশীল, ননী। প্রফুল্লকে অনেক সময়ই রাজনৈতিক কাজে কলিকাতা থাকিতে হইতো। তারিণী, মিহির প্রভৃতি থাকিতো মালিকান্দা—হরিপদ, দেবেন প্রভৃতি নবাবগঞ্জ। আন্দোলনের সময়ই হরিপদেরা নবাবগঞ্জে একটি জাতীয় বিদ্যালয়ের ভার নেয়। সে বিদ্যালয় চালনোই ছিলো তখন সেখানকার প্রধান কাজ। জনৈক সঙ্গতি-সম্পন্ন স্থানীয় লোক আশ্রমের জন্য এক খণ্ড জমি দেয়, সেই জমিতে বিরাট্ বিদ্যালয়-গৃহ নির্ম্মিত হইতেছিলো। ধীরেশ থাকিতো তার নিজ গ্রাম ফুরসাইলে। আন্দোলনের প্রারম্ভে সেখানে একটি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই বিদ্যালয়টি চালানোই ছিলো তার প্রধান কাজ। ধীরেশের বিশেষ অনুরোধে তাদের বিদ্যালয়ের পুরস্কার-বিতরণ উৎসবে সভাপতিত্ব করিতে আমি এ-সময় একবার ফুরসাইল যাই। অন্নদা ও মুনীন্দ্র জয়চন্দ্র বয়নাগারে কাজ করিতো। জয়চন্দ্র দত্ত রেঙ্গুনের একজন প্রসিদ্ধ কাঠ ব্যবসায়ী। দেশবন্ধু যখন তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারের টাকা তুলিতে ঢাকা যান, তখন একটি বয়নাগার প্রতিষ্ঠার জন্য দেশবন্ধুর হাতে তিনি আট-হাজার টাকা দেন। সেই টাকাতেই এই বয়নাগার স্থাপিত হয়। অন্নদা ছিলো ইহার অধ্যক্ষ, মুনীন্দ্র সহকারী।

আশ্রমের জমি নির্ব্বাচন

ইতিপূর্ব্বেই নিপেন প্রভৃতি মিলিয়া স্থায়ী আশ্রম স্থাপনের জন্য কয়েকটি জমি দেখিয়া রাখিয়াছিলো। এ-সবের মাঝে

একটি ছিলো ঢাকা হইতে পাঁচ ছ-মাইল উত্তরে তেজগাঁও ষ্টেশনের অতি কাছে। সকলে মিলিয়া একদিন সেই জায়গাটি দেখিতে গেলাম। পছন্দ হইলো না—জঙ্গলে-ঘেরা, অন্ধকার অন্ধকার ঠেকিলো। কুমিল্লার কাছেই আর একটি জায়গা ছিলো। আমি ও কালু তাহা দেখিতে গেলাম। জায়গাটি কুমিল্লা সহরের ঠিক দক্ষিণে, পিলগ্রিমস্ রোডের পাশে। বেশ পছন্দ হইলো। একটি বড় পুকুর, চারদিকে উঁচু পাড়। পশ্চিমে ও পূবে মুসলমান পল্লী—উত্তরে, পিল্‌গ্রিমস্ রোডের অপর পাশে, ধানখেত, খেতের উত্তরে একটি নমঃশূদ্র পল্লী। দক্ষিণ পূব কোণে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ, মাঠের অপর প্রান্তে পাহাড়ের নীলরেখা। উপরে, উদার অনন্ত আকাশ। পুকুরের উঁচু পূব পাড়ে বসিয়া, আমি ও কালু মুগ্ধ নেত্রে প্রকৃতির এই বিরাট সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলাম। প্রাণ আনন্দে নাচিতে লাগিলো। মনে পড়িলো আয়েক দিনের কথা—যেদিন আমি ও যুগল প্রকৃতির এমনি বিশাল সৌন্দর্য্যের মাঝে রিখীয়া প্রান্তরে আশ্রম প্রতিষ্ঠার প্রথম সঙ্কল্প করি। সাথে সাথে মনে হইলো—আশ্রমের কথা—কোথায় কি কি হইবে। সে-দিনই সহরে ফিরিয়া প্রফুল্লকে লিখিলাম—জায়গা পছন্দ হইয়াছে।

জায়গার মালিক জনৈক বৃদ্ধ মুসলমান দরজী। দাম সম্বন্ধে তার সাথে আলোচনা চলিলো। অনেক কথা কাটাকাটির পর তেত্রিশ শ টাকা মূল্য ঠিক হইলো। এ-ছাড়া তার এক সাবালক পুত্র আছে, তাকেও প্রায় তিন শ টাকা দিতে হইবে। নামজারি প্রভৃতিতে হাজার টাকা লাগিবে। মোট

প্রায় ৪৬০০৲ টাকা তখনই দরকার। এতো টাকা জুটিবে কোথা হইতে? কে আমাদের চিনে, কার কাছে চাইব? প্রথমেই মনে পড়িলো সতীশ দাশগুপ্তের কথা। তিনি তখন বেঙ্গল কেমিকেলের সুপারীন্‌টেন্‌ডেন্ট্—লম্বা মাইনে পান, ব্যাঙ্কে লাখ্ টাকার উপর জমা। প্রফুল্লর সাথে তার খুব ভাবও ছিলো। ঢাকা গিয়া প্রফুল্লকে তার কাছে দু-হাজার টাকা চাইতে বলিলাম। প্রফুল্ল রাজী হইলো। সতীশবাবু অনায়াসেই দু-হাজার টাকা দিলেন। কালুর বাবা রজনী মুখুজ্যের অবস্থা খুব স্বচ্ছল ছিলো। কালু চিরদিনই পিতার অতি প্রিয়। কালুকে বলিলাম তার বাবার কাছে কিছু চাইতে। কালুর বাবা বার শ, টাকা দিলেন। চাঁদপুরের দাদার কাছ হইতে এক শ টাকা লইলাম। এ-ভাবে তেত্রিশ শ টাকা জোটে এবং ইহা দ্বারাই জমি কেনা হয়। প্রথম দাতা এই তিন জনের কাছে আশ্রম চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। বাকী টাকা কুমিল্লার লোকদের কাছ হইতে তোলা হইলো।

এরপর কুমিল্লার আশ্রমে কি কি কাজ হইবে, সে-সম্বন্ধে প্রফুল্লের সাথে আলাপ হয়। ঠিক হইলো একটি ডিস্‌পেনসারী, খদ্দর বোনা, জাতীয় ধরণের একটি স্কুল, পাঠাগার, কৃষি ও বাগান লইয়াই প্রথম কাজ আরম্ভ করা হইবে। কোথায় কি ধরণের বাড়ী তৈরী হইবে তাহাও ঠিক হইলো। ইট কাটানো ও পোড়ার তত্ত্বাবধানের জন্য রমেশ মজুমদারকে কুমিল্লা পাঠানো গেলো। আশ্রমের পশ্চিম পারে তার থাকার জন্য ছোট একখানা ছনে-ছাওয়া দো-চালা ঘর তৈরী

হইয়াছিলো। সেই পুরাণ পুকুরের নিভৃত তীরে, ছোট একটি ঘরে, সে একা রাত কাটাইবে শুনিয়া প্রতিবেশী মুসলমানেরা ভয়ে কাঁপিয়া উঠিলো। তাহারা বলিলো—সে পুকুরের পারে অনেক জিনের বাস, এ-সব জিনের সাথে তাদের কারো কারো সাক্ষাৎও হইয়াছে, প্রথম রাত্রেই তাহারা আসিয়া তাহাকে প্রাণে মারিবে। তারপর তার কাছে কিছু টাকাও থাকিতো। সেই পুকুরের পাশের পল্লী সমুহে অনেক গুণ্ডার বাস। টের পাইলেই তাহারা আসিয়া সেই টাকা লুটিয়া লইয়া যাইবে। প্রয়োজন হইলে প্রাণে মারিতেও কসুর করিবে না। এ-ধরণের হত্যাকাণ্ড পুকুরের পাশের রাস্তায় অতীতে অনেক ঘটিয়াছে। এ-সব কথা শুনিয়াও রমেশ বিন্দুমাত্র ঘাবড়াইলো না। সে সাথে টাকা লইয়াই সেই ঘরে রাত্রে একা শুইয়া রহিলো। পর দিন প্রাতে পাশের লোকেরা যখন দেখিলো সে বাঁচিয়া আছে, মরে নাই, তাহাদের আশ্চর্য্যের অবধি রহিলো না।

আমি কুমিল্লা সহরে এক আত্মীয়ের বাসায় থাকিতাম। প্রতিদিন একবার কি দুবার আশ্রমে গিয়া কাজকর্ম্ম দেখিতাম বটে কিন্তু এ-সময় আমার প্রধান কাজই ছিলো টাকা তোলা। এ-জন্য আমাকে কখনো কখনো চাঁদপুর, চাটগাঁ, ঢাকা ও কলিকাতা যাইতে হইতো। কুমিল্লার অনেকেই এ-সময় আশ্রমের কাজে মুক্ত হস্তে টাকা দেন। এই দাতাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দত্তের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি আই, সি, এস্ পরীক্ষা দিতে ইংলণ্ড যান, কিন্তু যক্ষ্মাক্রান্ত হইয়া

বাড়ী ফিরেন। ১৯২০ সালে, মন্‌টেগু চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার কানুন অনুসারে যে-নির্ব্বাচন হয়, তাহাতে কংগ্রেসের নির্দ্দেশ অমান্য করিয়া ইন্দুবাবু বাংলার ব্যাবস্থাপক সভায় সভ্য হন। কুলি রিলিফের সময় তাহাকে আমি প্রথম চাঁদপুরে দেখি। তখন তাহাকে দেখিয়া তাহার এই অতীত অপকর্ম্মের জন্য তাহার উপর কতকটা অশ্রদ্ধার ভাবই জন্মে। ইহার পরবর্ত্তী নির্ব্বাচনে, দেশবন্ধুর নেতৃত্বে গঠিত স্বরাজ্য পার্টির নির্দ্দেশ অনুসারে, ইন্দুবাবু শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। দেশবন্ধু কংগ্রেসের প্রার্থীরূপে অখিল-বাবুকে নির্ব্বাচিত না করিয়া ইন্দুবাবুকেই নির্ব্বাচিত করেন। কাউন্সিল নির্ব্বাচন সম্বন্ধে আমরা তখন উদাসীন থাকিলেও দেশবন্ধুর এ-কাজ অপছন্দের চোখেই দেখিলাম। কাহাকে ভোট দেওয়া উচিত কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, আকারে ইঙ্গিতে অখিল বাবুর দিকেই মত প্রকাশ করিতাম। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেও এই নির্ব্বাচনে অখিলবাবুই জিতেন। নির্ব্বাচনের এই ফলে মন অপ্রসন্ন হইলো বলিতে পারি না। তাই টাকার জন্য কুমিল্লার অনেকের কাছে গেলেও, ইন্দুবাবুর কাছে যাওয়া সম্ভব হইতো না, বাধ বাধ ঠেকিতো। শেষে প্রয়োজনের চাপে অগত্যা একদিন যাইতে বাধ্য হইলাম। বেলা তখন সন্ধ্যা। ইন্দুবাবু কুমিল্লার বাসার সমুখের প্রাঙ্গণে বসিয়া কয়েকজন বন্ধুর সাথে আলাপ করিতেছিলেন। যাওয়া মাত্রই, কোন পরিচয়ের প্রয়োজন হইলো না, তিনি আমায় চিনিতে পারিলেন এবং উঠিয়া দাঁড়াইয়া অভিনন্দন জানাইয়া সানন্দে বসিতে

বলিলেন। তাহার এই সহৃদয় ব্যবহারে, মুহূর্ত্ত-মাঝে, হৃদয়ের সব দ্বিধা-সঙ্কোচ দূর হইলো। এবং একটু আলাপের পর অনায়াসেই আশ্রমের জন্য টাকা চাহিলাম। তিনি বলিলেন—কতো দিতে হবে? আমি বলিলাম—হাজার টাকা। একটু ভাবিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেম—এখনি চান কি? আমি বলিলাম—না, দু-তিন মাসের মধ্যে আস্তে আস্তে দিলেই চলবে। তিনি রাজী হইলেন। তাঁহার এই দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া কুমিল্লার আরো কেউ কেউ হাজার টাকা দিতে রাজী হন্। ইহার পর এ-ভাবে ওঠা টাকাতেই আশ্রমের কাজ দ্রুত আগাইতে থাকে।

ইট পোড়ান শেষ হইতে না হইতেই মাটী কাটানোর পালা আসিলো। পুকুর ও চারদিকের উঁচু পারের মধ্যে অনেক নীচু জমি ছিলো। সে-সব জমি ভর্ত্তি না হইলে, জায়গাটা দেখিতেও সুন্দর হয় না—ঘর দুয়ার তোলাও কঠিন। তাই উঁচু পাড় কাটিয়া নীচু জমি ভরার জন্য লোক নিযুক্ত করা হইলো। মাটী কাটা আরম্ভ করার নির্দ্দিষ্ট দিনও আসিলো। আমার অনুমতি ছাড়া মজুরেরা মাটী কাটা আরম্ভ করিতে নারাজ, তাই হুকুম দেওয়ার জন্য আমায় উপস্থিত থাকিতে হইলো। পুকুরের উত্তর পারের ঠিক মাঝখানে অতি প্রাচীন একটি বড় শিমুল গাছ ছিলো। প্রথমেই সেই গাছটি কাটা দরকার। তাহার গোড়ায় কুড়াল লাগানো মাত্র আমার প্রাণ শিহরিয়া উঠে। কতো দীর্ঘ দিনের পুরাণ সে গাছটি! কতো শ্রান্ত পথিক এর তলে বসিয়া দক্ষিণে ঝির্ ঝিরে হাওয়ায় ক্লান্তি দূর করিয়াছে।

সহরের কতো নরনারী সকালে বিকালে বেড়াইতে আসিয়া ইহার ছায়াতলে বসিয়া নয়ন ভরিয়া পুকুরের সৌন্দর্য্য দেখিয়াছে। গাছটির প্রতি মায়ার পিছনে এ-সব কারণতো ছিলোই। তা ছাড়া অতীতের প্রতি মনের একটি স্বাভাবিক টানও আছে। অতীতকে অতিক্রম না করিয়া বর্ত্তমানে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব, সংস্কৃত বুদ্ধি এ-সত্যটি স্বীকার করিলেও, মনের স্বাভাবিক টান অতীতের পানে। সে সদা চায় অতীতকে আঁকড়াইয়া ধরিতে। বর্ত্তমান তাকে আলো বাতাস দ্বারা পুষ্ট করিলেও, অতীতই যেন তার প্রাণ সঞ্চারিণী রস জোগায়।

মাস দেড়েকের মধ্যেই উত্তর পাড় সম্পূর্ণ ও পশ্চিম পাড়েরা অর্দ্ধেক কাটিয়া সমতল করা হইলো। এর পর আসিলো ভিত্তি-স্থাপন-অনুষ্ঠান। ১৯২৩-এর ফেব্রুয়ারী। আমার ইচ্ছ ছিলো পাশের নমঃশূদ্র পল্লীর কাহারো দ্বারা এই অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করার। এই আশ্রমের প্রধান উদ্দেশ্য নিপীড়িত জনগণের সেবা। নমঃশূদ্রেরা নিপীড়িতদেরই অন্যতম। তাই তাদের কারো দ্বারা আশ্রমের ভিত্তি-স্থাপন-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইলে আদর্শের সাথে খাপ খাইতো। এই উৎসব উপলক্ষে ঢাকার আশ্রম হইতে কেহ কেহ কুমিল্লা আসিয়াছিলো। তাদের আমার এই ইচ্ছার কথা বলি। নিপেন আমার প্রস্তাবে ঘোর আপত্তি তোলে, বলে—আপনাকেই এ-কাজ করতে হবে। আমি তাকে অনেক প্রকারে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম কিন্তু সে কিছুতেই বুঝ মানিলো না। আমি একটু মুস্কিলে পড়িলাম। আমার

ইচ্ছার যুক্তি-যুক্ততা ও পবিত্রতা সম্বন্ধে আমার মনে কোন সন্দেহ ছিলো না। কিন্তু আশ্রমজীবনের এই পরম মুহূর্ত্তে কোন সাথীর বুকে ব্যথা দেওয়ার কল্পনাও অসহনীয়। তাই আমার ইচ্ছাকে দাবাইয়া রাখিয়া নিপেনের কথাই মানিতে হইলো।

প্রাতের অনুষ্ঠান

যাগযজ্ঞ কিছুই হইলো না। এ-সবে আমার বিশ্বাস ছিলো না কোন দিনই। গণ-কীর্ত্তনে আমার বিশ্বাস চিরদিনের। তাই পাশের গাঁয়ের নমঃশূদ্রদের ডাকিয়া আনিয়া তাদের দ্বারা কীর্ত্তন করানো হইলো। কীর্ত্তন-শেষে সমবেত সকলের মাঝে কিছু বাতাসা ছড়াইয়া দিলাম। বিকালের অনুষ্ঠানে সহরের সকলকে নিমন্ত্রণ করা হইলো। জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে অনেকেই আসিলেন। আমার অনুরোধে অখিলবাবু সভাপতি হইলেন। আশ্রমের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অখিলবাবু আমায় কিছু বলিতে বলিলেন। বলার অনেক কিছুই ছিলো, কিন্তু মুখে কিছুই ফুটিলো না—এম্‌নি গভীর ভাবে মগ্ন ছিলো তখন আমার অন্তর-প্রাণ। অখিলবাবু আমার সহায় হইলেন। তিনি বলিলেন—সুরেশ বাবু এখন কিছুই বল্‌তে পারলেন না বটে, কিন্তু তাঁর কাছে আমি এ-সম্বন্ধে অনেক কিছুই শুনেছি। এরপর তিনি একে একে সে-সব কথা বলিলেন। মুসলমানদের পক্ষ হইতে আশ্রাফ্ উদ্দিন চৌধুরী সাহেবও শুভেচ্ছা জানাইয়া কিছু বলিলেন। মেয়েদের পক্ষে মাঙ্গলিক বাণী শুনাইলেন

শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার। তাঁদের সকলের শুভ-আশীর্ব্বাদের সাথে ভিত্তি-স্থাপন-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইলো।

মহেশ ভট্টাচার্য্য

কুমিল্লার হৃদয়বান মহাপুরুষ মহেশ ভট্টাচার্য্যের নাম পূর্ব্ব হইতেই শোনা ছিলো। কিন্তু তাঁর সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য কখনো ঘটে নাই, পরিচয় তো দূরের কথা। অথচ তাঁর কাছে যাওয়া দরকার। বাড়ী ঘর তৈরী শেষ হইয়া আসিয়াছে, ওষুধ না হইলে ডিস্পেন্সারীর কাজ সুরু হইবে কি প্রকারে? কিন্তু যাই কার সাথে? ইন্দুবাবু তখন বেঙ্গল কাউন্সিলের মেম্বর, অনেক সময়ই কলিকাতা থাকেন, তাঁর সাথে এক দিন কলিকাতায় এ-সম্বন্ধে আলাপ করিলাম। তিনি আমায় সাথে করিয়া লইয়া যাইতে রাজী হইলেন। মহেশ বাবুকে দেখিয়া একেবারে অবাক্ হইলাম। বৎসরে লাখ টাকার উপর আয়, তবু কোনও বাবুগিরি নাই। বয়স ষাটের উপর হইবে. মাথার সব চুল পাকা, দাঁড়ি গোঁপ কামানো, গায় একটি সাধারণ ফতুয়া, পরণে ছোট একখানা সাদা কাপড়, পায় অতি সাধারণ এক জোড়া চটি জুতা। ঘরে অতিরিক্ত কোনও জিনিষের বালাই নাই, কিন্তু নিত্য ব্যবহারের জন্য অত্যাবশ্যক যে কয়টি জিনিষ আছে তাহা অতি সুন্দর ভাবে গোছানো। তিনি প্রথম জীবনে অতি গরীব ছিলেন। চুয়ান্ন টাকা লইয়া কলিকাতা আসেন। সে টাকা নানা ব্যবসায় খাটাইয়া আস্তে আস্তে কলিকাতায় ও মফঃস্বলের বিভিন্ন-স্থানে এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক ওষুধের বড় বড় কারবার খুলিয়াছেন। এইসব

কারবারের আয়ের প্রায় সব টাকাই জনহিতকর কাজে ব্যয় করেন, নিজের জন্য অতি সামান্যই রাখেন। তিনি কখনও নিজের নামে কিছু দান করেন না এবং তাঁহার কাছ হইতে এতো টাকা পাইয়াছি এ-কথা কাগজে লিখিলে কিম্বা কোন প্রকারে প্রকাশ করিলে, পর বৎসর তাকে আর কিছু দেনও না। তিনি সাহায্য করেন পরকে কিংবা দেশকে অনুগ্রহ করিতে নহে, নিজে অনুগৃহীত হইতে। দীর্ঘ আশ্রম-জীবন উপলক্ষে অর্থ-সাহায্যের জন্য তাঁহার কাছে অনেক বার যাইতে হইয়াছে। আমাদের সব দাবীই তিনি পূরণ করিয়াছেন এমন নহে। তাহার কাছ হইতে শূন্য হস্তে ফিরিতে হইলেও, অন্তরে অপমানের বোঝা লইয়া ফিরিতে হয় নাই। টাকা যখন দিয়াছেন, এমন উদার ও বিনীত ভাবে দিয়াছেন যে, আনন্দে প্রাণ উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে, কৃতজ্ঞতায় মাথা নুইয়া পড়িয়াছে। গ্রহীতা বলিয়া আমরা যে মোটেই ছোট নই, বরং সেবক বলিয়া বড়, দানের সময়কার তাঁহার আচার ব্যবহারে ও চোখমুখের ভঙ্গীতে এ-ভাবটি স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মহেশবাবুর কাছে ১৫০০৲ টাকার ওষুধ চাহিলাম। তিনি দিতে রাজী হইলেন। বলিলেন—ওষুধ, টাকা আমার কাছে সমান, যা ইচ্ছা নিতে পারেন। আমি পনর শ টাকার ওষুধ নেওয়ার কথাই বলিলাম। তিনি তালিকা পাঠাইতে বলিলেন। তালিকা তৈরী করিয়া পাঠানোর জন্য নিপেনকে লিখিলাম। তিন-চার দিন পরে আমার জনৈক বন্ধুকে মহেশ বাবু বলিলেন —এদের বিষয়-বুদ্ধি নাই, ওষুধের তালিকা দেওয়ার কথা ছিলো,

এতোদিন চ'লে গেলো, এখনো দেয় নাই। বন্ধুর মুখে এ-কথা শোনা মাত্রই তালিকা সহ তাহার কাছে উপস্থিত হইলাম। তিনি বলিলেন—টাকার জন্য কখনো কোনও বড়লোককে সাথে ক'রে আসবেন না। আমি টাকা দিই বড়লোক দেখে নয়, কাজ দেখে। আপনাদের আশ্রম এর আগেই দেখে এসেছি, টাকার অঙ্কও ঠিক ক'রে রেখেছিলাম। আমি একটি মাইক্রোশকোপের জন্য সে-দিন তাঁর কাছে আরও ৬০০৲ টাকা চাহিলাম। তিনি আমার কথা শোনামাত্রই বিনাদ্বিধা-সঙ্কোচে ও হাসিমুখে ইহা দিতে রাজী হইলেন। মানুষের লোভ ক্রমশই বাড়ে। আমারও অভাবের অবধি নাই। তাই টাকার জন্য তার কাছে আরেক দিন গেলাম। তখন চৈত্র পার হইয়া বৈশাখ আরম্ভ হইয়াছে। তিনি বলিলেন—আমার যা কিছু দেওয়ার চৈত্রের মধ্যেই দিয়ে ফেলি। শাস্ত্র অনুসারে ব্রাহ্মণের টাকা জমানো নিষেধ। তাই বৎসরের শেষে লাভের সব টাকা দোকান থেকে এনে, নিজের খরচের জন্য কিছু রেখে যাকে যা দেওয়ার দিয়ে ফেলি। বছর পেরিয়ে গেলে দেওয়ার আর কিছু থাকে না। আর আমি টাকা দিই কারো অনুরোধে নয়। আমি সারা বৎসর ধ'রে কে কোথায় কি করে খোঁজ রাখি, সাথে সাথে কাকে কতো দিতে হবে তাও ঠিক করি, এবং সে-অনুসারেই টাকা দিই।

সকলের কুমিল্লা আগমন

১৯২৩-এর এপ্রিল। ঢাকা আশ্রমের অবস্থা ক্রমশই কাহিল হইতে লাগিলো। এতোদিন হাওলাৎ বরাৎ করিয়া কোনো-

রকমে চলিয়াছে, এখন তাও মেলা মুস্কিল। তাই অন্নদা সকলকে লইয়া কুমিল্লায় আসা ঠিক করিলো—ভাবিলো, বাড়ী ভাড়াটা অন্ততঃ লাগিবে না। নিপেন তখন চাঁদপুর-মিশন-হাসপাতালে হোসেন ডাক্তারের কাছে ডাক্তারী বিদ্যায় হাত পাকায়। প্রফুল্ল কলিকাতায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদক। সে-কাজেই সে সদা ব্যস্ত। আমি তো অর্থের অন্বেষণে এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াই। সুতরাং তখন ঢাকা আশ্রমের সম্পূর্ণ ভার পড়িয়াছিলো অন্নদার উপর। সে সকলকে লইয়া অতি কষ্টে কুমিল্লা আসে। পাথেয়ের অভাব, তাই তাদের অনেককে অনেকটা পথ হাঁটিয়াই আসিতে হয়। এতে লাভও ছিলো—কয়েকদিন দু-বেলা খাওয়া তো অন্ততঃ বিভিন্ন গ্রামে বিভিন্ন লোকের বাড়ীতে জুটিলো।

কুমিল্লায় সকলে আসায় সেখানকার লোক সংখ্যা প্রায় আঠারো জন হইলো। এতোদিন সকলকে বলিয়াছি, লোকজন আসিলেই কাজ কর্ম্ম আরম্ভ হইবে। কাজ আরম্ভ হইবে এ আশায়ই সকলে টাকা দিয়াছে। এখন লোক আসা সত্ত্বেও, কাজ আরম্ভ করা সম্ভব হইলো না। ডিসপেনসারী গৃহ এখনো অসম্পূর্ণ। তা ছাড়া মহেশ বাবুর টাকায় যে ওষুধ কেনা হইয়াছে, তা দ্বারাও ডিস্‌পেন্‌সারী আরম্ভ করা অসম্ভব। অভিজ্ঞতার অভাবে অপ্রয়োজনীয় ওষুধও কেনা হইয়াছে, কিন্তু প্রয়োজনীয় বহু ওষুধ বাদ পড়িয়াছে। বয়ন-গৃহ শেষ হইয়াছে বটে, কিন্তু নানা গোলমালে তাঁত বোনা সম্ভব হইয়া উঠিতেছে না। আমি মহা ফাঁপরে পড়িলাম। এমন সময়

সারানোর জন্য শুধু কুইনাইন নয়, দেশী কাপড় পরাও দরকার। স্বদেশীর ব্যবহার ম্যালেরিয়ার এক প্রকার প্রতিষেধক। এরপর অনেকেই নূতন কেনা দেশী কোরা কাপড় পরিয়া ওষুধ নিতে আসিতে লাগিলো। দেশী কাপড়ের বিক্রীও বাজাপ্তি বাজারে হু হু করিয়া বাড়িলো।

এ-রিলিফ্ কেন্দ্রের নাম দূরদেশ পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িলো। পাশের জেলা সমূহ হইতেও, শুধু ম্যালেরিয়াগ্রস্তেরা নয়, অন্যান্য রোগীরাও আসিতে লাগিলো। ফলে ইহা একটি পূর্ণ ডিস্‌পেন্‌সারী হইয়া দাঁড়াইলো। কালাজ্বর এবং অন্যান্য রোগের ইন্‌জেকসানও দেওয়া হইতো। কয়েক দিনের মধ্যেই কোন কোন সেবক এ-সব কাজে পটু হইয়া উঠে। ফলে শেষে আর আমাদের বিশেষ বেগ পাইতে হইতো না। প্রথম প্রথম কুইনাইন মেডিকেল ব্যালান্সে মাপা হইতো বটে, কিন্তু শেষে আর তাহাতে কুলাইতো না, দাঁড়ি পাল্লার প্রয়োজন হইলো।

বেলা প্রায় এগারটা। আমি ও নিপেন ক্যাম্পে বসিয়া রোগী দেখিতেছি, এমন সময় ডাক্তার বেণ্টলী এবং মিষ্টার ওয়াকার সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ডাক্তার বেণ্টলী বাঙ্গলা সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগের ডিরেক্টর—মিষ্টার ওয়াকার চাঁদপুরের মহকুমা হাকিম। তাঁহারা যে আসিবেন তা আমাদের মোটেই জানা ছিলো না। তাই পূর্ব্ব হইতে তাঁহাদের জন্য আমরা কোনও আয়োজনই করি নাই। কিন্তু ক্যাম্পে লোকের ভীড় ও আমাদের সেবার ধরন দেখিয়া ডাক্তার বেণ্টলী খুব খুসী হইলেন। ফলে তিনি নিজে একশ টাকা এবং সরকার

হইতে চল্লিশ পাউণ্ড কুইনাইন তো দিলেনই, আমাদের সাম্‌নেই মিষ্টার ওয়াকারকেও বলিলেন—ভলান্‌টিয়ার অরগ্যানিজেশন্‌ ছাড়া এ-সব কাজ চালানো প্রায় অসম্ভব। তাই এদের রাজনৈতিক মত যাই হোক না কেন, সর্ব্বান্তকরণে এদের সাহায্য করা কর্ত্তব্য। খান্‌ বাহাদুর আবদুল করিম ছিলেন তখন ত্রিপুরা জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান। ডাক্তার বেণ্টলী কুমিল্লা গিয়া তাহাকেও আমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করিতে বলিলেন। ফলে জেলা বোর্ড হইতেও এরপর আমরা মুক্তহস্তে সাহায্য পাইতে লাগিলাম এবং আমাদেরও সকল রকম অভাবের অবসান হইলো।

আমার সব সময় বাজাপ্তি থাকা সম্ভব হইতো না। প্রতি সপ্তাহে একবার ওষুধ-বেচা টাকা লইয়া চাঁদপুর যাইতে হইতো, টাকা সংগ্রহ ও অন্যান্য কাজে সেখানে দু-তিন দিন কাটিতো, তারপর ওষুধ লইয়া আবার বাজাপ্তি ফিরিতাম। কাজেই সপ্তাহে বাজাপ্তিতে দিন তিনেকের বেশী থাকিতে পারিতাম না। নিপেন সর্ব্বদাই সেখানে থাকিতো। তার অসীম ধৈর্য্য, অমায়িক ব্যবহার, মিষ্টি কথা ও চিকিৎসা-নৈপুণ্যে সকলেই তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। তার চিকিৎসা-ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা-লাভের সেখানই প্রথম সূত্রপাত।

বাজাপ্তির রিলিফের জন্য টাকা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে চাঁদপুরে দুটি কমিটি স্থাপিত হইয়াছিলো। একটি জনসাধারণের—ইহার সম্পাদক ছিলো যোগেশচন্দ্র সুর। যোগেশ মেডিকেল কলেজে পড়ার সময় তিন নম্বরের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলো—এখন চাঁদপুরে

ডাক্তারি করে। অপরটি সরকারী। ইহার প্রেসিডেন্ট মিষ্টার ওয়াকার, সম্পাদক দাদা। আমার সকল কাজের সাথেই দাদার আন্তরিক যোগ ছিলো। চাঁদপুরের কুলি রিলিফের সময়ও তিনি অনেক খাটিয়াছিলেন। এই ব্যাপারেও তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন। মিষ্টার ওয়াকারের ফণ্ডে ছয় শ টাকার অধিক জমে। দাদার ইচ্ছা এ-টাকাটা আমাদের কাজেই দেওয়া হয়। তিনি তাঁহার এ-ইচ্ছা মিষ্টার ওয়াকারের কাছে ব্যক্ত করেন। মিষ্টার ওয়াকার অতি ভাল লোক ছিলেন। তিনি দাদার মারফতে আমাকে তাঁর সাথে একদিন দেখা করার অনুরোধ জানাইলেন। আমি রাজী হইলাম। মিষ্টার ওয়াকার আমায় অতি আন্তরিকতার সহিত কাছে বসাইয়া বলিলেন—আপনি যে ইংরেজদের এ-দেশ হতে তাড়াতে চান, তা আমি জানি। বাজাপ্তির রিলিফ ওয়ার্কের পিছনে সেবার ভাব যতোটাই থাক্ না কেন, রাজনৈতিক ভাব তার চেয়ে বেশী। তাই এ-রিলিফ্ কাজের সাথে সাথে আপনি সেখানে স্বদেশী প্রচারও জোরে চালাচ্ছেন। এ-টাকা পেলে এর সাহায্যেও আপনি আমাদের বিরুদ্ধে প্রচার চালাবেন তো? আমি বলিলাম—নিশ্চয়ই, কারণ যতোদিন শাসকরূপে আপনারা এখানে আছেন, ততোদিন ভারতের উন্নতি অসম্ভব। তাই শাসনদণ্ড আপনাদের হাত হইতে ছিনিয়া নেওয়াই আমার সকল কাজের গোড়ার উদ্দেশ্য। দাদা একটু দূরে বসিয়াছিলেন। তার দিকে হাসিয়া চাহিয়া তিনি বলিলেন—আপনার দাদা কি বলেন? আমি বলিলাম—এ-সম্বন্ধে দাদার মত যাই হোক্ না কেন, আমার মত

অতি স্পষ্ট। এরপর আর কোনও কথা হইলো না। টাকাটা তিনি আমায় দিতে রাজী হইলেন। বুঝিলাম তিনি একজন ইংরেজ শাসক হইলেও, তাহার প্রাণ ভারতের রাজনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি সত্যিকার সহানুভূতিতে ভরা।

জুন ও জুলাই ধরিয়া বাজাপ্তির রিলিফ্ কাজ চলে। জ্বর থামিয়া আসিয়াছে, রোগীর সংখ্যা এখন অর্দ্ধেকেরও কম। ব্যামোর প্রকোপে মাঠে কাজকর্ম্ম বন্ধ ছিলো। প্রসন্ন পরাণে কৃষকেরা আবার মাঠের কাজে লাগিয়াছে। মাঠ হইতে রাস্তায় তাহারা আমাদের দেখিলে, কাস্তে হাতে হাসি মুখে সেলাম দেয়। দেখিয়া আমাদের প্রাণ আনন্দে ভরে। এ-ফল অপ্রত্যাশিত। প্রথম আশঙ্কা হইয়াছিলো কতোদিন না জানি একাজ চালাইতে হয়। বেশী পরিমাণে কুইনাইন খাওয়ানোর ফলে এতো সত্বর এতো অধিক ফল-প্রাপ্তি সম্ভব হইয়াছে। আমরা আর সেখানে থাকা নিষ্প্রয়োজন মনে করিলাম। আমাদের আগে বিশ্বাস ছিলো অন্ততঃ আগাষ্ট মাস অবধি এ-কাজ চালাইতে হইবে। সে-অনুসারেই ওষুধ-পত্রের আয়োজন করিয়াছিলাম। কাজেই এক মাসের ওষুধ হাতে রহিয়া গেলো, সে বড় কম নয়। চাঁদপুরের উভয় রিলিফ্ সমিতি প্রস্তাব করিয়া সে ওষুধ আমাদের কুমিল্লা আশ্রমে দান করে। ফলে কুমিল্লা ডিস্‌পেন্‌সারীর ওষুধের অভাব দূর হইলো।

কুমিল্লা প্রত্যাবর্ত্তন।

রিলিফ্-শেষে কুমিল্লা ফিরিয়া দেখি অনেকেরই মুখ ভার। আমাদের এ-রিলিফ্ কাজে তাহারা অসন্তুষ্ট। আশ্রমে গোলমাল

আরম্ভ হইয়াছে এবং বিভিন্ন দলের মধ্যে ইহা লইয়া জটলা চলিতেছে। এ-গোলমাল নূতন নহে। ঢাকা আশ্রমে ইহার প্রথম সূচনা। জেল হইতে ফিরার পরই এই বিরুদ্ধ মনোভাবের আভাষ পাই। মুক্তির পর রমনার মাঠে বিকালে বেড়াইতে বেড়াইতে কালু এক দিন বলিয়াছিলো—ভেবেছিলাম আপনি এলে সব গোলমাল চুকে যাবে, এখন দেখ্‌ছি আরও বাড়লো। ঢাকা আশ্রমে বিজয়ার দিন বিকালে আমি একটি প্রবন্ধ পাঠ করি। সে প্রবন্ধে এ-গোলমালের উল্লেখ ছিলো এবং সকলকেই সানুনয়ে বলিয়াছিলাম—মনোমালিন্য দূর ক'রে সর্ব্বপ্রাণে এক হতে—এতোটা ত্যাগ ক'রে ঘর বাড়ী ছেড়ে যখন এসেছো, তখন আর এ-টুকু বাকী রাখা কেন? তখন গোলমাল ছিলো অনেক খানি চাপা। এখন ইহা ভাসিয়া উঠিয়াছে। শুনিলাম প্রতিদিন বিকালে দক্ষিণ পারে বৈঠক বসে। এ-সব বৈঠকে আশ্রম সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা চলে। যাদের আশ্রমের সাথে আগে বিশেষ যোগ ছিলো না, ১৯২১-এর আন্দোলন উপলক্ষে যারা আশ্রমের সম্পর্কে আসে, এ-গোলমাল তাঁদের মধ্যেই প্রায় সীমাবদ্ধ। কালুকে এক দিন এর কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিলো—এদের মতে বাজাপ্তি না গিয়ে, আশ্রমের চারিদিকের গ্রামে ডাক্তারী করলেই বেশী ফল হোতো, এ-সব অঞ্চলেও কম-বেশী ম্যালেরিয়া আছে। আমি বলিলাম—ওষুধ মিলতা কোথা হতে, কুইনাইন যে এক পাউণ্ডও ছিলো না। ভাবে বুঝিলাম কালুর মতও অনেকটা তাদের দিকে। একটু অবাক্ হইলাম—কালুর মতো অন্তরঙ্গ বন্ধু আমার

কমই ছিলো। অন্তরঙ্গ বন্ধু না বলিয়া অনুরক্ত ভক্ত বলিলেও অত্যুক্তি হইতো না।

গোলমালের কারণ ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া আসিলো। ঢাকা জয়চন্দ্র বয়নাগারে কাজ করার ফলে খদ্দর সম্বন্ধে অন্নদার বিশেষ অভিজ্ঞতা জন্মে। এ-জন্য কুমিল্লা-আশ্রমে খদ্দর বিভাগও তাহার অধীনে দেওয়া হয়। তখন আশ্রমের এখনকার মতো ব্যবসার আকারে ব্যাপক খদ্দরের কাজ ছিলো না। কালু, পরিমল, শীতেশ, তরঙ্গ, পুটু প্রভৃতি কয়েকজন খদ্দর বুনিতো। তাদের বোনা খদ্দরই অভয়-আশ্রমের খদ্দর নামে বাজারে চলিতো। অন্নদাকে খদ্দর বিভাগের চার্জ্জ দেওয়ায় ইহারা অসন্তুষ্ট হইলো। ভাবিলো—অন্নদা খদ্দর ব্যবসায়ী হ'তে পারে কিন্তু বুন্‌তে পারে না। সে হাতে কলমে কখনো খদ্দর বোনে নাই, তাই বোনা-সম্বন্ধে তার ভাসা-ভাসা জ্ঞান থাকলেও কার্য্যকরী জ্ঞান নাই। সুতরাং সে খদ্দর বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তা হওয়ার অনুপযুক্ত। তাদের এ-যুক্তির জবাবে আমি বলিলাম—অন্নদা খদ্দর বুন্‌তে পারে না বটে, কিন্তু খদ্দর বিভাগকে অর্থ-নৈতিক ভিতের উপর খাড়া করে বড় করতে হ'লে তারই উপর এর চার্জ্জ থাকা উচিত। ইহা লইয়া নানারূপ কথা কাটাকাটির সাথে গোলমালও পাকাইতে লাগিলো।

চাঁদপুরে পুনঃ প্র্যাক্‌টিস্।

বাজাপ্তি হইতে ফিরার পর, আশ্রমে কোন কাজ না থাকার অসুবিধা দূর হইয়াছে। আউট্‌ডোর ডিস্‌পেন্‌সারী পূর্ণ উদ্যমে

চলিতেছে। অল্পদিনের মধ্যেই দৈনিক রোগীর সংখ্যা একশ ছাড়াইয়াছে। তাঁতের ঘরে রীতিমতো তাঁত বোনা আরম্ভ হইয়াছে। চন্দ্রোদয় পাশের গাঁয়ের মুসলমান ছেলেদের লইয়া আশ্রম প্রাঙ্গণে ছোট একটি স্কুলও খুলিয়াছে। তখন এ-অঞ্চলে অন্য কোনো স্কুল ছিলো না, তাই সকলে সাগ্রহে এ-স্কুলে যোগ দিয়াছে। ডিস্‌পেন্‌সারী গৃহের উত্তর দি‌কের বারান্দায় এ-স্কুল বসে। কাজেই কাজের দিক্ দিয়া বলার কিছুই ছিলো না। অসুবিধা হইলো খাওয়া লইয়া। খাওয়া জুটিবে কোথা হইতে? তখন আশ্রমে প্রায় কুড়ি জন লোক। এদের খাওয়া পরার জন্য মাসে কম পক্ষে দু-শ টাকা দরকার। ঠিক হইলো নিপেন সহরে বিনা ভিজিটে প্র্যাক্‌টিস্ করিবে। বিনা ভিজিটে—কারণ ডাক্তারী করিয়া পয়সা লওয়ার কথা ভাবাও তখন আমাদের পক্ষে কঠিন ছিলো। যাদের বাড়ীতে বিনা ভিজিটে দেখিবে, তাদের কাছ হইতে প্রতি মাসে কিছু কিছু চাঁদা লওয়া হইবে। চাঁদার তালিকা তৈরী হইলো। কিন্তু টাকা রীতিমতো আদায় হইতো না। তাই খাওয়ার অভাব লাগিয়াই থাকিতো।

কালু তখন আশ্রমের ম্যানেজার। অবস্থা এক দিন এমন দাড়াইলো, দু-এক দিনের মধ্যে অন্ততঃ দশ টাকা না জুটিলে খাওয়া চলা অসম্ভব। কুমিল্লার বাজারে তখন এমন ক্রেডিট্ নাই যে হাওলাৎ বরাৎ করিয়া চলিবে। আমি সহরের পরিচিত প্রায় সকলের কাছেই এই দশটি টাকার জন্য গেলাম কিন্তু মিলিলো না। শেষে বাধ্য হইয়া চাঁদপুর যাই। সেখানে পৌছিয়াই, একজন অতি পুরাতন বন্ধুকে এ-দশটাকার কথা

বলি। সে বলিলো—I can't spare. অতি বিষণ্ণ ও চিন্তাকুল হৃদয়ে মন্থর গতিতে পায় হাঁটিয়া দাদার বাসায় পৌঁছিলাম। স্নান-শেষে আহারে বসিয়া ভাবিতেছি—আমি তো বেশ পেট ভরিয়া খাইতেছি, আশ্রমের সকলে হয়তো অনাহারে আছে—এমন সময় শুনিলাম, বাহির বাড়ী হইতে কে যেন বলিতেছে—ডাক্তারবাবু বাড়ীতে আছেন কি? তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করিয়া বাহিরের ঘরে গেলাম। আগন্তুক বলিলো—বরকুল হইতে এসেছি, পদ্মলোচন সাহার ভাইয়ের অসুখ, আপনার এখনি যেতে হবে। বরকুল হাজিগঞ্জ হইতে তিন মাইল পূবে একটি ব্যবসায়ীবহুল গ্রাম। পদ্মলোচন সাহা সেখানকার সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ ধনী। এ-সব জায়গা আমার পূর্ব্ব পরিচিত। এর আগেও আমি অনেকবার হাজিগঞ্জ গিয়াছি। আমি যে এখানে আছি কি ক'রে জান্‌লেন—আমার এ-প্রশ্নের উত্তরে সে বলিলো—কালীবাড়ী ষ্টেশনে নেমে নিকটবর্ত্তী জনৈক স্বশ্রেণীর উকিলকে কোন্ ডাক্তার নেবো জিজ্ঞাসা করায় তিনি আপনার নাম করলেন। তিনি আরও বল্লেন যে আপনি আজই দুপুরের গাড়ীতে এসেছেন। আমি বলিলাম—আমি যেতে পারি কিন্তু তিনটার গাড়ীতে গিয়ে সন্ধ্যার গাড়ীতে ফিরবো, চল্লিশ টাকা দিতে হবে। সে তাতেই রাজী হইলো।

বরকুল পৌঁছিয়াই দেখি হরি সাহা সেখানে উপস্থিত। হরি সাহা হাজিগঞ্জের একজন বড় মহাজন। চাঁদপুরে আগে প্র্যাক্‌টিস্ করার সময় এক অদ্ভুত উপায়ে এর সাথে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে। হরিদ্বার হইতে ফিরার পর আমি সবে মাত্র

চাঁদপুরে প্র্যাক্‌টিস্ আরম্ভ করিয়াছি। দাদার বাসায় থাকি, বাসার সাম্‌নে কোনও সাইনবোর্ড নাই। আমার সম্বলের মধ্যে পায় এক জোড়া চটি জুতা, গায়ে একটি সার্ট ও অতি সাধারণ একখানি আলোয়ান এবং পকেটে আমার চিরসহচর ষ্টেথিস্‌কোপটি। মহেন্দ্র ডাক্তারের ইরিসিপেলাস হইয়াছে। দেখিতে এক সন্ধ্যায় আমার ডাক্ পরে। আমি আমার পূর্ব্ববর্ণিত পোষাক পরিয়া মহেন্দ্র বাবুর বাসায় পৌঁছিয়া দেখি, চাঁদপুরের ছোটবড় সকল ডাক্তারই সেখানে উপস্থিত, হোসেন ডাক্তার শুদ্ধ। আমায় দেখিয়া সকলেই সসম্ভ্রমে দাঁড়ায়, মনোযোগের সাথে আমার কথা শোনে, এবং আমার ব্যবস্থা মানিয়া লয়। হরি সাহার ছেলেরও তখন ইরিসিপেলাস হইয়াছিলো। হোসেন ডাক্তার ও মহেন্দ্র কর্ম্মকার তাহাকে দেখিতো। তার ছোঁয়াচ লাগিয়াই বোধ হয় মহেন্দ্র ডাক্তারের এই অসুখের সূত্রপাত। আমার মহেন্দ্র ডাক্তারকে দেখার সময় হরি সাহার এক গোমস্তাও সেখানে উপস্থিত ছিলো। সাধারণ পোষাক-পরা একজন মানুষের নির্দ্দেশ এ-ভাবে সকলকে মানিয়া লইতে দেখিয়া, সে একটু আশ্চর্য্য হইলো। পরে সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলো, আমি একজন এম্-বি ডাক্তার, নলিনীবাবুর ভাই। পরদিন সকালে হরি সাহার লোক আমার কাছে আসিয়া হাজির। আমি তার সাথে হরি সাহার ছেলেকে দেখিতে যাই। রোগীর অবস্থা খারাপ—মাথার তালু হইতে আরম্ভ করিয়া, সারামুখ জুড়িয়া, বুক ও পিঠের অর্দ্ধেক অবধি, প্রদাহ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। হরি সাহা বিশেষ উদ্বিগ্ন। সে

দিনই নটার ষ্টীমারে ছেলেকে কলিকাতা নেওয়ার জন্য সে তৈরী। আমায় দেখিয়া সে একটু আশ্বস্ত হইলো। বলিলো—আপনার চিকিৎসা-অধীনে একে আরও একদিন রাখবো, এর মধ্যে কোন উন্নতি না হ'লে, কাল সকালে কলকাতা নিয়ে যাবো। আপনার চিকিৎসায় ভালো হলে আপনাকে তিন শ টাকা দিবো। চিকিৎসা আরম্ভ করিলাম। দিনে তিন বার দেখি, প্রতিবার ৪৲ টাকা করিয়া ভিজিট পাই। সৌভাগ্যক্রমে এক দিনের মধ্যেই রোগ একটু ভালোর দিকে ফিরিলো। এই রোগীর চিকিৎসায় পাওয়া টাকা হইতেই ডাক্তারীর সাজ-সরঞ্জাম আমি প্রথম কিনি।

বরকুলের রোগীটিকে দেখিলাম। বয়স বেশী, শীর্ণকায় জ্ঞানশূন্য ও ম্যালেরিয়াগ্রস্ত। মাঝে মাঝে প্রলাপও বকিতেছে। রোগী দেখা শেষ হওয়ার পর, হরি সাহা আমায় বলিলেন—আজই চ'লে গেলে চল্‌বে না, তিন দিন থাক্‌তে হবে, কতো চান বলুন। আমি প্রতিদিনের জন্য পঞ্চাশ টাকা করিয়া চাহিলাম। হরি সাহা তাহাতেই রাজী হইলেন। পরদিনই তাহার কাছ হইতে একশ টাকা লইয়া কুমিল্লা পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হই। সে রাত্রে খাওয়া লইয়া একটু মুস্কিল বাধিলো। সাহারা জল অচল। তাই তাহারা আমার খাওয়ার বন্দোবস্ত করে পাশের এক ব্রাহ্মণ বাড়ীতে। আমি এ-কথা শুনিয়া রাগিয়া বলিলাম—আপনাদের বাড়ী এসেছি, আপনাদের এখানেই যা সম্ভব খাব, অন্য বাড়ী যাবো না। আমার এ-কথা শুনিয়া তাহাদের মাথায় যেন বাজ পড়িলো। তাহারা

আমার এ জেদ ছাড়ার জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করিলো, হাত পা ধরিলো, কিন্তু আমি কিছুতেই ছাড়িলাম না। ফলে সারা-রাত্রি অভুক্ত রহিতে হইলো, জলটুকু পর্য্যন্ত জুটিলো না। রাত্রে ভয়ানক পিপাসা পাইলে পর,একটু জল দিতে সেই বাড়ীর লোকদের কতো বল্লাম, দিলো না। বলিলো— দিব কি ক'রে? ব্রাহ্মণ—দেবতা, পাপ হবে না? ব্রাহ্মণকে অভুক্ত, তৃষিত রাখিতে পাপ নাই, পাপ যতো একটু জল দেওয়ায়। দীর্ঘ দিনের জমাট সংস্কার কী ভীষণ আকারই না ধারণ করিয়াছে! পরদিন সকাল হইতে না হইতেই বিভিন্ন গ্রাম হইতে তাহাদের আত্মীয় স্বজনেরা আসিয়া উপস্থিত হইলো। হরি সাহাও আসিলেন। এ-সব কথা আমি তাহাদের খুলিয়া বলিলাম। তাহারাও প্রথম ইহার কোনও সমাধান খুঁজিয়া পাইলো না। তাই আমাকে ঠাকুর বাড়ী খাওয়ার জন্যই পুনঃপুনঃ পীড়াপিড়ী করিতে লাগিলো। কিন্তু আমায় শেষ অবধি গোঁজ হইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, তাহারাই তাহাদের দীর্ঘ দিনের সংস্কার-সঙ্কীর্ণ পথ হইতে সরিতে বাধ্য হইলো। ঠিক হইলো, ভাত রাঁধিয়া দেওয়া তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না—লুচি, ডাল, তরকারি পাক করিয়া দিবে। লুচির সাথে সাথে আস্তে আস্তে ভাতের পথও উন্মুক্ত হইলো। সমাজে নূতন পথ পড়ে আপনা-আপনি নহে—কয়েকজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞের সতেজ চেষ্টার ফলে।

রোগী আরোগ্য হইলো। এরপর আমি চাঁদপুর থাকিয়াই কিছুকাল প্র্যাক্‌টিস্ করা ঠিক করিলাম, নইলে যে আশ্রম চলে

না। প্রথম বারের প্র্যাক্‌টিসের সময়ই চাঁদপুরে আমার খানিক প্রতিষ্ঠা লাভ হইয়াছিলো। বাজাপ্তি রিলিফের ফলে তাহা আরও বাড়িয়াছিলো। এখন একেবারে চরমে উঠিলো। চাঁদপুর ছোট যায়গা। এখানে একজন ডাক্তারের আয় মাসে হাজার বারশো টাকা হওয়া কল্পনার অতীত। কিন্তু তাহাই হইতে লাগিলো। প্র্যাক্‌টিসে পাওয়া টাকা লইয়া প্রতি শনিবার বিকালে কুমিল্লা যাইতাম। সেখানে একদিন থাকিয়া রবিবার সন্ধ্যায় আবার চাঁদপুর ফিরিতাম। আমার এই অপ্রত্যাশিত আয়ের ফলে আশ্রমের আর্থিক অভাব তো ঘুচিলোই, কাজের পথও প্রশস্ত হইলো।

আশ্রমের তখনকার অবস্থা

তখন আশ্রমের তিনটি কর্ম্মকেন্দ্র ছিলো—কুমিল্লা, নবাবগঞ্জ ও মালিকান্দায়। আশ্রম তখনও রেজিষ্ট্রী হয় নাই। আশ্রমের কোন ধরা-বাঁধা নিয়মও ছিলো না। আশ্রমের একটি কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি ছিলো বটে, কিন্তু কোনও লেখা নিয়মের অভাবে এই সমিতির ক্ষমতা অনিশ্চিত ছিলো। কুমিল্লা আশ্রমের কাজ কি ভাবে চলিবে, তা লইয়া কথা উঠিলো। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর ঠিক হইলো, শুধু কুমিল্লা আশ্রমের জন্যই একটি আলাদা কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠন করিতে হইবে। ১৯২৩-এর জুলাই কি অগাষ্ট। এক রবিবার ভোরে আশ্রমের প্রার্থনা-গৃহে এই সমিতি নির্ব্বাচনের জন্য বৈঠক বসে। আশ্রমের সকলেই সেখানে উপস্থিত ছিলো। সাতজন সভ্য

লইয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইবে। আমি অন্নদার নাম প্রস্তাব করিলাম। বিপক্ষ দল আপত্তি করিলো। বলিলো—আপনার ও অন্নদার মধ্যে মতের কোন পার্থক্য নাই, সুতরাং অন্নদাকে সভ্য না করাই উচিত। আমি যেন আকাশ হইতে পড়িলাম। অন্নদার নাম সম্বন্ধে যে কোন আপত্তি হইতে পারে, তা আমার কল্পনারও অতীত ছিলো। খানিক ক্ষণ স্তম্ভিতের মতো বসিয়া থাকিয়া বলিলাম—আমি আশ্রমের প্রেসিডেন্ট, সকলের না হলেও অন্ততঃ অধিকাংশের মতের সাথে আমার মতের মিল থাকা দরকার, নইলে আমার প্রেসিডেন্ট হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। এরপর সে-দিন আর বিশেষ কোনও কথা হইলো না। মনোমালিন্যের মধ্যেই সভা ভাঙ্গিলো।

নিপেন, অন্নদা ও আমি বুঝিলাম এ-ভাবে চলা অসম্ভব। সে-দিন সন্ধ্যার সময় আমরা তিন জন আশ্রম ছাড়িয়া রওনা হইলাম। উদ্দেশ্য—গোপালগঞ্জ গিয়া আরেকটি আশ্রম করা। ঠিক হইলো—আরও এক-বছর আমি চাঁদপুরে প্র্যাকটিস্ করিবো। প্রতিমাসে হাজার টাকা করিয়া গোপালগঞ্জ পাঠাইবো। নিপেন ও অন্নদা গোপালগঞ্জে থাকিবে। নিপেন আশ্রমের অন্যান্য কাজের সাথে সেখানে কিছু কিছু প্র্যাক্‌টিসও করিবে। অন্নদা খদ্দর বিভাগ গড়িয়া তুলিবে। আশ্রম হইতে প্রায় এক মাইল পশ্চিমে, পিলগ্রিম্‌স্ রোডের শেষে, টম্‌সন্ ব্রিজ। সেই অবধি আমরা গেলাম। ব্যাপারটা আরও একটু তলাইয়া ভাবিয়া লওয়ার জন্য সেই ব্রিজের উপর খানিক বসিলাম। সন্ধ্যার অন্ধকারে চারিদিক সমাচ্ছন্ন। নিস্তব্ধ রাতের বুকে

ঠাণ্ডা হাওয়া ঝির্ ঝির্ করিয়া বহিতেছে। উপরে সেগুন গাছের পাতা হইতে মাঝে মাঝে দু-চার ফোঁটা জল টপ্ টপ্ করিয়া মাথায় পড়ে। সেই অন্ধকার মাঝে স্নিগ্ধ সেগুন গাছের তলায় খানিক বসার ফলে উত্তপ্ত মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা হইয়া আসিলো। মনে হইতে লাগিলো—টাকার জোরে গোপালগঞ্জে হয়তো একটি আশ্রম গড়িয়া তোলা যাইবে, কিন্তু টাকার দ্বারা তো সব কাজ করা সম্ভব নয়। লোকে আমাদের কি ভাবিবে? এর পর আমাদের প্রভাব প্রতিপত্তি কতোটুকু থাকিবে? কুমিল্লা আশ্রমেরই বা কি হইবে? এই যে এতো লোকের কাছ হইতে এতো টাকা আনিয়াছি, সেই দায়ীত্বই বা এড়াই কি রূপে? চলিয়া যাওয়ার সঙ্কল্প শিথিল হইয়া আসিলো। সাথে সাথে মনে হইলো—এখানে থাকা কি কিছুতেই সম্ভব নয়? এ-সম্বন্ধে সব চেষ্টাই কি শেষ হইয়াছে, কিছুই কি বাকী নাই? প্রেম ও উদারতার দ্বারা দুনিয়ায় কি না করা যায়? এরা যা চায় সব কিছুই মানিয়া লইয়া আর একবার পরীক্ষা করা যাক্ না?

আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম। ফিরিয়া আসিয়া প্রদ্যোৎকে বলিলাম—কাল সকালে আবার সভা হবে। পরদিনের সভায় বলিলাম—তোমরা কি চাও বল, আমি সব কিছু মেনে নিতে প্রস্তুত। সকলেরই মনের মেঘ অনেকটা কাটিলো।

চাঁদপুরে আমার প্র্যাক্টিস্ সজোরে চলিতে লাগিলো। নিপেনও কুমিল্লা সহরে প্র্যাক্টিস্ আরম্ভ করিলো। অল্প সময়ের মধ্যেই তার সুনাম সর্ব্বত্রই ছড়াইয়া পড়ে। আশ্রমের আর্থিক

অবস্থা ফলে অনেকটা স্বচ্ছল হয়। ১৯২৩-এর বাকী কটা মাস এ-ভাবেই কাটে।

১৯২৪-এর জানুয়ারী। যথারীতি শনিবার কুমিল্লা আসিয়াছি। নিপেন বলিলো—আর আপনার চাঁদপুরে প্র্যাক্‌টীস্ করার দরকার নাই, এখন হ'তে আপনি এখানেই থাকুন। নিপেন ও অন্নদার মনের ভাব—আমি দাদার বাসায় থাকি, মাসে হাজার বারশ টাকা কামাই, শেষে হয়তো আত্মীয়-স্বজনের মায়া-মমতায় ও টাকার লোভে সেখানেই থাকিয়া যাইব, আর আশ্রমে আসিব না। আমি তাদের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া এক কথাতেই চাঁদপুরের প্র্যাক্‌টিস্ ছাড়িতে রাজী হইলাম। সে দিনই দাদাকে নিম্ন মর্ম্মের চিঠি লিখি—চাঁদপুরের রোগীদের সেবা আর আমার পক্ষে অসম্ভব। ফলে আশ্রমে আবার আর্থিক অনাটন উপস্থিত হয়। নিপেন তখন মাসে শ দুই টাকা পাইতো। এ-টাকা দ্বারা আশ্রমের নিত্য-নৈমিত্তিক খরচ কোনও রকমে চলিলেও গঠনমূলক কাজ চলা অসম্ভব। তখন পশ্চিম পাড়ের মাটিকাটা ও ইটপোড়া চলিতেছিলো। অবিলম্বে হাজার টাকা চাই। এ-টাকা আসিবে কোথা হইতে? বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে যতোটা সম্ভব গেলো বছর আদায় করা হইয়াছে, তাদের কাছে এখুনি আবার টাকা চাওয়া কঠিন। ইন্দুবাবুর ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক তখন জাঁকিয়া উঠিয়াছে। পরামর্শের জন্য তার কাছে গেলাম। এ-ক-মাসের কাজের ফলে, তাঁর রাজনৈতিক মত যাই থাক না কেন, তিনি আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি এ-হাজার টাকা তার ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ দিতে রাজী হইলেন।

আমি সুস্থির হইয়া কুমিল্লা বসিলাম। দ্রুত বেগে কাজ বাড়ানোর চেষ্টা চলিলো। আমি আউট-ডোরে বসিতে লাগিলাম। আউট-ডোর তখন খুব জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে, দেশ-দেশান্তর হইতে রোগী আসে। বাজাপ্তি ক্যাম্পের রীতি অনুসারে সমর্থদের কাছ হইতে ওষুধের দাম বাবত কিছু কিছু লওয়া হয়। ধানের দাম বেশী, কৃষকদের অবস্থা ভালো, সকলেই সানন্দে কিছু কিছু দেয়। ফলে আউট-ডোর প্রায় স্বাবলম্বী। চারিদিকের কৃষকেরাও সন্তুষ্ট, কারণ তাদের ধারণা জন্মিয়াছে, এ-ডাক্তারখানায় সব চাইতে ভাল ওষুধ রাখা হয়, কোন রূপ ফাঁকি দেওয়া হয় না। আশ্রম-প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে এ-অঞ্চল কালাজ্বরে ছাইয়া গিয়াছিলো। আমাদের প্রবর্ত্তিত ব্রহ্মচারীর ইন্‌জেক্‌সানের ফলে, কালাজ্বর এ-অঞ্চল হইতে প্রায় লোপ পাইলো। আমি অবসর মতো রোগীদের দেখিতে গ্রামে যাইতাম, তাহারাও কিছু কিছু ভিজিট দিতো। নিপেন ও আমার মধ্যে এই বন্দবস্ত ছিলোযে, সে সাধারণতঃ ডাক্তারী করিবে সহরে, আমি গ্রামে। সে না ডাকিলে আমি সহরে রোগী দেখিতে যাইবো না। নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগীতা এড়ানোই ছিলো এ-বন্দোবস্তের মূলে। আশ্রমের উদ্দেশ্যগুলি আউট-ডোরের টিকিটের অপর পৃষ্ঠায় ছাপানো হইলো। শিক্ষিত রোগীদের এই উদ্দেশ্যগুলি মুখস্থ করিয়া সকলের সামনে আবৃত্তি করিতে হইতো, নইলে ওষুধ দেওয়া হইতো না। উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে আউট-ডোরে দুটির উপরই বেশী জোর দেওয়া হইতো—(১) পূর্ণস্বাধীনতা লাভ, (২) জাতিভেদ পরিত্যাগ। কারণ তখন আমাদের

বিশ্বাস ছিলো ভারতের পুনর্গঠনের জন্য এ-দুটিরই বিশেষ দরকার।

অন্নদাও খদ্দর বিভাগের কাজ বাড়ানোর জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলো। তরঙ্গ প্রভৃতির আগের মতো তাঁত বোনা চলিলো। অন্নদার চেষ্টা হইলো গ্রামে গ্রামে খদ্দর তৈরীর বন্দোবস্ত করা। আশ্রমের এক মাইল দক্ষিণে রাজাপাড়া গ্রামে অনেক তাঁতির বাস। এ-উদ্দেশ্যে অন্নদা তাদের কাছে আনাগোনা আরম্ভ করিলো। তাহারা তাহাকে পাত্তাই দেয় না, উপেক্ষার চোখে দেখে, বসতে পর্য্যন্ত বলে না। অন্নদাও নাছোড়বান্দা, এই সমস্ত উপেক্ষার প্রতি উদাসীন। রাজাপাড়ার পশ্চিমে উনৈশার গ্রাম। সেখানে সে একটি স্কুলও খুলিলো। সে নিজেই সেখানে দুপুরে পড়াইতো। এ-ভাবেই চিকিৎসা, শিক্ষা, খদ্দর ও প্রচারের মধ্য দিয়া আশ্রমের কাজ চারিদিকের গ্রামের জনগণের মাঝে আস্তে আস্তে প্রসারিত হইতে লাগিলো।

১৯২৪-এর এপ্রিল। গেলো এপ্রিলে কুমিল্লা আশ্রমের প্রথম প্রতিষ্ঠা। তাই আশ্রম-জীবনের এক বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। ঠিক হইলো, আশ্রমের বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন করিতে হইবে। এ-উৎসবের উদ্দেশ্য আশ্রম ও জনগণের মাঝে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ট করিয়া তোলা। কি-ভাবে এ-উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে সে-সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইলো। কিন্তু দেখা গেলো আমাদের তখনকার অবস্থায় বেশী খরচ করিয়া জমকালো ভাবে উৎসব করা অসম্ভব। তাই ঠিক হইলো যথাসম্ভব সংক্ষেপে উৎসব সম্পন্ন করিতে হইবে। আশ্রমের তরুণেরা এ-উপলক্ষে রবিবাবুর

রথ-যাত্রা নাটকের অভিনয় করার প্রস্তাব করে। প্রথম যৌবনের পর হইতে নাটকের সাথে আমার বিশেষ কোনও সম্পর্ক নাই। তাই আমি তাদের এই প্রস্তাবে প্রথম বেশী উৎসাহ না দিয়া বইখানা একবার পড়িতে চাহিলাম। পড়িয়া উৎসাহে আমার প্রাণ ভরিলো। যে কাজ আমরা এই আশ্রমের মারফত করিতে চাই, সে কাজের স্পষ্ট ইঙ্গিত এ-নাটকে। বইর সার কথাই এই—সে দিন নাই, যেদিন পুরুতের মন্তর-পড়া হাতের টানে মহাকালের রথ চলিতো। এরা এখন আর আগের দিকে টানে না, টানে উল্টো দিকে, পিছনের পথে। এ-অভিজ্ঞতা আমার নূতন নয়, অতি পুরাতন। পুরোহিত ও কুলগুরুদের সাথে সংগ্রাম করিতে করিতেই জীবন-পথে আমি এতোদূর অগ্রসর হইয়াছি। পুরোহিতেরা তো অকেজো, এ-কালের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। তবে মহাকালের এই রথ চলিবে কার টানে—রাজার টানে? তিনিও লাগাইলেন হাত—চাকাটা একটু ক্যাঁচ কোঁচও করিলো না। শেঠজীর ডাক পড়িলো। সিদ্ধিরস্তু বলিয়া দলবলসহ তিনি হাত দিলেন। রথের দড়ি ধরিয়া যতো কেনো না বলেন—টান দেও, টান দেও, দড়ি আর ওঠে না। শুধু ওঠে না, নয়—যেন আরও আড়ষ্ট হইয়া পড়ে। তবে উপায়? উপায় শেটজীই বাত্‌লাইলেন—আজ যারা চোখে পড়ে না, কাল তারা দেখা দেবে সব চেয়ে বেশী। তাহারাই আনিবে যুগান্তর—করিবে প্রলয়ের সৃষ্টি। তাহাদের টানেই চলিবে মহাকালের রথ। সেই নীচের তলার লোকদের উপরের তলায় উঠিতে সাহায্য করার উদ্দেশ্যেই তো এই

আশ্রমের প্রতিষ্ঠা। আমি সানন্দে এই অভিনয়ে স্বীকৃতি দিলাম।

১৯২৪-এর এপ্রিল। উৎসবের দিন আসিয়া উপস্থিত হইলো। সভাপতি হইলেন চাঁদপুরের প্রবীণ নেতা হরদয়াল নাগ। সহর হইতে আশ্রম প্রায় দু-মাইল দূর। আমরা ভাবিয়াছিলাম এই সামান্য উৎসবে সহরের বড় বেশী কেউ আসিবে না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, সভার নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্ব্বেই সহর হইতে বহু পুরুষ ও মেয়ে ঘোড়ার গাড়ী করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে-দিন দুপুরে সহরে কংগ্রেসের একটি সভা ছিলো—কোরামের অভাবে তাহা স্থগিত রাখিতে হইয়াছে। অথচ এ-সভায় এতো লোক-সমাগম। হরদয়াল বাবু সভাপতিরূপে বলিতে উঠিয়াই এ বিষয়টির উল্লেখ করিলেন। সাথে সাথে দেশ যে এখন শুধু কথা চাহে না, গঠনমূলক কাজ চায়, এ-কথাও বলিলেন। উপস্থিত আরো কয়েকজনের বক্তৃতার পর, রথ যাত্রার অভিনয় আরম্ভ হইলো। আমার ছিলো পুরোহিতের পাঠ—অন্নদার ধনপতির। অন্নদার অভিনয় খুবই স্বাভাবিক ও প্রাণস্পর্শী হইয়াছিলো। রথের দড়িটা ধরিয়া তাহার সেই সজোর টান ও বার বার বলিয়া ওঠা, টানো, টানো, আর এক টান,—আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে। উৎসব-শেষে উৎসাহ-উদ্বেল পরাণে সকলে আপন আপন গাড়ীতে সহরে ফিরে। ইন্দু বাবুর মা হাঁটিয়াই রওনা হইলেন। আমি তাঁহাকে গাড়ীতে যাইতে পীড়াপীড়ি করায়, তিনি বলিলেন—গাড়ীতে যেতে যা লাগবে, তা আশ্রমে দিলে অনেক ভাল

কাজ হবে। তাঁর একথা শুনিয়া চাঁদপুরের হোসেন ডাক্তারের একটি কথা মনে পড়িলো। আশ্রমের জন্য তার কাছে একশ টাকা চাইলে পর, প্রথম দিন তিনি বলেন—এতো টাকা আমার পক্ষে দেওয়া অসম্ভব। পরদিন তিনি নিজে আসিয়া আমায় বলিলেন—কাল না বলেছি, কিন্তু আজ বল্‌ছি, একশ টাকাই দেবো। ভেবে দেখলাম, না বলা অন্যায় হয়েছে। ঠিক্ করেছি, এখন থেকে দিনে যতোটা সিগারেট খাই তার অর্দ্ধেক খাব, তা হ'লেই এক বছরে একশ টাকা বাঁচবে। ইন্দু বাবুর মাকে তাঁহার বাসা অবধি পৌঁছাইয়া দিয়া চড়তার রাস্তায় আশ্রমে যখন ফিরি, তখন রাত প্রায় এগারটা। সংকীর্ণ রাস্তার দু-পাশে বন জঙ্গলের মাঝে নিস্তব্ধ মুসলমান পল্লী। উপরে হাসি-মুখ চাঁদ। চারিদিকে ফুট-ফুটে জ্যোৎস্না। আমার গতি মন্থর-মন চিন্তাকুল। আশ্রম অতি নিকটে। পিলগ্রিমস্ রোডের দু-পাশের সেগুনের সারের ভিতর দিয়া আশ্রমের ঘরগুলির আবাছা রূপ প্রায় দেখা যায়। আশ্রমবাসীদের উৎসবান্ত কোলাহল তখনো শেষ হয় নাই। এ-সবের মাঝে আশ্রম-স্থাপনার আগাগোড়া ইতিহাসটা আমার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করিয়া ভাসিয়া উঠিলো। সাথে সাথে মনে হইলো অন্নদার সেই অভিনয়ের সময়ের টানো, টানো কথা কয়টি। বিচিত্র ঘটনার বিবর্ত্ত-মাঝে টানিতে টানিতে আশ্রমকে তো এখানে আনিয়া হাজির করা হইয়াছে। জনগণের এতো উদার অর্থ-সাহায্য ও আশ্রমের প্রতি প্রাণের এই প্রবল টান—এ-সবের পরিণতি কোথায়? আশ্রমের ভাবী সম্ভাবিতার কথা ভাবিতে ভাবিতে গুরু হৃদয়ে

আশ্রমে প্রবেশ করা মাত্রই নৃপেন বলিয়া উঠিলো—সুরেশদা, এর পর আশ্রমের কাজ আরো দ্রুত বাড়বে, লোকরা আরো খোলা হাতে টাকা দেবে। আমি তাহার পানে চাহিয়া, একটু হাসিয়া, কোন কথা না বলিয়া, দায়িত্বের কথা ভাবিতে ভাবিতে, আপন ঘরে প্রবেশ করিলাম।